

জিৰো: দ্য বায়োগ্ৰাফি অব অ্যা ড্যাঞ্জাৰাস আইডিয়া

মূল: চাৰ্লস সিফ

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

উৎসর্গ

অধ্যায় শূন্য: নাল অ্যান্ড ভয়েড

অধ্যায় এক: কিছুই না করার গল্প

শূন্যের সূচনা

শূন্যবিহীন জীবন

শূন্যের জন্ম

শূন্যের ভয়ানক বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় দুই: শূন্যতা থেকে শুধু শূন্যতাই মেলে

পাশ্চাত্যে শূন্যের প্রত্যাখ্যান

গ্রিক সংখ্যা-দর্শনের উৎপত্তি

অসীম, শূন্যতা ও পাশ্চাত্য

অন্ধ অভিসার

শূন্যতম সংখ্যা

বিশাল শূন্যতা

অধ্যায় তিন: শূন্যের বরণ

প্রাচ্যে শূন্যের আগমন

শূন্যের পুনর্জন্ম

আরবি সংখ্যা

আমি যা তাই: শূন্য

শূন্যের বিজয়

অধ্যায় চার: শূন্যের ধর্মতত্ত্ব

খুলল রুদ্ধদ্বার

শূন্য এবং ভয়েড

ঈশ্বর নিয়ে বাজি

### অধ্যায় পাঁচ: অসীম শূন্য

শূন্য ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব  
শূন্য ও মরমি ক্যালকুলাস  
মরমিবাদের ইতি

### অধ্যায় ছয়: অসীমের যমজ

শূন্যের অসীম বৈশিষ্ট্য  
কাল্পনিক সংখ্যা  
বিন্দু ও প্রতিবিন্দু  
অসীম শূন্য

### অধ্যায় সাত: পরম শূন্য

শূন্যের ভৌত বৈশিষ্ট্য  
শূন্য তাপ  
কোয়ান্টাম শূন্য: অসীম শক্তি  
আপেক্ষিকীয় শূন্য: ব্যাকহোল  
বিনা পুঁজিতে লাভ?

### অধ্যায় আট: গ্রাউন্ড জিরোর শূন্যতম ঘণ্টা

স্থান-কালের সীমানায় শূন্য  
শূন্যের নির্বাসন: স্ট্রিং তত্ত্ব  
শূন্যতম ঘণ্টা: বিগ ব্যাং

### অধ্যায় নয়: শেষ সময়

শেষ সময়  
অসীম ও তার ওপারে

### পরিশিষ্ট

প্রাণী, সবজি, নাকি মন্ত্রী?  
সোনালি অনুপাত

অন্তরকের আধুনিক সংজ্ঞা

মূলদ সংখ্যার গণনায় ক্যান্টর

ওয়ার্মহোল টাইম মেশিন বানানোর উপায়

শূন্যের অশূন্য ইতিহাস

## শূন্যতম অধ্যায়

### নাল অ্যান্ড ভয়েড

ইউএসএস ইয়র্কটাইন জাহাজে শূন্যের আঘাতটা টর্পেডোর মতোই হলো।

১৯৯৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। জাহাজটি ভার্জিনিয়া উপকূল থেকে প্রমোদভ্রমণে বের হয়। শত কোটি ডলারের মিসাইল ক্রুজারটি হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে থেমে যায়। ইয়র্কটাইন জাহাজের সলীল সমাধি ওখানেই।

যুদ্ধজাহাজগুলো বানানোই হয় টর্পেডো বা বিস্ফোরকের আঘাতের প্রতি সহনীয় করে। ইয়র্কটাইন জাহাজকে সব ধরনের অস্ত্র থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শূন্য থেকে বাঁচানোর কথা কেউ ভাবেনি। মারাত্মক এক ভুল।

মাত্রই ইয়র্কটাইনের কম্পিউটারে নতুন এক সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়েছে। এটিই নিয়ন্ত্রণ করছে জাহাজের ইঞ্জিন। কিন্তু কোডের মধ্যে যে একটি টাইম বোমা লুকিয়ে আছে তা খেয়াল করেনি। সফটওয়্যার ইন্সটল করার সময় শূন্যটার দিকে প্রকৌশলীদের নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কী কারণে কে জানে—শূন্যটার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখেনি। ফলে সেটি লুকিয়ে থাকল কোডের ভেতরে। যতক্ষণ না সফটওয়্যার শূন্যটাকে মেমোরিতে নিয়ে আসল। আর তাতেই সব শেষ।

ইয়র্কটাইনের কম্পিউটার শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করেছিল। সাথে সাথে ৮০ হাজার হার্সপাওয়ারের যান অকেজো হয়ে গেল। ইঞ্জিনকে জরুরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে গিয়েছিল। পরে কোনোরকমে তীরে ভিড়তে সক্ষম হয়। শূন্য থেকে মুক্তি পাওয়া, ইঞ্জিন মেরামত করা ও ইয়র্কটাইনকে পুনরায় সচল করতে লেগে গেল দুই দিন সময়।

অন্য কোনো সংখ্যার দ্বারা এমন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ইয়র্কটাইনে ঘটা কম্পিউটারের ত্রুটি শূন্যের ক্ষমতার খুব ছোট্ট এক নমুনা। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ শূন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শূন্যের মুখোমুখি হলে দার্শনিকদের বিদ্যেবুদ্ধি লোপ পেত। কারণ শূন্য অন্য সংখ্যা থেকে একেবারেই আলাদা। অবর্ণনীয় ও অসীমের এক ছোট্ট বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই মানুষ একে ভয় পেয়েছে। ঘৃণা করেছে। নিষিদ্ধ করেছে।

এ বইটা শূন্যের গল্প। প্রাচীনকালে এর জন্মের কথা। প্রাচ্যে এর সাদরে গৃহীত হবার কথা। ইউরোপে স্বীকৃতি পাওয়ার সংগ্রাম। আর আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এর নিত্যনতুন ভূমিকার কথা। এখানে বলা হয়েছে সেইসব পণ্ডিত, মরমিবাদী, বিজ্ঞানী ও পাদ্রীদের কথা যারা এই সংখ্যাটির অর্থ নিয়ে লড়াই করেছেন। প্রত্যেকেই বুঝতে চেয়েছেন। প্রাচ্যের ধারণাগুলো থেকে নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে (কখনও কখনও সহিংস উপায়ে) মুক্ত রাখার পাশ্চাত্যের একটি ব্যর্থ চেষ্টারও ইতিহাস এটি। এছাড়াও একটি সরল-দর্শন সংখ্যা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন প্যারাডক্সেরও ইতিহাস এটি। বর্তমান শতাব্দীর সেরা বুদ্ধির মানুষগুলোও পেরে উঠছেন না এর সাথে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার পুরো অবকাঠামোকে হয়ত এই সংখ্যাটিই পরিষ্কার করবে।

শূন্যের অনেক ক্ষমতার কারণ এটি অসীমের যমজ। এরা সমান এবং বিপরীত। একের মধ্যে দুই। বিভ্রান্তির জন্ম ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটোরই অবদান সমান। বিজ্ঞান ও ধর্মের বড় বড় প্রশ্নগুলো করা হয় শূন্যতা ও চিরন্তনতা নিয়ে। শূন্যতা ও অসীমতা নিয়ে। শূন্য ও অসীম নিয়ে। শূন্য নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধ দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ও ধর্মের ভিত্তিতে আলোড়ন তুলেছিল। সব বিপ্লবের পেছনে কাজ করেছে শূন্য। সাথে ছিল অসীম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতের মূলে ছিল শূন্য। খৃষ্টধর্ম ও বিজ্ঞানের সংগ্রামের কেন্দ্রে ছিল শূন্য। শূন্য পরিণত হলো প্রকৃতির ভাষায়। হয়ে গেল গণিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে ব্যাপক সমস্যাগুলোর সমাধানে মোকাবেলা করতে হয় শূন্যকে। হোক সে ব্ল্যাকহোলের অন্ধকার কেন্দ্র কিংবা বিগ ব্যাংয়ের উজ্জ্বল ঝলক।

কিন্তু ইতিহাসে পাতা বলছে, বাজিমাত সবসময় করেছে শূন্যই। প্রত্যাখ্যান, নির্বাসন সব মোকাবেলা করে শূন্য সবসময় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছে। মানুষ কখনোই শূন্যকে দর্শনে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করতে পারেনি। বরং মহাবিশ্ব ও ঈশ্বরের ধারণা পেতে শূন্যের কাছেই যেতে হয়েছে মানুষকে।



প্রথম অধ্যায়  
কিছুই না করার গল্প  
[শূন্যের সূচনা]

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনোটাই ছিল না। ছিল না স্থানের জগৎ, আর না ছিল তার বাইরের আকাশ। কে জাগাল?  
কোথায় জাগাল?

-ঋগ্বেদ

শূন্যের গল্প খুব পুরনো। গণিতের জন্মের সময়েই এর জন্ম হয়। সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কোথা। তখনও প্রথম সভ্যতারও জন্ম হয়নি। মানুষের লিখতে-পড়তে পারারও বহু আগের কথা। শূন্যকে আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষের কাছে সংখ্যাটিকে বহিরাগত মনে হত। মনে হত ভীতিকর।

ধারণাটির জন্ম প্রাচ্যের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বা উর্বর চন্দ্রকলা অঞ্চলে। খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শ বছর আগে। এই শূন্য শুধু আদিম শূন্যতার প্রতিচ্ছবিই নয়। এর ছিল ভয়ানক গাণিতিক ধর্মও। শূন্যের মধ্যে রয়েছে যুক্তির ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শক্তি।

ভেড়া গুনতে মানুষের মধ্যে গাণিতিক চিন্তার সূচনা ঘটে। এছাড়াও সম্পদের হিসাব রাখতে ও সময় মাপতে গণিত লাগত। এগুলোর কোনোটাতেই শূন্যকে দরকার হয়নি। শূন্যের আবিষ্কারের আগেও হাজার বছর ধরে সভ্যতা ঠিকঠাক কাজ করছিল। শূন্যের প্রতি ঘৃণা কাজ করায় কিছু কিছু সংস্কৃতির মানুষ সংখ্যাটিকে বাদ দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল।

শূন্যবিহীন জীবন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শূন্যকে প্রয়োজন হয় না। কেউই শূন্যটি মাছ কিনতে যায় না। এক দিক থেকে সব অঙ্কবাচক সংখ্যার মধ্যে এটি সবচেয়ে সভ্য। চিন্তার পরিশীলিত রূপই আমাদেরকে সংখ্যাটি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে।

-আলফ্রেড নর্থ উইথহেড

একজন আধুনিক মানুষ শূন্যবিহীন জীবনের কথা ভাবতেও পারেন না। ঠিক যেমনি ৭ বা ৩১ সংখ্যাগুলো ছাড়া জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এক সময় শূন্য বলতে কোনো সংখ্যা ছিল না। ঠিক যেভাবে ছিল না ৭ বা ৩১। সেটা প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। তাই জীবাশ্মবিদরা পাথর ও হাড়ের টুকরো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণিতের জন্মকাহিনি বের করেছেন। এসব থেকে গবেষকরা জেনেছেন, প্রস্তর যুগের গণিতবিদরা এখনকার গণিতবিদদের চেয়ে অমার্জিত ছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে তারা ব্যবহার করতেন নেকড়ে।

১৯৩০-এর দশকে প্রস্তর যুগের গণিতবিদদের সম্পর্কে বড় একটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল অ্যালোসম চেকোস্লোভাকিয়ার মাটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি এ সময় ৩০ হাজার বছরের পুরনো একটি নেকড়ের হাড় খুঁজে পান। তাতে রয়েছে অনেকগুলো খাঁজ কাটা। কেউ জানে না, জনৈক গুহামানব গগ এই হাড় দিয়ে তার শিকার করা হরিণ, আঁকা ছবি বা তার গোসল না করা দিনগুলো গুনেছিল কি না। তবে এটা নিশ্চিত, প্রাচীন মানুষেরা কিছু না কিছু গুনেছিল।

প্রস্তর যুগে নেকড়ের একটি হাড়ই বর্তমান সময়ের একটি সুপারকম্পিউটার। গগের আদিপুরুষরা তো দুই পর্যন্তও গুনতে পারত না। সেখানে শূন্যের দরকার হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে হচ্ছে গণিতের একেবারে শুরুর দিকে মানুষ শুধু এক ও বহুর পার্থক্য বুঝত। একজন গুহামানবের বর্ষা হয় একটা থাকত, নাহয় বহু। তিনি হয় একটি টিকটিকি খেতেন, নাহয়



বহু। এক বা বহু ছাড়া অন্য রাশিকে বোঝানোর মতো কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে প্রাচীন ভাষাগুলো বিকশিত হলো। এক, দুই ও বহুর মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এক, দুই, তিন ও বহুর পার্থক্যও জানা গেল। কিন্তু আরও বড় সংখ্যার কোনো নাম ছিল না। এই সমস্যা এখনও কিছু কিছু ভাষায় দেখা যায়। বলিভিয়ার সিরিয়না ইন্ডিয়ান বা ব্রাজিলের ইয়ানোয়ামাদের কথাই ধরুন। তাদের ভাষায় তিনের বেশি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য নেই কোনো শব্দ। তেমন দরকার হলে তারা বলেন “অনেক” বা “প্রচুর।”

কিন্তু সংখ্যার একটি দারুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাপদ্ধতি সেখানেই থেমে যায়নি। সংখ্যাদেরকে যোগ করে নতুন নতুন সংখ্যা পাওয়া যায়। তাই কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমান মানুষগুলো সংখ্যা-শব্দগুলোকে বিভিন্ন সারিতে সাজাতে লাগল। বর্তমান ব্রাজিলের বাকাইরি ও বোরোরো জাতির মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় এই কাজটি করা হয়েছে। তাদের সংখ্যাগুলো এ রকম: এক, দুই, দুই ও এক, দুই ও দুই, দুই ও দুই এবং এক ইত্যাদি। তারা দুইয়ের মাধ্যমে হিসাব করে। গণিতবিদরা একে বলেন বাইনারি বা দ্বিমিক (binary) পদ্ধতি।

বাকাইরি বা বোরোরোদের মতো করে তেমন কেউ গণনা করেন না। প্রাচীন নেকডের হাডুই প্রাচীনকালের গণনাপদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ। গগের নেকডের হাডুই ৫৫টি খাঁজ ছিল। প্রতি গ্রুপে ছিল ৫টি করে খাঁজ। প্রথম ২৫টি দাগের পরে দ্বিতীয় আরও একটি খাঁজ ছিল। মনে হচ্ছে, গগ হয়ত ৫ দিয়ে হিসাব করছিলেন। এবং গ্রুপগুলোকে ৫ দিয়ে গুচ্ছবদ্ধ করছিলেন। এটা করা খুবই অর্থবহ। দাগগুলোকে একটি একটি করে গণনা করার চেয়ে গ্রুপে গ্রুপে সাজিয়ে নিলে অনেক দ্রুত কাজ করা যায়। আধুনিক গণিতবিদরা বলবেন খোদাই শিল্পী গগ পাঁচভিত্তিক (quinary) গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু কেন পাঁচ-ই? গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে আসলে যেকোনো একটি সংখ্যা নিলেই চলত। গগ চারটি নিয়ে গুচ্ছ করে দাগ টানলে এবং চার ও ষোলো এর গুচ্ছ বানাতে তার সংখ্যাপদ্ধতি ঠিকই কাজ করত। একইভাবে কাজ করত ছয় ও ত্রিশের গুচ্ছও। কয়টা নিয়ে গুচ্ছ করা হলো সেটার ওপর হাডুইর ওপর দাগের সংখ্যা নির্ভর করে না। কিন্তু গগ চারের বদলে ৫টি নিয়ে গুচ্ছ করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষই গগের বৈশিষ্ট্যটা পেয়েছে। মানুষের প্রতি হাতে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যাপদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে ৫-কে জনপ্রিয় হতে দেখা গেল। যেমন, প্রাথমিক যুগের গ্রিকরা ট্যালি চিহ্ন আঁকাকে বলত ‘ফাইভিং’।

এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিমিক গণনা পদ্ধতিতেও ভাষাবিদরা পাঁচভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির সূচনা দেখেছেন। বোরোরো ভাষায় “দুই ও দুই এবং এক” বলার আরেকটি উপায় হলো, “এটা হলো আমার এই পুরো হাতের সমান।” বোঝাই যাচ্ছে, প্রাচীন আমলের মানুষ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গণনা করতে চাইত। পাঁচ (এক হাত), দশ (উভয় হাত) এবং বিশ (উভয় হাত ও উভয় পা) ছিল খুব পছন্দনীয় চিহ্ন। ইংরেজি ভাষার ইলেভেন (এগারো) ও টুয়েলভ (বারো) শব্দ দুটি সম্ভবত “ওয়ান ওভার টেন” ও “টু ওভার টেন” থেকে এসেছে। আর তের (থার্টিন), চৌদ্দ (ফোর্টিন), পনের (ফিফটিন) ইত্যাদি হলো যথাক্রমে “থ্রি অ্যান্ড টেন”, “ফোর অ্যান্ড টেন” এবং “ফাইভ অ্যান্ড টেন”-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণে ভাষাবিদরা মনে করছেন, যে জার্মানীয় আদিভাষাসমূহ থেকে ইংরেজি ভাষা এসেছে সেগুলোতে দশ ছিল মৌলিক একক। এ কারণে সেই ভাষাগুলোর মানুষরাও ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে ফরাসি ভাষায় আশি-কে বলে কোয়ান্ট্রে ভিংত (চারটি বিশ)। আর নব্বইকে বলে কোয়ান্ট্রে ভিংত দি (চারটি বিশ ও একটি দশ)। হয়ত এখনকার ফ্রান্সে যে মানুষগুলো বাস করতেন তারা ২০-ভিত্তিক বা ভিজেসিনাল (vigesimal) সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সাত ও ৩১-এর মতো সংখ্যাগুলো এই সবগুলো সংখ্যাপদ্ধতিতেই ছিল। হোক সেটা ৫-ভিত্তিক, ১০-ভিত্তিক, কিংবা ২০-ভিত্তিক। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই ছিল না শূন্যের জন্যে কোনো নাম। এই ধারণাটারই অস্তিত্ব ছিল না।

শূন্যটি ভেড়ার যত্ন তো কখনও নিতে হয় না। কিংবা শূন্যসংখ্যক সন্তানের হিসাব রাখার দরকার হয় না। “আমার কাছে শূন্যটি কলা আছে” না বলে দোকানী বলেন, “আমার কাছে কোনো কলা নেই।” কোনো কিছুই অভাব বোঝানোর জন্যে আপনার সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। আর কোনো বস্তুর অভাবকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টিও কারও মাথায় আসেনি। এ কারণেই শূন্য ছাড়াই মানুষ এতগুলো সময় পার করে দিয়েছে। শূন্যের দরকারই পড়েনি। শূন্যের উদয়ও তাই ঘটেনি।

সত্যি বলতে, প্রাগৈতিহাসিক কালে সংখ্যার জ্ঞান ছিল বড় এক গুণ। গুনতে পারা ছিল দারুণ মেধার পরিচায়ক। একে জাদুমন্ত্রের মতোই অতীন্দ্রিয় ও গুপ্ত মনে করা হত। মিশরীয় বই *বুক অব ডেড-এ* আকেন নামে এক নৌকার মাঝি বিদেহী আত্মাকে নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয়। তিনি একবার একটি মৃত আত্মার মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি “তার আগুলের সংখ্যা জানে না” এমন কাউকে নৌকায় নিতে অস্বীকার করেন। মাঝিকে সন্তুষ্ট করতে তখন আত্মাকে আগুলের সংখ্যা বের করতে একটি গণনার ছড়া আওড়াতে হয়। (অবশ্য গ্রিক গল্পে মাঝি চাইত টাকা, যা মৃত ব্যক্তির জিহ্বার নিচে বাঁধা থাকত)।

প্রাচীন পৃথিবীতে গুনতে পারত হাতে গোনা কিছু মানুষ। তবে সংখ্যা ও গণনার মৌলিক ধারণাগুলো সবসময় মানুষ আয়ত্ত করে লিখতে-পড়তে পারার আগেই। আগেকার যুগের সভ্যতার মানুষ যখন খাগড়া দিয়ে মাটির লিপিতে লিখতে, পাথরে খোদাই করে ছবি আঁকতে ও পশুচর্ম ও প্যাপাইরাসে কালি দিয়ে লিখতে শুরু করে, তত দিনে সংখ্যাপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৌখিক সংখ্যাপদ্ধতিকে লিখিত আকারে উপস্থাপন জটিল কিছু ছিল না। দরকার শুধু একটি সাঙ্কেতিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে লেখকরা সংখ্যাকে আরও স্থায়ী রূপ দিতে পারে। (কিছু কিছু সমাজের মানুষ তো লেখালেখি শেখার আগেই এই কাজটি করে ফেলেছে। যেমন নিরক্ষর ইনকারা কুইপু নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করত। এটা ছিল হিসাব করার জন্য বানানো একটি রঙিন ও গিঁট বাঁধা দড়ি।)

প্রথমদিকের লেখকদের লেখা সংখ্যাগুলোর সাথে তাদের সংখ্যাপদ্ধতির মিল থাকত। আর অনুমিতভাবেই তারা সেটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে লিখত। গণের সময়ের পরে সমাজ জীবনে উন্নতি সাধিত হয়েছে। একের পর এক ছোট ছোট দাগের গুচ্ছ না বানিয়ে লেখকরা প্রতিটি গুচ্ছের জন্যে প্রতীক তৈরি করল। পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিতে লেখক এক লেখার জন্যে হয়ত একটি দাগ দেবেন। পাঁচ-এর একটি গুচ্ছ বোঝাতে আলাদা আরেকটি চিহ্ন ব্যবহার করবেন। ২৫-এর গুচ্ছ বোঝাতে ব্যবহার করবেন অন্য আরেকটি দাগ। এভাবেই চলবে।

মিশরীয়রা ঠিক এই কাজটিই করেছে। ৫ হাজার বছরেরও আগে, পিরামিডও তৈরির আগেই মিশরীয়রা তাদের দশমিক পদ্ধতিকে লেখার রূপ দেওয়ার একটি নিয়ম তৈরি করে। সেখানে তারা ছবি দিয়ে সংখ্যা বোঝাত। একটি খাড়া দাগ দিয়ে এক একক বোঝানো হত। আবার গোড়ালির একটি হাড় দিয়ে বোঝানো হত ১০, একটি মোচড়ানো দড়ি ছিল ১০০ ইত্যাদি। এভাবে সংখ্যা লিখে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে শুধু এই প্রতীকগুলোর গুচ্ছ রেকর্ড করতে হত। এক শ তেইশ বোঝানোর জন্যে ১২৩টি দাগ দেওয়ার বদলে লেখকরা ছয়টি প্রতীক লিখত। একটি রশি, দুটি গোড়ালি ও তিনটি খাড়া দাগ। প্রাচীনকালেই মূলত এভাবেই গাণিতিক কাজ হত। আর অন্য অনেক সভ্যতার মতোই মিশরেও শূন্য ছিল না। বা বলা যায়, প্রয়োজন হয়নি।

তবুও প্রাচীন মিশরীয়রা গণিতে ভালোই হাত পাকিয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও সময় গণনায় তারা কারিশমা দেখিয়েছিল। তার মানে তাদেরকে উন্নত গণিত ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারণ পঞ্জিকার পাতা খুব দ্রুত বদলে যায়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের কাছেই একটি স্থিতিশীল পঞ্জিকা বানানো ছিল বড় এক সমস্যার কাজ। এর কারণ ছিল তারা সাধারণত চান্দ্র পঞ্জিকা দিয়ে কাজ শুরু করতেন। পরপর দুটি পূর্ণিমার মাঝের সময়টুকু ছিল এক মাস। এভাবে গণনা করাই ছিল সহজাত অভ্যাস। আকাশে চাঁদের বড়-ছোট হওয়া সহজেই সবার নজর কাড়ে। আর সময়ের চক্র হিসাব করার জন্যে এখান থেকে সুবিধাজনক একটি উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য হয় ২৯ থেকে ৩০ দিনের মাঝামাঝি। ১২টি মাস যোগ করে সব মিলিয়ে ৩৫৪ দিনের বেশি পাওয়া যায় না। যা সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। চান্দ্র মাস তেরটি নিলে আবার ১৯ দিন বেশি হয়ে যায়। ওদিকে আবার চাষাবাদ নির্ভর করে সৌর বছরের ওপর, চান্দ্র বছর নয়। অসংশোধিত চান্দ্র মাস দিয়ে হিসাব করলে ঋতুর মাসগুলোকে বদলে যেতে দেখা যায়।

চান্দ্র মাসকে সংশোধন করাও আরেক মুশকিলের কাজ। আধুনিক সময়েও সৌদি আরব ও ইসরায়েলসহ অনেকগুলো দেশ এখনও পরিমার্জিত চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে। কিন্তু ৬ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা আরও ভাল একটি সমাধান পেয়ে যায়। তাদের দিনের হিসাব রাখার পদ্ধতিটি ছিল খুবই সরল। সেই পঞ্জিকা ঋতুর সাথে মিল রেখে চলত অনেক দিন পর্যন্ত। সময়ের হিসাব রাখতে তারা চাঁদের বদলে সূর্যের ধারস্থ হয়। যেমনটা বর্তমানে বেশিরভাগ জাতি করেন।

চান্দ্র পঞ্জিকার মতোই তাদের মাস ছিল ১২টি। কিন্তু প্রতিটি মাস ছিল ৩০ দিনের। (১০-ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের এক সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ দিন। বছর শেষ হলে আরও বাড়তি পাঁচটি দিন যোগ করা হত। এতে করে সব মিলিয়ে ৩৬৫ দিন হয়ে যেত। এই পঞ্জিকাই আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডারের আদিরূপ। মিশরীয়দের এই পদ্ধতি গ্রিক ও পরে রোমানরা গ্রহণ করে। রোমানরা একে পরিমার্জন করে অধিবর্ষ যোগ করে। এটাই পরে পাশ্চাত্যে আদর্শ পঞ্জিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে মিশরীয়, গ্রিক ও রোমানদের কাছে শূন্যের ব্যবহার না থাকায় পশ্চিমা পঞ্জিকায়ও নেই শূন্য। এই অমনোযোগই সহস্র বছর পরে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মিশরীয়দের সৌর পঞ্জিকার উদ্ভাবন ছিল দারুণ এক অগ্রগতি। তবে ইতিহাসের পাতায় তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদানের স্বাক্ষরও রাখে। জ্যামিতির জ্ঞান। শূন্য ছাড়াই মিশরীয় অল্প সময়ের মধ্যেই গণিতের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পাশেই একটি উত্তাল নদীর উপস্থিতিতে আসলে না হয়েও উপায় ছিল না। প্রতি বছর নীল নদের পানি উপচে পড়ে এর কূল ভাসিয়ে দিত। বদ্বীপে নেমে আসত বন্যা। একটি ভাল দিকও ছিল এর। উন্নত পলি এসে জমত কৃষি জমিতে। এর ফলে প্রাচীন পৃথিবীতে নীল বদ্বীপ হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি। খারাপ দিকের মধ্যে ছিল সীমানার দাগ হারিয়ে যাওয়া। কৃষকরা বুঝতে পারতেন না কোনটা কার আবাদি জমি। মিশরে মালিকানাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। মিশরীয় বই বুক অব ডেড পড়লে দেখা যায়, একজন মৃত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বলতে হয় যে সে প্রতারণা করে তার প্রতিবেশীর জমি দখল করেনি। এই পাপের শাস্তি ছিল এক ভয়ানক ভক্ষক প্রাণীকে পানির হৃদপিণ্ড খেতে দেওয়া। মিশরে চুরি করা ছিল শপথ ভাঙা, কাউকে হত্যা করা বা মন্দিরের ভেতরে স্বমৈথুনের মতোই কঠিন অপরাধ।

প্রাচীন ফেরাউনরা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ ও নতুন করে সীমানা নির্দেশক স্থাপন করার জন্য জরিপ-আমিন নিয়োগ দিত। আর এভাবেই জন্ম হয় জ্যামিতির। এই জরিপ-আমিন বা দড়ি প্রসারকরা (এ নাম দেওয়ার কারণ তারা পরিমাপের যন্ত্র ও গিঁট বাঁধা রশি দিয়ে সমকোণ বানাত) শেষ পর্যন্ত জমিকে আয়তক্ষেত্র ও ত্রিভুজে বিভক্ত করে ক্ষেত্রফল বের করার কায়দা বের করে। এছাড়া মিশরীয়রা পিরামিডের মতো বিভিন্ন বস্তুর আয়তন মাপার কৌশলও আয়ত্ত করে। পুরো ভূমধ্যসাগর এলাকায় মিশরীয় গণিত খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং সম্ভবত প্রাথমিক যুগের গ্রিক গণিতবিদরা, বিশেষ করে থ্যালিস ও পিথাগোরাসের মতো জ্যামিতিবিদরা মিশরে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু মিশরীয়দের এতসব দারুণ জ্যামিতিক কর্ম সত্ত্বেও মিশরের কোথাও শূন্যের অস্তিত্ব ছিল না।

এর বড় কারণ, মিশরীয়া ছিল কড়া বাস্তববাদী। আয়তন এবং দিন ও ঘণ্টা পরিমাপের বেশি কিছু তারা করতে পারেনি। প্রয়োগ নেই এমন কোনো কিছুতে গণিত তারা কাজে লাগাত না। ব্যতিক্রম হলো জ্যোতিষবিদ্যা (astrology)<sup>২</sup>। এ কারণে মিশরের সেরা গণিতবিদরাও বাস্তব জগতের সাথে অসম্পর্কিত কোনো গাণিতিক সমস্যায় জ্যামিতির মূলনীতিকে কাজে লাগাতে পারতেন না। তারা তাদের গাণিতিক ব্যবস্থাকে বিমূর্ত যুক্তির কাঠামোতে রূপ দিতে পারেনি। গণিতকে দর্শনে স্থান দিতেও তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। গ্রিকরা আবার এমন ছিল না। বিমূর্ত ও দার্শনিক যুক্তিকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন গণিতকে তারাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তবুও তারা শূন্য আবিষ্কার করতে পারেনি। শূন্য এসেছে প্রাচ্য থেকে। পাশ্চাত্য থেকে নয়। //////////////

## শূন্যের জন্ম

সংস্কৃতির ইতিহাসে শূন্যের আবিষ্কার মানুষের অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে সবসময় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

-টোবিয়াস ড্যানজিগ , নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স

মিশরীয়দের চেয়ে গ্রিকরা গণিতটা ভাল বুঝত। শিখেছিল কিন্তু মিশরীয়দের কাছেই। তবে অল্প দিনের মাথায়ই গ্রিকরা গুরুদেবকে ছাড়িয়ে যায়। শুরুতে গ্রিকদের সংখ্যাপদ্ধতি মিশরীয়দের মতোই ছিল। গ্রিকদের একটি ১০-ভিত্তিক গণনাপদ্ধতিও ছিল। দুই সংস্কৃতির সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতেও পার্থক্য ছিল খুব সামান্য। সংখ্যা বোঝাতে মিশরীয়দের মতো ছবি ব্যবহার না করে গ্রিকরা ব্যবহার করল অক্ষর। H (ইটা)<sup>৩</sup> মানে হেকাটন বা ১০০। M (মিউ) মানে মিরিওরি বা ১০,০০০। ইংরেজিতে যাকে বলে মিরিয়াড (myriad)। গ্রিক পদ্ধতিতে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। পাঁচের জন্যেও

তাদের একটি প্রতীক ছিল। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের পদ্ধতিটি ছিল পাঁচ ও দশ-ভিত্তিক পদ্ধতির মিশ্রণ। কিন্তু সার্বিকভাবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত মিশরীয় ও গ্রিকদের লেখার কায়দা ছিল প্রায় একই। তবে মিশরীয়রা একই জায়গায় থেকে গেলেও গ্রিকরা আদিম এই পদ্ধতির উন্নতি করে আরও আধুনিক কৌশল আবিষ্কার করে।

মিশরীয়দের মতো দুটি আঁচড় দিয়ে ২ বা তিনটা H লিখে ৩০০ না বুঝিয়ে নতুন পদ্ধতিতে গ্রিকরা ২, ৩, ৩০০ ও আরও বহু সংখ্যার জন্য (চিত্র ১) আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করল। এ পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সালের আগে। এ কৌশলের মাধ্যমে অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঠেকানো গেল। যেমন, ৮৭ লিখতে হলে মিশরীয় পদ্ধতিতে ১৫টি প্রতীক লাগত। আটটি গোড়ালি ও সাতটি খাড়া দাগ। গ্রিকদের নতুন পদ্ধতিতে সেখানে লেগেছে মাত্র দুটি প্রতীক। ৮০ এর জন্য Π এবং ৭ এর জন্য Ζ। (রোমান পদ্ধতি এসে গ্রিক পদ্ধতিকে অপসারণ করে। কিন্তু রোমানদের পদ্ধতি এক ধাপ পেছনে গিয়ে মিশরীয়দের অনুন্নত পদ্ধতিই গ্রহণ করে। রোমান ৮৭, LXXXVII লিখতে হলে সাতটি প্রতীক লাগে। অনেকগুলো প্রতীকই একাধিকবার এসেছে।)

গ্রিকদের পদ্ধতি মিশরীয়দের চেয়ে উন্নত হলেও এটি প্রাচীনকালে লেখালেখির সবচেয়ে উন্নত কৌশল নয়। এ মর্যাদা পাবে প্রাচ্যের আরেকটি উদ্ভাবন। গণনার ব্যাবিলনীয় কৌশল। আর তাদের পদ্ধতির কারণেই শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যে শূন্যের উদয় ঘটে। বর্তমান ইরাকের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে।

প্রথমে দেখে ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিকে এলোমেলো মনে হবে। প্রথমত, এটা হলো ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতি। দেখতে-শুনতে খুবই অদ্ভুত ঠেকে। কারণ বেশিরভাগ সমাজেই তো ৫, ১০ বা ২০ ছিল ভিত্তি সংখ্যা। এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা তাদের সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে মাত্র দুটি দাগ ব্যবহার করত। একটি কীলক দিয়ে ১ ও একটি ডাবল কীলক দিয়ে ১০। এই দাগ দুটিকে গুচ্ছ গুচ্ছ করে সাজানো হত। যোগফল হত ৫৯ বা তার কম। এই গুচ্ছগুলোই ছিল গণনার মৌলিক প্রতীক। ঠিক যেভাবে গ্রিকদের ছিল অক্ষর আর মিশরীয়দের ছিল ছবি। কিন্তু ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অদ্ভুত দিক এটি নয়। মিশরীয় ও গ্রিকদের যেখানে প্রতিটি প্রতীক দিয়ে আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো হত, সেখানে ব্যাবিলনীয়দের প্রতিটি প্রতীক দিয়ে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো যেত। একটিমাত্র কীলক দিয়ে ১, ৬০, ৩৬০০ বা অন্য আরও অগণিত সংখ্যা প্রকাশ করা হত।

### চিত্র ১: বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যা

আধুনিক চোখ এটা দেখে অবাক হলেও প্রাচীন মানুষের কাছে এটি ছিল খুবই অর্থবহ। একে ব্রোঞ্জ যুগের কম্পিউটার কোড বলা চলে। অন্য অনেক সংস্কৃতির মতোই ব্যাবিলনীয়রাও গণনার কাজে সহায়তা করা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যন্ত্র হলো অ্যাবাকাস। যন্ত্রটা জাপানে *সরোবান*, চীনে *সুয়ান-পান*, রাশিয়ায় *স্কটি*, তুরস্কে *কুলবা*, আর্মেনিয়ায় *কোলেব* এবং অন্যান্য সংস্কৃতি আরও নানান নামে পরিচিত ছিল। অ্যাবাকাসে পিছলানো পাথর ব্যবহার করে সংখ্যার পরিমাণের হিসাব রাখা হত। (ক্যালকুলেট বা হিসাব করা, ক্যালকুলাস ও ক্যালসিয়াম সবগুলো শব্দই নুড়ি শব্দের ল্যাটিন রূপ *ক্যালকুলাস* থেকে আসা।)

পাথরকে উপরে-নীচে নড়াচড়া করেই যোগ করে ফেলা যেত অ্যাবাকাসে। ভিন্ন স্তরের (কলাম) পাথরের সাংখ্যিক মান ছিল ভিন্ন। এগুলোকে নাড়িয়ে দক্ষ ব্যবহারকারী বড় বড় সংখ্যা খুব দ্রুত যোগ করে ফেলতেন। হিসাব শেষ হলে ব্যবহারকারীকে শুধু পাথরের সর্বশেষ অবস্থানের দিকে তাকাতে হত। এবার সেগুলোকে সংখ্যায় রূপান্তর করে নিলেই কেব্লাফতে!////////

ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যা নিয়ে কাজ করার পদ্ধতিটি মাটির ফলকে অ্যাবাকাসকে প্রতীক দিয়ে লিখে ফেলার মতো। প্রতীকের প্রতিটি গুচ্ছ দিয়ে যে নির্দিষ্টসংখ্যক পাথর অ্যাবাকাসে নাড়ানো হয়েছে তা বোঝানো হত। আর অ্যাবাকাসের প্রতিটি কলামের মতোই অবস্থানের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি গুচ্ছের আলাদা আলাদা সাংখ্যিক মান ছিল। এই দিক থেকে আমরা এখন যে পদ্ধতি ব্যবহার করি, ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি অনেকটা একইরকম ছিল। ১১১ এর প্রতিটি ১-এর মান ভিন্ন।

ডান থেকে তাদের মান যথাক্রমে এক, দশ ও একশ ( $111 = 100 + 10 + 1$ )। একইভাবে  $|||$  এর তিনটি আলাদা অবস্থানে  $|$  এর মানে যথাক্রমে এক, ষাট ও ছত্রিশ শ ( $3600$ )। একটি সমস্যা বাদ দিলে এটাও ঠিক অ্যাবাকাসের মতোই ছিল। ব্যাবিলনীয়রা ৬০ লিখত কীভাবে? ১ লেখা তো সহজ। একটি কীলক ( $|$ )। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ৬০-ও লেখা হত এভাবেই। একমাত্র পার্থক্য হলো প্রথম অবস্থানের বদলে  $|$  থাকত দ্বিতীয় অবস্থানে। অ্যাবাকাস দিয়ে বোঝা যেত কোন সংখ্যাটি বোঝানো হচ্ছে। একটিমাত্র পাথর প্রথম কলামে আছে না দ্বিতীয় কলাম আছে তা তো দেখে সহজেই বোঝাই যায়। কিন্তু লিখতে গেলে? একটি লিখিত প্রতীক কোন কলামে ছিল তা লিখে বোঝানোর জন্যে ব্যাবিলনীয়দের কোনো পদ্ধতি ছিল না।  $|$ -এর অর্থ হতে পারত ১, ৬০ বা ৩৬০০। সংখ্যাগুলো মিশ্রিত হলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়।  $||$  এর অর্থ হতে পারে ৬১, ৩৬০১ বা ৩৬৬০ বা আরও বড় কিছু।

### চিত্র ১.২: ৬০-ভিত্তিক ব্যাবিলনীয় সংখ্যা

এ সমস্যার সমাধান হলো শূন্য। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয়রা অ্যাবাকাসের খালি কলাম বা ফাঁকা স্থান বোঝাতে দুটি বাঁকানো কীলক,  $\setminus \setminus$ , ব্যবহার করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বোঝা যেত একটি প্রতীক কোন অবস্থানে আছে। শূন্য আসার আগে  $||$ -কে ৬১-ও বলা যেত, ৩৬০১-ও বলা যেত। কিন্তু শূন্য আসার পরে  $||$  দিয়ে বোঝানো ৬১ আর ৩৬০১ লেখা হত  $| \setminus \setminus |$ । (চিত্র ২)। ব্যাবিলনীয় অঙ্কের নির্দিষ্ট ক্রমকে অনন্য ও স্থায়ী অর্থ প্রদান করতে শূন্যের জন্ম হয়। শূন্য দারণ কাজে আসল। কিন্তু এর ছিল শুধুই স্থানীয় অবস্থান। অ্যাবাকাসের ফাঁকা স্থান ব্যবহার করার জন্যই শুধু একে ব্যবহার করা হলো। অ্যাবাকাসের যে কলামে সবগুলো পাথর নীচে পড়ে থাকত সে কলামের জন্যে। অন্য অঙ্কগুলোকে সঠিক জায়গায় বসানো নিশ্চিত করার চেয়ে তেমন বেশি কোনো ছিল না শূন্যের। এর নিজস্ব কোনো সাংখ্যিক মান ছিল না। আর যাই হোক, ০০,০০,২১,৪৮ আর ২১৪৮ তো একই সংখ্যাই। এক গুচ্ছ অঙ্কের মধ্যে শূন্যের বাঁয়ে কোনো অঙ্ক থাকলে তবেই শূন্য অর্থবহ হয়। এর নিজস্ব বলতে আছে ... শূন্য। শূন্য ছিল একটি অঙ্ক, সংখ্যা নয়। এর কোনো মান ছিল না। //

### চিত্র ২: কিছু ব্যাবিলনীয় সংখ্যা

একটি সংখ্যার মান পাওয়া যায় সংখ্যারেখায় (number line) এর অবস্থান থেকে। অন্য সংখ্যাদের সাপেক্ষে এর অবস্থান তুলনা করে। যেমন, ২ সংখ্যাটি আসে ৩ এর আগে এবং ১ এর পরে। অন্য কোথাও একে রাখার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু সংখ্যারেখায় শূন্যটি দাগের জন্য শুরুতে কোনো অবস্থান ছিল না। এটা ছিল শুধু একটি প্রতীক। সংখ্যাদের ক্রমবিন্যাসে এর জন্যে কোনো স্থান ছিল না। এমনকি এখনও আমরা শূন্যকে অনেকসময় অসংখ্যা (nonnumber) হিসেবে বিবেচনা করি। যদিও আমরা সবাই জানি, শূন্যের আছে একটি সাংখ্যিক মানও। শূন্যের সাংখ্যিক মান না বুঝিয়েও একে স্থান নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করি। টেলিফোন বা কম্পিউটার কিবোর্ডের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। ০ আছে ৯ এর পরে। ১ এর আগে নয়, যেখানে এর থাকার কথা। স্থান নির্দেশক ০ কোথায় বসল তাতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যার ক্রমবিন্যাসে এটি যেকোনো জায়গায়ই বসতে পারে। কিন্তু এখন সবাই জানে, শূন্যকে আসলে সংখ্যারেখার যেকোনো এক জায়গায় বসালে হবে না। কারণ এর নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান আছে। এটিই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য করে। এটি একটি জোড় সংখ্যা। আর এটি ১ এর আগের পূর্ণ সংখ্যা। সংখ্যারেখায় শূন্যকে এর উপযুক্ত জায়গায় স্থান দিতে হবে।  $(+1)$ -এর আগে এবং  $(-1)$ -এর পরে। অন্য কোথাও সংখ্যাটি অর্থপূর্ণ হয় না। তবুও কম্পিউটারে শূন্যের অবস্থান সবার শেষে। আর টেলিফোনে সবার নীচে। কারণ আমরা গুনতে শুরু করি ১ থেকে।

দেখে মনে হয় গণনা শুরুর জন্যে এক  $(1)$ -ই সঠিক সংখ্যা। কিন্তু সেটা করলে শূন্য চলে যাচ্ছে অস্বাভাবিক এক

জায়গায়। মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মায়ান জাতিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এক দিয়ে শুরু করাকে স্বাভাবিক মনে করা হত না। মায়ানদেরও একটি সংখ্যাপদ্ধতি ও পঞ্জিকা ছিল। সেটি আমাদের পদ্ধতির চেয়েও বেশি অর্থবহ ছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই মায়ানদের ছিল অঙ্ক ও স্থানের স্থানীয় মান পদ্ধতি। একমাত্র পার্থক্য হলো, যেখানে ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যার ভিত্তি ছিল ৬০, মায়ানদের সেখানে ভিত্তি ছিল ২০। তারও আগে প্রচলিত ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির ধারণা এতে কাজে লাগানো হয়েছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই তাদেরও প্রতীক অঙ্কের অর্থ খেয়াল রাখার জন্যে একটি শূন্যের দরকার পড়েছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, মায়ানদের দুই ধরনের অঙ্ক ছিল। সরল রূপে ছিল শুধু বিন্দু আর রেখা। আর জটিল রূপটি বানানো হয়েছিল অঙ্কতদর্শন মুখাবয়বের গ্লিফ (glyph) দিয়ে। আধুনিক চোখে আপনার কাছে মায়ানদের লিখিত গ্লিফকে ভিনগ্রহের প্রাণীর মুখের মতোই মনে হবে (চিত্র ৩)।

মিশরীয়দের মতো মায়ানদেরও দারুণ একটি সৌর পঞ্জিকা ছিল। গণনাপদ্ধতি ২০-ভিত্তিক হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই তারা বছরকে ২০ দিন মেয়াদের ১৮টি মাসে বিভক্ত করেছিল। যোগ করলে যা হয় ৩৬০ দিন। বছর শেষে উয়ায়েব নামে বিশেষ পাঁচটি দিন যোগ করে ৩৬৫ বানানো হত। কিন্তু মিশরীয়দের না থাকলেও মায়ানদের গণনাপদ্ধতিতে একটি শূন্য ছিল। ফলে তারা যা করার তাই করল। দিনের হিসাব করা শুরু করল শূন্য থেকে। জিপ মাসের প্রথম দিনকে বলা হত জিপের ইন্সটলেশন বা সংস্থাপন। পরের দিনকে বলা হত ১ জিপ। তার পরে ২ জিপ। এভাবেই চলত ১৯ জিপ পর্যন্ত। পরের দিনকে বলা হত জৎয বা ০ জৎযের সংস্থাপন। এর পরে আসত ১ জৎয, ২ জৎয ইত্যাদি। প্রতি মাসে ছিল ২০টি দিন। যাদেরকে ০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সূচিত করা হত। এখন আমরা যেভাবে লিখি তেমন ১ থেকে ২০ নয়। (মায়ান পঞ্জিকা বিস্ময়কর রকম জটিল ছিল। এই সৌর পঞ্জিকার সাথে একটি অনুষ্ঠানধর্মী পঞ্জিকাও ছিল। এতে ছিল ২০টি সপ্তাহ। প্রতি সপ্তাহে ১৩ দিন। সৌর বছরের সাথে সমন্বিতভাবে এই পঞ্জিকাটি একটি চক্র তৈরি করে। ৫২-বছর দীর্ঘ এই চক্রের পতি দিনের জন্যে ছিল আলাদা আলাদা নাম।)

### চিত্র ৩: মায়ান সংখ্যা

বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যবস্থার চেয়ে মায়ান পদ্ধতি বেশি অর্থপূর্ণ ছিল। পাশ্চাত্যে পঞ্জিকা তৈরির সময় শূন্য ছিল না। এ কারণে আমরা শূন্য দিন বা শূন্য বছর দেখি না। আপাতদৃষ্টিতে শূন্যকে বাদ দেওয়ার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ এর ফলেই কিন্তু অনেক সমস্যা হয়েছে। শূন্য না থাকার কারণে সহস্রাব্দের সূচনা নিয়ে বিতর্ক বাঁধে। একবিংশ শতকের প্রথম বছর কি ২০০০ নাকি ২০০১ তা নিয়ে মায়ানদের বিতর্ক করা লাগত না। কিন্তু আমাদের পঞ্জিকার সূচনা মায়ানরা করেনি। করেছে মিশরীয়রা ও পরে রোমানরা। এ কারণে আমরা সমস্যাময় শূন্যবিহীন পঞ্জিকায় আটকে আছি।

মিশরীয় সভ্যতায় শূন্য না থাকার ব্যাপারটা পঞ্জিকা ও ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্য গণিতের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনে। আসলে গণিতের জন্যে মিশরীয় সভ্যতা একাধিক কারণে নেতিবাচক ফল বয়ে আনে। শুধু শূন্যের অভাবই ভবিষ্যতের জন্যে সমস্যা তৈরি করেনি। ভগ্নাংশ নিয়েও কাজ করার ভাল কোনো উপায় তারা বের করতে পারেনি। এখন আমরা ৩/৪ কে যেমন চারভাগের তিন ভাগ মনে করি তারা সেভাবে দেখত না। তারা একে নিছক ১/২ ও ১/৪ এর যোগফল হিসেবে দেখত। ২/৩ ছাড়া সব ভগ্নাংশকে মিশরে 1/n আকারে সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা হত। (যেখানে n একটি গণনাসংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা, মানে ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি)। 1/n কে বলা হত তথাকথিত একক ভগ্নাংশ। এই একক ভগ্নাংশদের বিশাল সারির কারণে মিশরীয় (ও গ্রিক) সংখ্যাপদ্ধতিতে অনুপাত নিয়ে কাজ করা ছিল দারুণ কঠিন এক কাজ।

শূন্যের আবির্ভাব এ অসুবিধা দূর করল। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে শূন্য ছিল। ফলে ভগ্নাংশ লেখা সহজ হয়ে গেল। আমরা ১/২ কে ঠিক যেভাবে ০.৫ লিখতে পারি বা ৩/৪ কে ০.৭৫, একইভাবে ব্যাবিলনীয়রা ১/২কে লিখত ০;৩০, ৩/৪কে লিখত ০;৪৫। (আসলে ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করতে ব্যাবিলনীয়দের ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের আধুনিক ১০-ভিত্তিক

পদ্ধতির চেয়ে বেশি সুবিধাজনক।)

দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রোমান ও গ্রিকরা শূন্যকে ঘৃণা করত। সে ঘৃণার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তারা ব্যাবিলনীয়দের পদ্ধতিতে না গিয়ে মিশরীয়দের প্রতীক নিয়ে পড়ে রইল। অথচ ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি ছিল সহজ। জ্যোতির্বিদ্যার সারণি বানানোসহ নানান কাজে জটিল হিসেব-নিকেশ করা দরকার হয়। গ্রিক পদ্ধতি এতই জটিল ছিল যে গণিতবিদরা একক ভগ্নাংশগুলোকে ব্যাবিলনীয় ৬০-ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করত। তারপর হিসেব শেষ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে আবার গ্রিক রূপ দান করত। চাইলেই তারা অনেক সময় বাঁচাতে পারত। (ভগ্নাংশকে বারবার রূপান্তর করতে কেমন মজা তা সবাই জানি) কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে এতই ঘৃণা করতে যে তারা একে তাদের সংখ্যাপদ্ধতিতে স্থান দিতে অস্বীকার করে। যদিও সুবিধা সম্পর্কে জানত। কারণ শূন্যকে তারা মনে করত ভয়ঙ্কর।

## শূন্যের ভয়ানক বৈশিষ্ট্য

*সবচেয়ে প্রাচীন সময়ে বাস করত ইমির। ছিল না জল বা স্থল। বা কোনো নোনা তরঙ্গ। ছিল না নভোমণ্ডল বা ভূমণ্ডল।  
ছিল শুধু হাঁ করে থাকা শূন্যতা। কোথাও ছিল না সবুজের বিস্তার।*

-দ্য এলডার এডা

সংখ্যাকে আবার মানুষ ভয়! এটা কল্পনা করাও কঠিন। তবুও শূন্যতা বা অনস্তিত্বের সাথে শূন্যকে জোর করে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল ভয়ের বড় একটি কারণ। শূন্য নিয়েও ছিল ভয়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষ মনে করত, মহাবিশ্বের জন্মের আগে ছিল শুধু শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা। গ্রিকরা বলত, শুরুতে অন্ধকার ছিল সবকিছুর জনক। অন্ধকার থেকে এল বিশৃঙ্খলা। অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় বাকি সব সৃষ্টির। হিব্রু সৃষ্টি পুরাণে আছে, ঈশ্বর আলো ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করার আগে পৃথিবী ছিল বিশৃঙ্খল ও ফাঁকা। (হিব্রু কথাটি হলো *তোহু ভ বহু*। রবার্ট গ্রেভসের মতে এই *তোহু* শব্দের সাথে *তেহমত* শব্দটি জড়িত। *তেহমত* হলো একটি সেমেটীয় ড্রাগন, যা মহাবিশ্বের জন্মের সময় উপস্থিত ছিল। এর দেহ থেকে আসে পৃথিবী ও আকাশ। আর *বহু* সাথে সম্পর্ক ছিল *বেহমত*। এর, যা হলো হিব্রু রূপকথার বিখ্যাত দানব।) প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যে একজন স্রষ্টার কথা বলা হয়, যিনি বিশৃঙ্খলার মাখনকে মত্তন করে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। নর্স পুরাণে আছে একটি উন্মুক্ত শূন্যতার কথা, যা বরফ দিয়ে আবৃত হয়। আর আগুন ও বরফের মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় আদি দানবের। মহাবিশ্বের আদিম ও সহজাত অবস্থা ছিল শূন্য ও বিশৃঙ্খল। সময়ের সমাপ্তিতে শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা আবার ফিরে আসার ভয় সবসময় তাড়া করে ফিরত। শূন্য ছিল সেই শূন্যতারই প্রতিচ্ছবি। //////////////

কিন্তু শূন্যের ভয় শূন্যতা নিয়ে অস্বস্তিকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রাচীন মানুষের কাছে শূন্যের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ব্যাখ্যাশীল। যেমনিভাবে রহস্যের চাদরে ঢাকা ছিল মহাবিশ্বের জন্ম। এর কারণ শূন্য অন্য সংখ্যা থেকে আলাদা। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অন্য সংখ্যার মতো শূন্যের কখনও নিজস্ব মর্যাদা ছিল না। এর কারণটাও যথায়থ ছিল। নিঃসঙ্গ শূন্যের আচরণ ভাল নয়। কম করে বললেও, এটি অন্য সংখ্যার মতো আচরণ করে না।

একটি সংখ্যাকে নিজের সাথে যোগ করুন। এটি পাল্টে যাবে। একের সাথে এক যোগ করলে এক হয় না। হয় দুই। দুইয়ের সাথে দুই যোগ করলে হয় চার। কিন্তু শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। এটি আর্কিমিডিসের উপপাদ্য মেনে চলে না, যা সংখ্যার মৌলিক একটি নীতিমালা। উপপাদ্যটি বলছে, কোনো কিছুকে যথেষ্টসংখ্যক বার নিজের সাথে যোগ করলে এটি মানের দিক দিয়ে সকল সংখ্যার চেয়ে বড় হয়ে যাবে। (আর্কিমিডিসের উপপাদ্যকে প্রকাশ করা হয়েছিল ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে। দুটো অসমান ক্ষেত্রফলের পার্থক্যকে একটি সংখ্যা মনে করা হত) কিন্তু শূন্য তো কখনও বড় হয় না। এটি অন্য সংখ্যাকেও বড় করতে পারে না। দুই ও শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। যেন আপনি সংখ্যার যোগ করাকেই খোড়াই কেয়ার করছেন। বিয়োগ করলেও ঘটে একই কাণ্ড। দুই থেকে শূন্য বিয়োগ করলেও দুই-ই

পাচ্ছেন। শূন্যের যেন কোনো দামই নেই। তবু এই দামহীন সংখ্যাই গুণ ও ভাগের মতো গণিতের সবচেয়ে সরল কাজগুলোকে অর্থহীন করে দিতে চায়।

সংখ্যার জগতে গুণ হলো এক ধরনের প্রসারণ। আক্ষরিক অর্থেই বলছি। মনে করুন, সংখ্যারেখা হলো একটি রবারের ফিতা। যার গায়ে বিভিন্ন দাগ দেওয়া আছে। (চিত্র ৪) দুই দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাকে দুই গুণ প্রসারিত করা। আগে যে দাগটি এক ছিল, এখন সেটি দুই। আগে যে দাগটি তিন নম্বর অবস্থানে ছিল, এখন তার অবস্থান ছয়ে। একইভাবে একের অর্ধেক দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাটাকে একটু শিথিল করা। আগে যে দাগটি ছিল দুই নং অবস্থানে, এখন সেটি আছে এক নং অবস্থানে। আগে যে দাগটি ছিল তিনে, এখন সেটি আছে দেড়ে। কিন্তু শূন্য দিয়ে গুণ করলে কী হবে?

#### চিত্র ৪: রবারের গুণের ফিতা

যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়। ফলে সবগুলো দাগ চলে আসে শূন্যতে।

রবারের ফিতা শেষ। পুরো সংখ্যারেখাই শেষ।

দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এই অপ্রিয় সত্যকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই হয়। এটা আমাদের সংখ্যাপদ্ধতির একটি নিয়ম। দৈনন্দিন সংখ্যাগুলোকে অর্থবহ হতে হলে তার বণ্টন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। একটা উদাহরণ চিন্তা করুন। ধরুন, একটি খেলনার দোকানে বল বিক্রি করা হয় দুটি করে আর ইট বিক্রি করা হয় তিনটি করে। পাশের খেলনার দোকানে বিক্রি হয় দুটি বল ও তিনটি ইটের মিশ্রিত প্যাক। এক ব্যাগ বল ও এক ব্যাগ ইট মিলে যা হয়, পাশের দোকানটির একটি মিশ্রণ প্যাকও তাই হয়। ব্যাপারটা ঠিক থাকবে যদি এক দোকানের সাত ব্যাগ বল ও সাত ব্যাগ ইট পাশের দোকান থেকে কেনা মিশ্রণ প্যাকের সাতটির সমান হয়। এটাই বণ্টন ধর্ম। গাণিতিকভাবে আমরা বলি,  $9 \times 2 + 9 \times 3 = 9 \times (2+3)$ । সবকিছু ঠিক আছে।

এই বৈশিষ্ট্য শূন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অদ্ভুত ফল মিলবে। আমরা জানি,  $0 + 0 = 0$ । তাহলে একটি সংখ্যাকে ০ দিয়ে গুণ করা আর  $(0 + 0)$  দিয়ে গুণ করা একই হবে। উদাহরণ দেখা যাক।  $2 \times 0 = 2(0 + 0)$ । কিন্তু বণ্টন ধর্ম বলছে,  $2(0 + 0)$  আর  $2 \times 0 + 2 \times 0$  একই জিনিস। কিন্তু এর অর্থ হবে  $2 \times 0 = 2 \times 0 + 2 \times 0$ ।  $2 \times 0$  এর মান যাই হোক, একে এর সাথে যোগ করলে আগের মানই থাকে। একে অনেকটা শূন্যের মতোই মনে হয়। আসলেই এটি তাই। সমীকরণের দুই পাশ থেকে  $2 \times 0$  বিয়োগ করলে আমরা দেখি  $0 = 2 \times 0$ । অতএব, আপনি যাই করেন না কেন, একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই মিলবে। এই বিরক্তিকর সংখ্যাটা সংখ্যারেখাকে দুমড়ে-মুচড়ে বিন্দু বানিয়ে দেয়। তবে এই বৈশিষ্ট্য বিরক্তিকর হলেও শূন্যের আসল ক্ষমতা টের পাওয়া যায় গুণের বদলে ভাগ দিতে গেলে।

ঠিক যেভাবে গুণ সংখ্যারেখাকে প্রসারিত করে, তেমনি ভাগ করে সঙ্কুচিত। দুই দিয়ে গুণ করলে সংখ্যারেখা দুই গুণ প্রসারিত হবে। দুই দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যারেখার রবারের ফিতা দুই গুণ শিথিল হবে। গুণের প্রভাব বাতিল হয়ে যাবে। ভাগ করলেই গুণের প্রভাব চলে যায়। সংখ্যারেখায় প্রসারিত হওয়া দাগ চলে আসবে এর আগের জায়গায়। ( $2 \times 3 = 6$  হলে  $6 \div 2 = 3$  বা  $6 \div 3 = 2$  হবে। গুণ ও ভাগ পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।)

শূন্য দিয়ে গুণ করলে কী হতে পারে তা আমরা দেখেছি। সংখ্যারেখার বিলুপ্তি ঘটে। শূন্য দিয়ে ভাগ হওয়া উচিত শূন্য দিয়ে গুণের বিপরীত। ধ্বংস হওয়া সংখ্যারেখাকে এর ফিরিয়ে আনা উচিত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয় না।

আগের উদাহরণে আমরা দেখলাম,  $2 \times 0$  এর মান ০। অতএব, আগের অবস্থায় যেতে হলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে,  $(2 \times 0)$ কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ২ ফেরত পাওয়া যাবে। একইভাবে  $(3 \times 0)$ কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৩ পাওয়ার কথা।  $(8 \times 0)$ কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৮ পাওয়ার কথা। কিন্তু আমার তো দেখলামই,  $2 \times 0$ ,  $3 \times 0$  ও  $8 \times 0$  এর



প্রতিটির মান ০। অতএব,  $(2 \times 0) \div 0$  এর মান  $0 \div 0$ ,  $(3 \times 0) \div 0$  এর মানও  $0 \div 0$ । একই মান  $(8 \times 0)$ -এরও। কিন্তু হায়! এর মানে দাঁড়ায়,  $0 \div 0$  হলো ২ এর সমান। শুধু তাই নয়, এটা ৩-এরও সমান। ৪-এরও। এর কোনো অর্থই হয় না। //

$1 \div 0$  এর দিকে একটি ভিন্নভাবে তাকালেও অদ্ভুত জিনিসের দেখা মেলে। গুণ করলে ভাগের প্রভাব দূর হওয়ার কথা। ফলে  $1 \div 0$  এর মান হওয়ার কথা ১। কিন্তু আমরা তো দেখলামই, যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই পাওয়া যায়। এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ১ হবে। অন্তত আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংখ্যা দেখিনি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হলো, জোর করে শূন্য দিয়ে ভাগ দিতে গেলে যুক্তি ও গণিতের পুরো ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে। শূন্য দিয়ে একবার, মাত্র একবার, ভাগ দিয়েই আপনি মহাবিশ্বের সবকিছু গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন  $1 + 1 = 82$ । এটা থেকে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এরশাদ ছিলেন ভিনগ্রহের একজন বাসিন্দা, কাজি নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন উজবেকিস্তানে। অথবা আকাশটা গোল গোল নকশা দিয়ে সাজানো। (উইনস্টন চার্চিল যে একটি গাজর ছিল তা দেখতে পরিশিষ্ট ক পড়ুন।)

শূন্য দিয়ে গুণে ধ্বংস হয় সংখ্যারেখা। কিন্তু শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ধ্বংস হয় পুরো গাণিতিক কাঠামো।

এই একটি সরল সংখ্যার অনেক ক্ষমতা। গণিতে সংখ্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শূন্যের অদ্ভুত গাণিতিক ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পাশ্চাত্যের মৌলিক দর্শন একে গ্রহণ করেনি।//

#### অনুবাদকের নোট

১। ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্গত ইরাক, সিরিয়া, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, জর্দান, মিশরের নীলনদ এলাকা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ও ইরানের পশ্চিমাংশকে একত্রে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বলে। ম্যাপে একে দেখতে অর্ধচন্দ্রের মতো লাগে।

২। জ্যোতিষবিদ্যা হলো গ্রহ-নক্ষত্র দেখে পৃথিবীর ঘটনার পূর্বাভাস বলার প্রচেষ্টার নাম, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একে মানুষ অনেক সময় জ্যোতির্বিদ্যার (astronomy) সাথে গুলিয়ে ফেলেন, যা বিজ্ঞানের একটি শাখা।

৩। এগুলো গ্রিক ভাষার বড় হাতের অক্ষর। আমরা সাধারণত ছোট হাতের অক্ষর দেখি। ছোট হাতের ইটা হলো  $\eta$  এবং মিউ হলো  $\mu$ ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### শূন্যতা থেকে শুধু শূন্যতাই মেলে

[পাশ্চাত্যে শূন্যের প্রত্যাখ্যান]

শূন্যতা থেকে কোনো কিছুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। —লুক্রেশিয়াস, দে রেবলম্ব নাটুরা

পাশ্চাত্য দর্শনের মৌলিক একটি ধারণার সাথে শূন্যের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেই ধারণাটির মূলে ছিল পিথাগোরাসের সংখ্যার দর্শন। জেনোর<sup>১</sup> প্যারাডক্সগুলোর মাধ্যমে ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরো গ্রিক সমাজের মূল ধারণাই ছিল: ভয়েড বা শূন্যতা (void) বলতে কিছু নেই।

গ্রিক সভ্যতার পতনের অনেক দিন পরেও পিথাগোরাস, এরিস্টটল ও টলেমিদের গড়া গ্রিক সমাজ টিকে ছিল। সেই সমাজে শূন্যতা বলতে কিছু ছিল না। ছিল না শূন্য। এ কারণে পাশ্চাত্য প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত শূন্যকে মেনে নিতে পারেনি। এর ফল হলো অনেক খারাপ। শূন্যের অভাবে গণিতের অগ্রগতি থমকে থাকে। বিজ্ঞানে নতুন নতুন চিন্তার দ্বার থাকে রুদ্ধ। এছাড়াও ঘটনাক্রমে পঞ্জিকায় গণ্ডগোল তৈরি করে। শূন্যকে গ্রহণ করতে হলে পাশ্চাত্যের দার্শনিকদেরকে তাদের সামাজিক কাঠামো ধ্বংস করতে হত।

### গ্রিক সংখ্যা-দর্শনের উৎপত্তি

আদিতে ছিল অনুপাত, অনুপাত ছিল ঈশ্বরের সাথে, আর অনুপাতই ছিল ঈশ্বর।<sup>২</sup>

- যোহন ১:১

জ্যামিতির আবিষ্কারক মিশরীয়রা গণিত নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেনি। তাদের কাছে এটা ছিল দিন গণনা ও ভূমির বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণের একটি হাতিয়ার। তবে গ্রিকদের চিন্তাধারা ছিল আলাদা। তারা মনে করত, সংখ্যা ও দর্শনকে আলাদা করা সম্ভব নয়। দুটোকেই তারা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল। আসলে সংখ্যা নিয়ে গ্রিকরা বাস্তবিক অর্থেই খুবই উৎসাহী ছিল।

মেটাপনটামের হিপাসাস জাহাজের ডেকে উঠে দাঁড়ালেন। নিলেন মরার প্রস্তুতি। চারপাশ ঘিরে রয়েছে একটি গোপন ভাৎসজ্জের সদস্যরা। যাদের বিশ্বাস নষ্ট করেছেন তিনি। হিপাসাস এমন একটি গোপন জিনিস প্রকাশ করেছেন যা গ্রিকদের চিন্তার কৌশলের জন্যে প্রাণঘাতী ছিল। ঐ ভাৎসজ্জ যে দর্শন দাঁড় করাতে চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করার মতো একটি গোপনীয় জিনিস ছিল সেটি। সেই গোপন জিনিস প্রকাশের দায়ে মহান পিথাগোরাস নিজে হিপাসাসকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যদণ্ড দেন। সংখ্যা-দর্শনকে বাঁচাতে ঐ সজ্জ খুনও করত। কিন্তু হিপাসাস যে গোপন জিনিস ফাঁস করেছিলেন, সেটা শূন্যের তুলনায় তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। //

ঐ সজ্জের নেতা ছিলেন প্রাচীনকালের প্রগতিবাদী পিথাগোরাস। বেশিরভাগ বর্ণনা অনুসারে তুরস্কের নিকটবর্তী গ্রিক দ্বীপ সামোসে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সালে তাঁর জন্ম। দ্বীপটা হেরা দেবীর মন্দির ও খুব উন্নত মন্দির জন্যে বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পিথাগোরাসের ধ্যানধারণাগুলো হার মানায় সে কুসংস্কারকেও। তাঁর দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল, তিনি দ্রোজান বীর ইউফরবাসের নবজন্মপ্রাপ্ত রূপ। এ কারণে পিথাগোরাস জোরালোভাবে মনে করতেন, মৃত্যুর পরে প্রাণীদেরসহ সকল আত্মা নতুন দেহে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে তিনি ছিলেন কঠোর নিরামিষভোজী। তবে সিম খেতেন না, কারণ এতে পেট ফুলে যায়। দেখতেও লাগে লজ্জাস্থানের মতো।

হয়ত পিথাগোরাস প্রাচীনকালের একজন প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ হয়ে থাকবেন। তবে তিনি ছিলেন জাঁদরেল বক্তা। প্রখ্যাত পণ্ডিত। আর জাদুকরী একজন শিক্ষক। কথিত আছে, তিনি ইতালিতে বসবাসরত গ্রিকদের জন্যে সংবিধান রচনা করেছিলেন। ছাত্ররা দলে দলে জড় হত তাঁর কাছে। অল্প দিনের মাথায়ই তিনি একদল উচ্চপদস্থ ও উৎসুক শিষ্য পেয়ে গেলেন।

পিথাগোরীয়রা নেতার অনুশাসন মেনে চলত। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম ছিল, মহিলাদের সাথে একান্তে সময় কাটানো উচিত শীতকালে। গ্রীষ্মকালে এটা করা যাবে না। তাদের মতে, খাবার ঠিক মতো হজম না হওয়াই সব রোগের মূল কারণ, খাওয়া উচিত শুধু কাঁচা খাবার, পানি ছাড়া অন্য কিছু পান করা ঠিক নয় এবং পশমি কাপড় কোনোমতেই পরা যাবে না।

গ্রিকরা তাদের সংখ্যাগুলো পায় মিশরীয় জ্যামিতিকদের কাছ থেকে। এ কারণে গ্রিক গণিতে আকৃতি ও সংখ্যার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। গ্রিক গণিত ও দার্শনিকদের কাছে এ দুটো জিনিস ছিল একই। (তাদের প্রভাবের কারণে এমনকি আজও আমরা বর্গ সংখ্যা ও ত্রিভুজ সংখ্যা দেখতে পাই) [চিত্র ৫] সে কালে গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করা সুন্দর একটি ছবি আঁকার মতোই সহজ ছিল। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদরা পেন্সিল ও কাগজের বদলে ব্যবহার করত কম্পাস ও রুলার। আর গ্রিকদের কাছে আকৃতি ও সংখ্যার সম্পর্ক ছিল খুব গভীর ও গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি সংখ্যা-আকৃতির (number-shape) ছিল একটি করে গোপন অর্থ। আর সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা-আকৃতিগুলোকে পবিত্র মনে করা হত।

স্বাভাবিকভাবেই পিথাগোরীয়দের আধ্যাত্মিক প্রতীকও ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি: পেন্টাগ্রাম বা পাঁচকোণা তারা (pentagram)। এই ছোট ছবিটিই অসীমের একটি ছোট্ট নমুনা। তারার রেখাগুলোকে জড়িয়ে আছে পঞ্চভুজটি (pentagon)। পঞ্চভুজের কোণাগুলোকে রেখার সাথে যোগ করলে একটি ছোট ও উল্টানো (ওপরটা নীচে, নীচটা ওপরে) পাঁচকোণা তারা পাওয়া যায়। যা অনুপাতের দিক থেকে ঠিক আগের তারাটির মতোই। এতেও আবার আরও ছোট একটি পঞ্চভুজ আছে। যাতে আছে আরও ছোট একটি তারা ও ছোট একটি পঞ্চভুজ। এভাবে চলতেই থাকে (৬ নং চিত্র দেখুন)। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই স্ব-পুনরাবৃত্তি কিন্তু পিথাগোরীয়দের কাছে পেন্টাগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেটা লুকানো ছিল তারার রেখার মধ্যে। এগুলোর মধ্যে ছিল একটি সংখ্যা-আকৃতি, পিথাগোরীয়দের কাছে যা ছিল মহাবিশ্বের চূড়ান্ত প্রতীক। তার নাম সোনালী অনুপাত (Golden ratio)।

চিত্র ৫: বর্গ ও ত্রিভুজ সংখ্যা

চিত্র ৬: পেন্টাগ্রাম

সোনালী অনুপাত গুরুত্বও পেয়েছে একটি পিথাগোরীয় আবিষ্কার থেকে। যদিও এখন সেটা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। আধুনিক স্কুলগুলোতে শিশুরা পিথাগোরাসের নাম শোনে তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যটির জন্যেই: সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপরা দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। তবে এটা আসলে আরও প্রাচীন আবিষ্কার। পিথাগোরাসের জন্মের ১,০০০ বছরেরও বেশি সময় আগে এটা মানুষ জানত। প্রাচীন গ্রিসে মানুষ পিথাগোরাসকে চিনত অন্য একটি

আবিষ্কারের জন্যে। সেটা হলো সঙ্গীত গ্রাম।

লোককাহিনী অনুসারে একদিন পিথাগোরাস একটি একতারা নিয়ে খেলছিলেন। যা একটি বক্স ও একটি তার দিয়ে তৈরি (চিত্র ৭)। একটি সোয়াড়িকে একতারার উপরে-নীচে নামিয়ে পিথাগোরাস তাঁর যন্ত্রের সুর পরিবর্তন করতেন। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, তারের একটি অদ্ভুত কিন্তু অনুমেয় আচরণ লক্ষ্যণীয়। সোয়াড়ি ছাড়া তারকে টান দিলে একটি পরিষ্কার সুর পাওয়া যায়। এর নাম মৌলিক সুর। সোয়াড়িকে একতারায় রেখে তারের সাথে স্পর্শ করলে বাজতে থাকা সুর পাল্টে যায়। সোয়াড়িকে একতারার ও তারের ঠিক মাঝখানে রাখলে তারের দুই অংশেই একই সুর বাজে। এই সুর হয় তারের মৌলিক সুরের চেয়ে পুরোপুরি এক অষ্টক বেশি। সোয়াড়িকে একটু সরালে হয়ত এক অংশে তারের তিন পঞ্চমাংশ ও অপর অংশে দুই পঞ্চমাংশ থাকল। পিথাগোরাস দেখলেন, তারের অংশগুলোকে ধরে টান দিলে দুটি নিখুঁত পঞ্চক সুর তৈরি হয়। একেই সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্মৃতি-জাগানিয়া সঙ্গীত মিশ্রণ বলা হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে পাওয়া যায় ভিন্ন সুর। সেটা আনন্দদায়কও হতে পারে, বিরক্তিকরও হতে পারে। (যেমন, বেসুরো ত্রিসুরকে (tritone) বলা হয় সঙ্গীতের প্রেত। মধ্যযুগের সঙ্গীত বিশারদরা এই সুর গ্রহণ করেননি। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পিথাগোরাস যখন সোয়াড়িকে তারের এমন জায়গায় রাখলেন যেখানে তার সরল অনুপাতে বিভক্ত হয় না, তখন সৃষ্ট সুর ভাল হয় না। উৎপন্ন শব্দ হত বেসুরো। মাঝেমাঝে হত অনেক খারাপ। মাঝেমাঝে তো সুর পাগলের মতো উঠা-নামা করত।

পিথাগোরাসের কাছে সঙ্গীত ছিল একটি গাণিতিক চর্চা। বর্গ ও ত্রিভুজের মতোই রেখারাও ছিল সংখ্যা-আকৃতি। অতএব, একটি তারকে দুই ভাগ করা আর দুই সংখ্যার একটি অনুপাত নিয়ে কাজ করা একই কথা। একতারার ঐকতান আসলে গণিতেরই ঐকতান। এবং প্রকারান্তরে মহাবিশ্বেরই ঐকতান। পিথাগোরাস ধরে নিলেন, শুধু সঙ্গীতকেই নয়, অনুপাত সকল সৌন্দর্যকেই নিয়ন্ত্রণ করে। পিথাগোরীয়রা মনে করতেন, অনুপাত সঙ্গীত ও ভৌত সৌন্দর্যের এবং গাণিতিক সৌন্দর্যের নিয়ন্তা। প্রকৃতিকে বোঝা অনুপাতের গাণিতিক বিধি বোঝার মতোই সরল কাজ।

#### চিত্র ৭: মরমি একতারা

সঙ্গীত, গণিত ও প্রকৃতির পরস্পর পরিবর্তনীয়তার এই দর্শনের ওপর নির্ভর করেই পিথাগোরীয়দের প্রাথমিক গ্রহমডেল তৈরি হয়। পিথাগোরাস বললেন, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। আর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্ররা ঘুরছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। যার প্রতিটি আছে নিজ নিজ গোলকে (চিত্র ৮)। গোলকগুলোর সাইজের অনুপাত ছিল সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। গোলকের চলনের তালে তালে তৈরি হত সঙ্গীত। সবচেয়ে বাইরের গ্রহ বৃহস্পতি ও শনি<sup>৩</sup> ঘুরত সবচেয়ে জোরে। ফলে এদের স্বরগ্রামের সুর হয় সবচেয়ে বেশি। চাঁদের মতো সবচেয়ে ভেতরের দিকের বস্তুগুলোর সুর ছিল হালকা। সবমিলিয়ে চলমান গ্রহগুলো গোলকের মধ্যে একটি ঐকতান তৈরি করেছিল। আর মহাকাশে বাজতে থাকে সুন্দর সুন্দর সব গাণিতিক গীত। 'সবকিছুই সংখ্যা' বলে পিথাগোরাস এটাই বুঝিয়েছিলেন।

#### চিত্র ৮: গ্রিক মহাবিশ্ব

প্রকৃতিকে জানার মূল মাধ্যম ছিল অনুপাত। এ কারণে পিথাগোরীয় এবং তাদের পরে গ্রিক গণিতবিদরা অনুপাতের বৈশিষ্ট্য জানার প্রচেষ্টা চালিয়েই বেশিরভাগ সময় পার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা অনুপাতকে ১০টি আলাদা ভাগে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে একটি নাম হলো তরঙ্গ গড় (harmonic mean)। এমন একটি গড়ই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর<sup>৪</sup> সংখ্যা তৈরি করেছে। এটা হলো সোনালী অনুপাত।

মোহনীয় এই গড়টি পেতে হলে একটি রেখাকে বিশেষ উপায়ে বিভক্ত করতে হবে। একে এমনভাবে ভাগ করতে হবে

যাতে ছোট ও বড় অংশের অনুপাত বড় অংশ ও পুরো অংশের অনুপাতের সমান হয় (দেখুন পরিশিষ্ট খ)। এভাবে বললে জিনিসটাকে তেমন কিছু মনে হয় না। কিন্তু এই অনুপাত থেকে পাওয়া ছবিগুলোকে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস মনে হয়। এমনকি আজকের দিনেও স্থপতিরা সহজাতভাবেই জানেন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই অনুপাত মেনে বানানো স্থাপনা সবচেয়ে নান্দনিক হয়। এ কারণেই শিল্প ও স্থাপত্যের বহু জায়গায় এই অনুপাতের ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু ইতিহাস ও গণিতবিদের মতে পার্থানন নামের রাজকীয় অ্যাথেনীয় মন্দির এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে এর প্রতিটি দিকেই সোনালী অনুপাত দৃশ্যমান হয়। এমনকি প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলেও দেখা যায় সোনালী অনুপাতের উপস্থিতি। শামুকজাতীয় প্রাণীদের পরপর দুটি প্রকোষ্ঠের আকারের অনুপাত তুলনা করুন। অথবা আনারসের ডানাবর্তী ও বামাবর্তী খাঁজগুলোর অনুপাত দেখুন। দেখা যাবে এই অনুপাত সোনালী অনুপাতের খুব কাছাকাছি।

পেন্টাগ্রাম হয়ে ওঠে পিথাগোরীয় ত্রাসঙ্কেতের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক। এর কারণ হলো পেন্টাগ্রামের রেখাগুলোও এই বিশেষ উপায়ে গঠিত। সোনালী অনুপাত দিয়ে পরিপূর্ণ। আর পিথাগোরাস মনে করতেন সোনালী অনুপাত হলো সব সংখ্যার রাজা। শিল্পী ও প্রকৃতির কাছে সোনালী অনুপাত সমানে ভালবাসা পায়। এ যেন পিথাগোরাসের কথারই প্রতিধ্বনি: সঙ্গীত, সৌন্দর্য, স্থাপত্য ও মহাবিশ্বেরই গঠন একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও অবিচ্ছেদ্য। পিথাগোরীয়দের মতে অনুপাতই মহাবিশ্বের নিয়ন্তা। আর একসময় যা শুধু ভাবত পিথাগোরীয়রা, অল্পদিনের মাথায়ই তা পুরো পাশ্চাত্য বিশ্বেরই ভাবনা হয়ে দাঁড়াল। নান্দনিকতা, অনুপাত ও মহাবিশ্বের অতিপ্রাকৃত সম্পর্ক পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান ও দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসে পরিণত হলো। শেক্সপিয়রের সময় পর্যন্তও বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুপাতের কক্ষপথের প্রদক্ষিণ নিয়ে কথা বলতেন। বলতেন পুরো মহাবিশ্বে প্রবহমান স্বর্গীয় গীতের কথা।

#### চিত্র ৯: পার্থানন, শামুকের খোলস ও সোনালী অনুপাত

পিথাগোরীয় সংস্কৃতিতে শূন্যের কোনো স্থান ছিল না। সংখ্যা ও আকৃতির সমতুল্যতা প্রাচীন গ্রিকদেরকে জ্যামিতির নায়ক বানিয়েছিল। কিন্তু এতে ছিল এক বিশাল অসুবিধা। এ ধারণার কারণে শূন্যকে সংখ্যা বিবেচনার কথাটি কারও মাথায় আসেনি। শূন্যের আবার কিসের আকৃতি থাকবে?

দুই একক দৈর্ঘ্য ও দুই একক প্রস্থের একটি বর্গ কল্পনা করা খুব সহজ। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি বর্গ কেমন হবে? দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নেই, নেই কোনো উপাদানও- এমন কিছুকে বর্গ হিসেবে কল্পনা করা কঠিন একটি কাজ। ফলে শূন্য দিয়ে গুণ করাও ছিল অর্থহীন কাজ। দুটি সংখ্যাকে গুণ করা মানেই একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া। কিন্তু শূন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি আয়তের ক্ষেত্রফল কত হতে পারে?

বর্তমানে গণিতের বড় বড় অমীমাংসিত সমস্যাগুলোকে উপস্থাপন করা হয় গণিতবিদদের পক্ষে সমাধানের অযোগ্য অনুমান (conjecture) আকারে। তবে প্রাচীন গ্রিসে সংখ্যা-আকৃতিগুলো ভিন্ন একটি চিন্তার উপায় খুলে দিয়েছিল। সে সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত অমীমাংসিত সমস্যাটি ছিল জ্যামিতির। শুধু কম্পাস ও রুলার দিয়ে আপনি কি এমন একটি বর্গ আঁকতে পারবেন, যার ক্ষেত্রফল একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান? এই যন্ত্রগুলো দিয়ে আপনি কি একটি কোণকে তিন ভাগ করতে পারবেন? জ্যামিতিক গঠন ও আকৃতি ছিল একই জিনিস। মনে করা হত, শূন্য এমন একটি সংখ্যা যার কোনো রকম জ্যামিতিক অর্থ থাকতে পারে না। তার মানে শূন্যকে ঠাঁই দিতে হলে গ্রিকদেরকে পুরো গাণিতিক কাজের

পদ্ধতিই পাল্টে ফেলতে হত। তারা সেটা না করল না।

গ্রিক পদ্ধতিতে শূন্য যদি থেকেও থাকত, তবুও শূন্যকে দিয়ে অনুপাত বানানোকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ মনে হত। দুটি বস্তুর সম্পর্কে আর অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যেত না। শূন্য ও অন্য যে-কোনো সংখ্যার অনুপাত, মানে শূন্যকে যে কোনো সংখ্যাকে দিয়ে ভাগ দিলে প্রাপ্ত সংখ্যা হবে শূন্যই। অন্য সংখ্যাটিকে শূন্য একেবারেই গিলে ফেলে। আর এদিকে কোনোকিছু ও শূন্যের অনুপাত, মানে কোনো একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যুক্তিই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন পিথাগোরীয় মহাবিশ্বে শূন্য একটুখানি ময়লা জমিয়ে দেয়। এ কারণেই শূন্যকে সহ্য করা হয়নি।

আসলে গ্রিকরা আরেকটি অসুবিধাজনক গাণিতিক ধারণাকেও ঘৃণা করে এসেছিল। মূলদ সংখ্যা। পিথাগোরীয় চিন্তায় প্রথম বাধা ছিল এটিই। তারা এটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আর এই জিনিসটা প্রকাশ্যে চলে এলে তারা সহিংস হয়ে ওঠে।

অমূলদ সংখ্যার ধারণা গ্রিক গণিতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল টাইম বোমার মতো। সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈততার কারণে গ্রিকদের কাছে গণনা আর রেখার দৈর্ঘ্য মাপা ছিল একই কাজ। এ কারণে দুটি সংখ্যার অনুপাত বের করতে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের দুটি রেখাকে তুলনা করাই যথেষ্ট ছিল। তবে যেকোনো ধরনের পরিমাপ করতে গেলেই একটি আদর্শ মাপকাঠি দরকার হয়। এমন একটি মাপকাঠি, যেটা দিয়ে দুটি রেখার আকার তুলনা করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, একটি রেখার দৈর্ঘ্য একদম এক ফুট। এর এক প্রান্ত থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দূরে একটি দাগ দিলেন। এর ফলে আগের এক ফুট এখন দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত হলো। গ্রিকরা এই অনুপাত বের করার জন্যে রেখাটিকে খণ্ডে ভাগ করত। অর্ধ-ইঞ্চি বা এমন কিছুকে ব্যবহার করত আদর্শ বা মাপকাঠি হিসেবে। ফলে এক অংশে থাকবে ১১টি দাগ, আর আরেক অংশে ১৩টি।<sup>৬</sup> অতএব, দুই অংশের অনুপাত হবে ১১:১৩।

পিথাগোরাসের প্রত্যাশা অনুসারে মহাবিশ্বের সবকিছুকে অনুপাত মেনে চলতে হলে মহাবিশ্বের অর্থবহ সবকিছুকে সুন্দর ও সরল অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। তাকে হতে হবে মূলদ বা যৌক্তিক সংখ্যা (rational number)<sup>৭</sup>। আরও স্পষ্ট করে বললে, এই অনুপাতগুলোকে  $a/b$  আকারে লিখতে হত। যেখানে  $a$  ও  $b$  হবে ১, ২ বা ৪৭-এর মতো দেখতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গণনা (স্বাভাবিক<sup>৮</sup>) সংখ্যা। (গণিতবিদরা এ জন্যে বলেই রাখেন,  $b$  এর মান শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ভাগ দিতে হবে শূন্য দিয়ে, যা এক ভয়ানক কাজ।) বলাই বাহুল্য, মহাবিশ্ব এতটা সাজানো-গোছানো নয়। কিছু কিছু সংখ্যাকে  $a/b$  ধরনের সরল ভগাংশ আকারে লেখা সম্ভব হয় না। এই অমূলদ সংখ্যাগুলো ছিল গ্রিক গণিতের অনিবার্য ফল।

বর্গ জ্যামিতির অন্যতম সরল একটি চিত্র। পিথাগোরীয়রা একে যথাযথ সম্মানও দিত। (চারটি মৌলিক উপাদানের আদলে এর ছিল চারটি বাহু। এটা ছিল নিখুঁত সংখ্যার প্রতীক।) কিন্তু বর্গের সারল্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মূলদ সংখ্যা। বর্গের বিপরীত কোণকে যুক্ত করে কর্ণ আঁকলেই চলে আসে অমূলদ সংখ্যা। মনে করুন, একটি বর্গের সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ফুট করে। মনে মনে (বা বাস্তবেই) এটা আঁকে ফেলুন। গ্রিকদের মতো অনুপাতে নিম্ন থাকা মানুষ বর্গের বাহু ও কর্ণের দিকে জিজ্ঞেস করবে: এই দুটি রেখার অনুপাত কত?

আগের মতোই প্রথম কাজ হলো একটি আদর্শ মাপকাঠি তৈরি করা। সেটা হতে পারে অর্ধ-ইঞ্চির একটি ছোট রুলার। এবার কাজ হলো সেই মাপকাঠি দিয়ে প্রতিটি বাহুকে সমান সমান ভাগে বিভক্ত করা। অর্ধ-ইঞ্চির মাপকাঠি দিয়ে আমরা এক ফুটের (১২ ইঞ্চি) বাহুকে ২৪ খণ্ড করতে পারব, যার প্রতিটি অর্ধ-ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু কর্ণকে মাপলে কী হবে? একই মাপকাঠি দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মাপলে ৩৪টির মতো খণ্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরোপুরি মিলবে না। ৩৪তম খণ্ডটি হবে

সামান্য ছোট। অর্ধ-ইঞ্চির রুলার বর্গের কোণা দিয়ে একটুখানি বেরিয়ে থাকবে। আমরা আরও ভালোভাবেও মাপতে পারব। রেখাটিকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করলেই হবে। ধরুন, আমরা ব্যবহার করলাম এক ইঞ্চির ৬ ভাগের এক ভাগ সমান একটি রুলার। এবার বর্গের বাহু ৭২ খণ্ডে বিভক্ত হবে। আর কর্ণে খণ্ড পাওয়া যাবে ১০১টির বেশি। তবে ১০২টির কম। এবারেও পরিমাপ নিখুঁত হবে না। আরও অনেক ছোট মাপকাঠি নিলে কী হবে? এক ইঞ্চির দশ কোটি ভাগের ভাগ সমান দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি নিলে? বর্গের বাহু হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ খণ্ড। আর কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে ১৬,৯৭,০৫,৬৩ খণ্ডের চেয়ে একটু কম। এই রুলার দিয়েও রেখা দুইটির মধ্যে সমন্বয় করা যাচ্ছে না। আসল কথা হলো, কোনো রুলার দিয়েই সঠিক পরিমাপ পাওয়া যাবে না।

আসলে আপনি রুলার যত ছোটই করেন না কেন, বর্গের বাহু ও কর্ণ উভয়কে নিখুঁতভাবে মাপার মতো একটি মাপকাঠি কখনোই পাওয়া যাবে না। কর্ণ ও বাহু একই সাথে অনির্ণেয়। কিন্তু একই মাপকাঠি না হলে দুটি রেখাকে অনুপাত আকারে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। একক (১ একক) সাইজের একটি বর্গের জন্যে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা একম কোনো গণন সংখ্যা  $a$  ও  $b$  পাব না যারা বর্গের যথাক্রমে বাহু ও কর্ণ হবে এবং যাদেরকে  $a/b$  আকারে প্রকাশ করা যাবে। অন্য কথায়, এই বর্গের কর্ণ একটি অমূলদ সংখ্যা। বর্তমানে একে আমরা দুইয়ের (২) বর্গমূল বা  $\sqrt{2}$  হিসেবে চিনি। (বর্গের কর্ণ ও সংশ্লিষ্ট দুই বাহু মিলে সমকোণী ত্রিভুজ হয়। যেখানে কর্ণ অতিভুজ। অতএব পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে কর্ণের দৈর্ঘ্য  $= \sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$ ।)

এটা পিথাগোরীয় গণিতের জন্যে অশনি সঙ্কেত। প্রকৃতি কীভাবে অনুপাত দিয়ে পরিচালিত হবে, যেখানে বর্গের মতো একটি সরল জিনিসই অনুপাতের ভাষাকে গোলমালে কোরে ফেল? এই জিনিসটি বিশ্বাস করা পিথাগোরীয়দের জন্যে কঠিনই ছিল। কিন্তু একে অস্বীকার করার তো জো নেই। এটা তাদের প্রিয় গাণিতিক বিধিরই একটি ফল। গণিতের ইতিহাসের অন্যতম প্রথম একটি প্রমাণই হলো বর্গের কর্ণের অপরিমাপযোগ্যতা বা অমূলদতা।

পিথাগোরাসের কাছে অমূলদ সংখ্যারা ছিল ভয়াবহ। কারণ, অনুপাত দিয়ে গড়া মহাবিশ্ব পড়ে গিয়েছিল হুমকির মুখে। কফিনে আরেকটি পেরেক যুক্ত করে সোনালী অনুপাত। পিথাগোরাস দেখলেন সুন্দর এ সংখ্যাটাও অমূলদ সংখ্যা। অথচ এই সংখ্যাটিই পিথাগোরীয়দের কাছে সৌন্দর্য ও যুক্তির চূড়ান্ত প্রতীক ছিল। এই ভয়ানক সংখ্যাগুলো যাতে পিথাগোরীয় মতবাদের ক্ষতি না পারে সেজন্যে এদেরকে গোপন রাখা হলো। পিথাগোরীয় সঙ্ঘের সবাইকে এমনিতেই কম কথা বলতে হত। এমনকি লিখিত নোট রাখার অনুমতিও ছিল না কারও। দুইয়ের বর্গমূলের অপরিমাপযোগ্যতা হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় ও কলুষিত গোপনীয় বিষয়।

তবে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে শূন্যের মতো এত সহজে অবহেলা করে থাকতে পারেনি। সব ধরনের জ্যামিতিক চিত্রে ঘুরেফিরে এদের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। জ্যামিতি ও অনুপাত নিয়ে এতটা নিমগ্ন থাকা একটা জাতির কাছ থেকে অমূলদ সংখ্যাকে খুব বেশি দিন লুকিয়ে রাখা কঠিন। একদিন না একদিন কেউ একজন ব্যাপারটা ফাঁস করে ফেলতই। এই কেউ একজন ছিলেন মেটাপন্টাম এলাকার হিপাসাস। তিনিও ছিলেন পিথাগোরীয় সঙ্ঘের একজন গণিতবিদ। অমূলদ সংখ্যার রহস্য ফাঁস করে তাকে মারাত্মক বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

হিপাসাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলো খুব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। গণিতবিদরা আজও অমূলদ সংখ্যার রহস্য ফাঁস করা দূর্ভাগা এই গণিতবিদের কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন পিথাগোরাস তাকে জাহাজ থেকে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর মতে, নান্দনিক এক গাণিতিক তত্ত্বকে অসুন্দর তথ্য দিয়ে ধ্বংস করার উচিত শাস্তি এটাই। প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায়, পাপের শাস্তি হিসেবে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলেন হিপাসাস। কেউ

কেউ আবার বলছেন, তাকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং তার জন্যে একটি কবর নির্মাণ করা হয়। এভাবে তাকে সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। তবে হিপাসাসের সত্যিকার পরিণতি যাই হোক না কেন, এটা সত্যি যে তার সঙ্গীরা তাকে তিরস্কার করেছিল। তিনি যা ফাঁস করলেন সেটা পিথাগোরীয় মতবাদের ভিত্তিকেই কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু অমূলদ সংখ্যাকে একটি ব্যতিক্রম বলে চালিয়ে দিয়েই পিথাগোরীয়রা মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের ভাবনাকে কলুষিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারত। এবং সত্যি বলতে সময়ের সাথে সাথে গ্রিকরা অমূলদ সংখ্যাকে নিজেদের সংখ্যার অংশ বানিয়ে নিতে নিমরাজি হয়। পিথাগোরাসকে অমূলদ সংখ্যারা মারেনি। মেরেছে শিম (সবজি)।

হিপাসাসের মতোই পিথাগোরাসের মৃত্যুর বর্ণনাও অস্পষ্ট। তবে সবগুলোই বলছে, মৃত্যুটা হয়েছিল অস্বাভাবিক উপায়ে। কেউ কেউ বলেন, পিথাগোরাস উপবাস থেকে থেকে মারা গিয়েছেন। তবে গল্পের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সংস্করণ অনুসারে তার মৃত্যুর কারণ ছিল শিম। গল্পের একটি সংস্করণ অনুসারে, একদিন শত্রুরা (যাদেরক পিথাগোরাসের সামনে আসতে দেওয়ার যোগ্য মনে না করায় তারা রেগে ছিল) তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর সজ্জের লোকেরা প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক ছুটে যায়। উত্তেজিত জনতা পিথাগোরীয়দের একের পর এক জবাই করতে থাকে। ভ্রাতৃসজ্জ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। পিথাগোরাস নিজেও জীবন বাঁচাতে পালাতে লাগলেন। পালিয়ে যেতে পারতেন। যদি না আটকে পড়তেন শিমক্ষেতে। সেখানেই থেমে গেলেন তিনি। ঘোষণা দিলেন, মারা গেলে যাবেন, কিন্তু শিমক্ষেতে পাড়ি দেবেন না। পেছন পেছন আসা মানুষগুলো তো খুব খুশি। দিল গলা কেটে।

সজ্জ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। নেতা মারা গেলেন। কিন্তু পিথাগোরাসের মূল শিক্ষা বেঁচে রইল। অল্প দিনের মধ্যেই সেটি পাশ্চাত্য ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হলো। সেই দর্শনের নাম এরিস্টটলীয় মতবাদ। যা টিকে থেকেছিল পরের দুই হাজার বছর। শূন্যের সাথে এই মতবাদের সংঘর্ষ হয়। তবে অমূলদ সংখ্যাকে উপেক্ষা করা না গেলেও শূন্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতির সংখ্যা ও আকৃতির দ্বৈতরূপ কাজটিকে সহজ করে দেয়। কারণ শূন্যের তো আর কোনো আকৃতি ছিল না। ফলে এর পক্ষে সংখ্যা হওয়াও সম্ভব ছিল না।

তবুও শূন্যের স্বীকৃতি কিন্তু গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতি ঠেকিয়ে রাখেনি। রাতের আকাশ নিয়ে মগ্ন থাকার কারণে গ্রিকরা শূন্য নিয়ে জানতে পেরেছিল। বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের মতোই গ্রিকরা রাতের আকাশ দেখত। আর রাতের আকাশে সবার আগে হাত পাকিয়েছিল ব্যাবিলনীয়রা। তারা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের পূর্বাভাস দেওয়ার উপায় জানত। প্রথম গ্রিক জ্যোতির্বিদ থ্যালিস এটা শিখেছিলেন ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে। কিংবা হয়ত মিশরীয়দের মাধ্যমে শিখে থাকবেন। বলা হয়ে থাকে, খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে তিনি একটি সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস প্রদান করেছিলেন।

ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে এসেছিল ব্যাবিলনীয় সংখ্যাও। জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনে গ্রিকরা ষাটভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। ঘণ্টাকে ভাগ করেছিল ৬০ মিনিটে। আর মিনিটকে ৬০ ভাগে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয় লেখালেখিতে শূন্যের আবির্ভাব ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক জ্যোতির্বিদরাও এর ব্যবহার শুরু করে দেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার স্বর্ণযুগে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার টেবিলগুলোতে শূন্যের ব্যবহার ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। এর প্রতীক ছিল ছোট হাতের ওমাইক্রোন ০-এর মতো। যা দেখতে অনেকটাই আধুনিক যুগের শূন্যের মতোই। যদিও এটা হয়ত নিছকই কাকতালীয় ঘটনা। (সম্ভবত ওমাইক্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে 'কিছু না' এর গ্রিক প্রতিশব্দouden-এর প্রথম অক্ষর থেকে। গ্রিকরা শূন্যকে মোটেই পছন্দ করত না। ব্যবহার করত যতটা সম্ভব কম। ব্যাবিলনীয় প্রতীক দিয়ে হিসাব-নিকাশ করার পরে গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সাধারণত সংখ্যাগুলোকে আবারও গুরুগম্ভীর গ্রিক সংখ্যায় রূপান্তর করে নিত। যেখানে শূন্য থাকত অনুপস্থিত। প্রাচীন পাশ্চাত্য সংখ্যাপদ্ধতিতে শূন্য কখনোই স্থান পায়নি। এ কারণে ওমাইক্রোন



শূন্যের (০) আদিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কম। হিসাব করতে গিয়ে গ্রিকরা শূন্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। তবুও প্রত্যাখ্যান করতে বাঁধেনি।

তার মানে গ্রিকরা কিন্তু অজ্ঞতার কারণে শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করেনি। করেনি সংখ্যা-আকৃতির সীমাবদ্ধতার কারণেও। এটা ছিল তাদের দর্শনের ফল। পাশ্চাত্যের মৌলিক দার্শনিক বিশ্বাসের সাথে শূন্যের সজ্জাত হয়। কারণ শূন্যের মধ্যে এমন দুটি ধারণা আছে যা পাশ্চাত্য মতবাদের জন্যে হুমকি। এবং এই ধারণাগুলোই এরিস্টটলীয় দর্শনের দীর্ঘ সময় ধরে চলা প্রভাবকে শেষ করে দেয়। এই ভয়ানক ধারণাগুলো হলো শূন্যতা ও অসীম।

## অসীম, শূন্যতা ও পাশ্চাত্য

*প্রকৃতিবিদরা মাছি পর্যবেক্ষণ করেন*

*আছে এর চেয়ে ছোট মাছি যা তাকে শিকার করে*

*তার চেয়েও ছোট মাছিও আছে যা তাকে কামড় দেয়।*

*এভাবেই চলে অসীম পর্যন্ত...*

*-জোনাথন সুইফট, অন পয়েন্ট্রি অ্যান্ড রাফসডি*

অসীম ও শূন্যতার শক্তি নিয়ে গ্রিকরা আতঙ্কিত ছিল। সব ধরনের গতিকে অসম্ভব করে তুলছিল অসীম। অন্য দিকে শূন্যতা হুমকি দিচ্ছিল গুচ্ছবদ্ধ মহাবিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার। শূন্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে গ্রিকরা তাদের মহাবিশ্বকে দুই হাজার বছর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

পিথাগোরাসের মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের কেন্দ্রীয় বস্তু হয়ে ওঠে। মহাবিশ্বের সবগুলো তত্ত্ব ছিল অনুপাত ও আকৃতির ছড়াছড়ি। গ্রহরা চলত আকাশের গোলকে। চলতে চলতে তৈরি করত সঙ্গীত। কিন্তু এই গোলকগুলোর বাইরে কী আছে? আরও আরও গোলক? প্রতিটা আগের চেয়ে বড় বড়? নাকি শেষ গোলকেই মহাবিশ্বের সমাপ্তি? এরিস্টটল ও অন্যান্য দার্শনিকরা জোর দিয়ে বলতেন, একের পর এক অসীমসংখ্যক গোলক থাকা সম্ভব নয়। এই দর্শন মেনে নিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব অসীমকে মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। তারা একে একাবারেই অস্বীকার করত। ওদিকে ইলিয়া শহরের জেনোর কল্যাণে অসীম পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। জেনোর সমসাময়িক মানুষরা তাকে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে বিরক্তির মানুষ বলে মনে করত।

জেনোর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের দিকে। একই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘটিত প্রচণ্ড সেই পারসিক যুদ্ধগুলোর সূচনা ঘটেছিল। গ্রিস পারস্যকে পরাজিত করে। গ্রিক দর্শন জেনোকে কখনোই সেভাবে পরাজিত করতে পারেনি। কারণ জেনোর কাছে ছিল একটি প্যারাডক্স। একটি যুক্তিভিত্তিক ধাঁধা যা গ্রিক দার্শনিকরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে অক্ষম ছিলেন। এটাই ছিল গ্রিসের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণাদায়ক তর্ক: জেনো অসম্ভবকে প্রমাণ করেছেন।

জেনোর মতে, মহাবিশ্বের কোনও কিছুই চলাচল করতে পারে না। অবশ্যই এটি একটি ছেলেমানুষি কথা। একটুখানি হেঁটে যে কেউই একে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারেন। সবাই জানত জেনোর কথা ভুল। কিন্তু যুক্তির ভুলটা কেউই দেখাতে পারেনি। তিনি একটি প্যারাডক্স নিয়ে আসেন। জেনোর যুক্তির ধাঁধাগুলো গ্রিক দার্শনিকদের বিমূঢ় করে দেয়। বাদ যায়

পরবর্তী যুগের দার্শনিকরাও। প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত জেনোর ধাঁধাগুলো গণিতবিদদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছিল।

সবচেয়ে বিখ্যাত ধাঁধাটার কথা বলা যাক। এটায় তিনি দেখান, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা একটি কচ্ছপ গতিমান একিলিসের চেয়ে একটু আগে চলা শুরু করলে একিলিস কখনোই আর তাকে পেছনে ফেলতে পারেন না। আরও ভাল করে বুঝতে কিছু সংখ্যা ব্যবহার করি। ধরুন, একিলিস সেকেন্ডে এক ফুট চলছেন। আর কচ্ছপ যাচ্ছে তার অর্ধেক গতিতে। আরও ধরুন, কচ্ছপ একিলিসের এক ফুট সামনে থেকে চলা শুরু করল।

একিলিস তীব্র বেগে এগিয়ে গেলেন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন যেখানে একটু আগে কচ্ছপটি ছিল। তবে কচ্ছপটিও তো চলছে। ফলে একিলিস কপচ্ছপের আগের অবস্থানে যেতে যেতে কচ্ছপ আরও এক অর্ধফুট সামনে চলে গেছে। তাতে কী? একিলিস তো আরও দ্রুত চলেন। তাই এই অর্ধফুট দূরত্ব সে অর্ধসেকেন্ডেই পার হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে কচ্ছপ আরও সামনে চলে গেছে। এবার গেছে সিকি ফুট। সিকি সেকেন্ডেই একিলিস সেটাও পার হলো। কিন্তু কচ্ছপ ততক্ষণে আবারও সামনে চলে গেছে। এবার এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ। একিলিস দৌড়েই চলছেন। কিন্তু কচ্ছপ থাকছে সামনেই। একিলিস কচ্ছপের যতই কাছে যান, কচ্ছপ ততই আগের জায়গায় থেকে আরও সামনে চলে যায়। এক ফুটের আট ভাগের এক ভাগ, তারপর ষোল ভাগের এক ভাগ, ... ক্রমশ ছোট ছোট দূরত্ব। একিলিস কাছাকাছি হচ্ছেন, কিন্তু কচ্ছপকে ধরতে পারছেন না। সামনে সবসময় কচ্ছপই।

সবাই জানেন, বাস্তবে একিলিস কচ্ছপকে পার হয়ে যাবেন নিমিষেই। কিন্তু জেনোর যুক্তি থেকে মনে হয় সেটা হবে না কখনও। সে যুগের দার্শনিকরা সে যুক্তিকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। জানতেন জেনোর যুক্তির ফল ভুল। কিন্তু প্রমাণের গাণিতিক ভুলটাকে ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি (চিত্র ১০)।

সমস্যাটি গ্রিকদের কুপোকাত করে দেয়। তবে সমস্যাটির মূল উৎস কিন্তু তারা খুঁজেই পায়নি। সেটা হলো অসীম। জেনোর প্যারাডক্সের ভেতর লুকিয়ে আছে অসীম। জেনো চলমান গতিকে অসীমসংখ্যকবার ভাগ করেছেন। এখানে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ দরকার জেনে গ্রিকরা ধরে নিয়েছিল রেস চিরকাল ধরে চলতে থাকবে। যদিও প্রতি পদক্ষেপে ধাপগুলো ছোট হচ্ছে। তারা মনে করেছিল, রেস কখনোই শেষ হবে না। আসলে অসীম নিয়ে কাজ করার গাণিতিক হাতিয়ার প্রাচীন মানুষের কাছে ছিল না। কিন্তু আধুনিক গণিতবিদরা সে উপায়টা বের করেছেন। অসীম নিয়ে কাজ করতে হয় খুব সাবধানে। তাহলে একেও একে বশে আনা যায়। লাগবে শূন্যের সাহায্য। ২,৪০০ বছরের গাণিতিক চর্চার কাঁধে ভর করে জেনোর একিলিস ধাঁধায় ফিরে যাওয়া এখন আর কঠিন নয়।

গ্রিকদের কাছে শূন্য ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আর জেনোর ধাঁধা সমাধানের মূল হাতিয়ারই শূন্য। অনেক সময় অসীমসংখ্যক পদ যোগ করেও সসীম একটি ফল পাওয়া যায়। তবে সেটা হতে হলে পদগুলো ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি যেতে হবে। একিলিস ও কচ্ছপের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে। একিলিসের চলার পথগুলো যোগ করতে শুরু করতে হয় ১ দিয়ে। তারপর যোগ হবে  $1/2$ , তারপর  $1/4$ , তারপর  $1/8$ , ... এভাবেই চলবে। পদগুলো ক্রমেই ছোট হবে। আর কাছাকাছি হবে শূন্যের<sup>১০</sup>। প্রতিটি পদ যেন কোনো ভ্রমণের অংশ। যার গন্তব্য শূন্য। কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে এড়িয়ে চলেছিল বলে বুঝতে পারেনি এই ভ্রমণের শেষ কোথায়। তাদের কাছে মনে হয়নি,  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ , ... সংখ্যাগুলো নির্দিষ্ট কোনো একটি সংখ্যার নিকটবর্তী হচ্ছে না। নেই কোনো গন্তব্য। তারা শুধুই দেখেছে, পদগুলো ক্রমশ ছোট হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সংখ্যার জগৎ থেকে দূরে কোথাও।

আধুনিক গণিতবিদরা জানেন, পদগুলোর একটি সীমা (limit) আছে।  $1$ ,  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $1/16$ , ... সংখ্যাগুলোর সীমা

হলো শূন্য, যার দিকে এরা এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে চলার একটা গন্তব্য আছে। কোনো ভ্রমণের গন্তব্য থেকে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেতেই পারে, গন্তব্যটা কত দূরে আছে। আর সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে। একিলিসের চলার পথের দূরত্বগুলো যোগ করা কঠিন নয়।  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots$ । একইভাবে একিলিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট থেকে আরও ছোট হচ্ছে। হচ্ছে ক্রমেই শূন্যের আরও কাছাকাছি। পদক্ষেপগুলোর যোগফল ক্রমেই ২ এর কাছাকাছি হচ্ছে। এটা আমরা কীভাবে জানলাম? আচ্ছা, ২ থেকে শুরু করে দেখুন। এবার যোগফলে একে একে পদগুলোকে বিয়োগ দিতে থাকুন। প্রথমে বিয়োগ হবে ১। তারপরে  $1/2$ । বাকি থাকবে বাকি  $1/2$ । এবার বিয়োগ করুন  $1/4$ । তাহলে আর বাকি থাকবে  $1/4$ । এখান থেকে  $1/8$  বিয়োগ করলে থাকবে  $1/8$ । আমরা আমাদের চেনা ধারায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা জানিই,  $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$  ধারার সীমা হলো শূন্য (০)। (মানে ধারার পদগুলো ক্রমেই শূন্যের দিকে যাচ্ছে) অতএব, পদগুলোকে ২ থেকে বিয়োগ করতে থাকলে কিছুই আর বাকি থাকবে না।  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots$  ধারার যোগফলের সীমা হলো ২ (চিত্র ১১)। কচ্ছপকে ধরতে একিলিসকে ২ ফুট যেতে হবে। যদিও এর মধ্যেই তাকে অসীম সংখ্যক পদক্ষেপ ফেলতে হবে। এছাড়াও সময়ের দিকেই দেখুন না। কচ্ছপকে পার হতে একিলিসের কতটুকু সময় লাগবে দেখুন:  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots$ । মানে ২ সেকেন্ড। একটি সসীম দূরত্ব পার হতে একিলিস একই সাথে অসীমসংখ্যক পদক্ষেপ ফেলেন, আবার সেই দূরত্ব পার হন মাত্র ২ সেকেন্ডেই।

চিত্র ১১:  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + \dots = 2$

দারুণ এই গাণিতিক বুদ্ধিটা গ্রিকদের মাথায় আসেনি। সীমার ধারণা তাদের জানা ছিল না। কারণ তারা শূন্যকে বিশ্বাস করেনি। তারা মনে করত, অসীম ধারার কোনো সীমা বা গন্তব্য থাকতে পারে না। এমন ধারার পদগুলো শুধুই ছোট হতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার দিকে যায় না। এ জন্যেই গ্রিকরা অসীম নিয়ে কাজ করতে পারত না। তারা শূন্যত নিয়ে ভাবত, কিন্তু শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে মেনে নেয়নি। ওদিকে তারা অসীম নিয়েও খেলা করেছে। কিন্তু অসীমকে বা যেসব জিনিস অসীম পরিমাণ ছোট বা বড় তাদেরকে সংখ্যার জগতে আসতে দেয়নি। গ্রিক গণিতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এটাই। এ কারণেই তারা ক্যালকুলাস আবিষ্কার করতে পারেনি।

অসীম, শূন্য ও সীমার ধারণা একে অপরের সাথে একটি গুচ্ছে মিশে আছে। গ্রিক দার্শনিকরা সেই গুচ্ছের গিঁট খুলতে পারেনি। এ কারণে জেনোর ধাঁধা সমাধানের জন্যে ভাল কোনো উপকরণ তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু জেনোর প্যারাডক্সের জোর ছিল অনেক বেশি। গ্রিকরা বারবার চেষ্টা করেছে সেখান থেকে অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু সঠিক ধারণার অভাবে ব্যর্থতাই লেখা ছিল তাদের কপালে।

জেনোর নিজের কাছেও সমস্যাটির ভাল কোনো সমাধান ছিল না। তিনি সমাধান খোঁজেনওনি। তার দর্শনের জন্যে প্যারাডক্সটি খুব মানানসই। তিনি ছিলেন ইলীয় ভাবধারার চিন্তাবিদ। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা পার্মিনিডিজ মনে করতেন, মহাবিশ্ব মৌলিকভাবে পরিবর্তনহীন ও নিশ্চল। দেখা গেল, জেনোর ধাঁধা পার্মিনিডিজের যুক্তির পক্ষে কথা বলছে। বোঝা গেল, পরিবর্তন ও গতি খুবই প্যারাডক্সিকেল ব্যাপার। তিনি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সবকিছু একই জিনিস। এবং পরিবর্তনহীন। জেনো সত্যিই বিশ্বাস করতেন, গতি অসম্ভব। আর এই কথার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার নিজের প্যারাডক্স।

কিন্তু অন্য মতবাদের পক্ষেও ছিলেন কিছু চিন্তাবিদ। যেমন, পরমাণুবিদরা বিশ্বাস করতেন, মহাবিশ্ব পরমাণু নামে ছোট ছোট কণা দিয়ে গঠিত। পরমাণু চিরন্তন, যাকে আর ভাঙা যায় না। তাদের মতে গতি হলো এই ছোট ছোট পরমাণুর চলাচল। এই পরমাণুদেরকে চলাচল করতে হলে দরকার খালি জায়গা, যেখানে তারা গিয়ে স্থান করে নেবে। ভ্যাকুয়াম

বা ফাঁকা স্থান বলে কিছু না থাকলে পরমাণুরা ক্রমাগত একে অপরের সাথে ধাক্কা খাবে। সবকিছুই চিরকাল একই জায়গায় আটকে থাকবে। চলাচল করা হত অসম্ভব। ফলে পরমাণু তত্ত্ব সঠিক হতে হলে মহাবিশ্বে থাকতে হবে ব্যাপক ফাঁকা স্থান। অসীম এক শূন্যতা। পরমাণুবাদীরা অসীম ভ্যাকুয়ামের ধারণাকে লুফে নিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যেই অসীম ও শূন্য একাকার হয়েছিল। এ এক অবাক করা ফলাফল। কিন্তু পরমাণু তত্ত্বে বস্তুর অবিভাজ্য মৌলিক অংশ জেনোর প্যারাডক্সকে ভালোভাবেই সামাল দিয়েছিল। পরমাণুরা অবিভাজ্য বলে এমন একটি বিন্দু আছে যার পরে কোনোকিছুকে আর ভাঙা যাবে না। জেনোর ভাঙার কাজ অসীম পর্যন্ত যেতে পারে না। কিছু পদক্ষেপ ফেলার পর একিলিসের পদক্ষেপগুলো এত ছোট হবে, যার পক্ষে আরও ছোট হওয়া সম্ভব নয়। একটা সময় তিনি এমন একটি পদক্ষেপ ফেলবেন যা কচ্ছপের অতিক্রান্ত পথের চেয়ে বেশি। বারবার হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কচ্ছপ শেষমেশ ধরা পড়বেই।

পরমাণু তত্ত্বের সাথে টক্কর লাগে আরেকটি দর্শনের। এখানে অসীম ভ্যাকুয়ামের মতো অদ্ভুত কিছু ছিল না। এ ধারণা অনুসারে মহাবিশ্ব ছিল একটি নাদুসনুদুস ছোট জিনিস। নেই কোনো অসীম। না আছে কোনো শূন্যতা। আছে শুধু সুন্দর কিছু গোলক। যারা বেঁঠন করে আছে পৃথিবীকে। অবচেতনভাবেই পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল এরিস্টটলীয় ধারণা। পরে আলেক্সান্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ টলেমি একে পরিমার্জিত করেন। এটা পাশ্চাত্য বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শনে পরিণত হয়। শূন্য আর অসীমকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এরিস্টটল জেনোর প্যারাডক্সগুলোকে বাতিল বানিয়ে দেন।

এরিস্টটল নিছক বললেন, গণিতবিদদের অসীমকে দরকার নেই। তারা ব্যবহারও করেন না। হ্যাঁ, গণিতবিদদের মনে সম্ভাব্য কিছু অসীমের অস্তিত্ব থাকতে পারে। যেভাবে থাকে একটি রেখাকে অসীমসংখ্যক বার ভাগ করার ধারণা। কিন্তু সে কাজটি তো আর করা সম্ভব নয়। একইভাবে অসীমও বাস্তবে নেই। একিলিস সহজেই কচ্ছপকে পার হয়ে যান। কারণ অসীমসংখ্যক বিন্দুর বিষয়টি নিছক জেনোর কাল্পনিক তুলির আঁচড়। এটা বাস্তব জগতের কিছু নয়। অসীমকে নিছক মনের মধ্যে অস্তিত্বে থাকা একটি জিনিস দাবি করে এরিস্টটল অসীমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

এ ধারণা থেকে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি জিনিস বেরিয়ে আসে। এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের (ও পরবর্তীতে টলেমির করা পরিমার্জন) ধারণার ভিত্তি ছিল পিথাগোরীয় মহাবিশ্ব। এ ধারণায় মনে করা হত, গ্রহরা স্ফটিকের মতো গোলকের মধ্যে ঘুরছে। তবে অসীমের অস্তিত্ব নেই বলে এই গোলকের সংখ্যা সীমাহীন নয়। অন্তত একটা অবশ্য থাকবেই। সবচেয়ে বাইরের গোলক ছিল মধ্যরাতে দেখা একটি নীল গ্লোবের মতো। যা ছোট ছোট জ্বলজ্বলে আলোকবিন্দু দিয়ে আবৃত। এই আলোকবিন্দুরা হলো নক্ষত্র। সবচেয়ে বাইরের গোলকের বাইরে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সর্ববাইরের এই স্তরের পরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্বটা যেন আবদ্ধ ছিল এক বাদামের খোসায়। যা স্থির নক্ষত্রদের গোলকের ভেতরের সুন্দরভাবে অবস্থান করছিল। মহাবিশ্বটা অসীম। বস্তু দিয়ে পরিপূর্ণ। অসীম বলতে কিছু নেই। শূন্যতা বলতেও কিছু নেই। অসীম নেই বলে নেই শূন্যও।

এই যুক্তি থেকে আরও একটি ফল পাওয়া গেল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। আর হয়ত এ কারণে এরিস্টটলের দর্শন এতগুলো বছর টিকে থাকতে পেরেছিল।

আকাশের গোলকরা নিজেদের স্থানে ধীরে ধীরে ঘুরছে। এতে সুষ্ঠু সঙ্গীত ছড়িয়ে যায় মহাবিশ্বজুড়ে। কিন্তু গোলকদের এই ঘোরার পেছনে নিশ্চয়ই কোনোকিছু ভূমিকা রাখছে। নিশ্চল পৃথিবী সেই ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। তাহলে সবচেয়ে ভেতরের গোলক নিশ্চয় তার ঠিক বাইরের গোলক দ্বারা গতিশীল হচ্ছে। সেই গোলক আবার তার পরের গোলকের মাধ্যমে গতিশীল। এভাবেই চলছে। কিন্তু অসীম তো নেই। গোলকের সংখ্যা নির্দিষ্ট। একে অপরকে গতিশীল রাখার

জন্যে আছে সসীম সংখ্যক বস্তু। গতির নিশ্চয়ই চূড়ান্ত কোনো উৎস আছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা স্থির নক্ষত্রদের গোলককে ঘোরাচ্ছে। সেটাই প্রধান গতিদাতা ঈশ্বর। পরমাণুবাদীদের নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করা হলো। এরিস্টটলীয় মত নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সামিল।

এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের ধারণা অত্যন্ত সফল ছিল। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় শিষ্যের নাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। তিনি গুরু মতবাদ প্রচার করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ৩২৩ খৃষ্টপূর্বে নিজের অকাল মৃত্যুর আগে ছড়িয়ে দেন প্রাচ্যের ভারত পর্যন্ত। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও টিকে থাকে এরিস্টটলের মতবাদ। টিকে থাকল ষোড়শ শতকের এলিজাবেথের সময় পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় ধরে এরিস্টটলকে মেনে নেওয়া সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে আসা হয়েছে অসীম ও শূন্যতাকে। কারণ এরিস্টটলীয় মতবাদে অসীমকে অস্বীকার করতে হলে শূন্যও থাকতে পারে না। শূন্যতার উপস্থিতি বলে অসীম বলেও কিছু একটা আছে। আর যাই হোক, শূন্যতার তো শুধু দুটিই সম্ভাব্য দিক আছে। আর দুটোই বলছে অসীমও থাকবে। প্রথমত, শূন্যতার পরিমাণ হতে পারে অসীম। মানে অসীমের অস্তিত্ব আছে। দ্বিতীয়ত, শূন্যতার পরিমাণ সসীম বা নির্দিষ্ট। আর শূন্যতা মানে বস্তুর অনুপস্থিতি। অতএব শূন্যতার পরিমাণ সসীম হতে হলে বস্তুর পরিমাণ অসীম হতে হবে। তাও অসীমের অস্তিত্ব থাকে। দুই ক্ষেত্রেই শূন্যতার অস্তিত্ব অসীমের অস্তিত্বকে অনিবার্য করে তোলে। শূন্য বা শূন্যতা এরিস্টটলের সুন্দর যুক্তিটাকে শেষ করে দেয়। বাতিল করে দেয় তাঁর করা জেনোর বক্তব্যের খণ্ডন আর ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ<sup>৮</sup>। ফলে গ্রিকরা এরিস্টটলের কথা মানার কারণে শূন্য, শূন্যতা ও অসীমকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। //

একটা সমস্যা কিন্তু ছিলই। অসীম ও শূন্য দুটোকেই অবহেলা করা এত সহজ না। সময়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে অতীতে ফিরে তাকানো যাক। ইতিহাসের পাতায় কত কত ঘটনা। অসীম বলে কিছু না থাকলে অসীমসংখ্যক ঘটনা থাকা সম্ভব নয়। তাহলে প্রথম ঘটনা বলে কিছু একটা থাকতে হবে। সেটা হবে সৃষ্টির সূচনা। কিন্তু তার আগে কী ছিল? শূন্যতা? কিন্তু এরিস্টটলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনো প্রথম ঘটনা না থাকলে মহাবিশ্ব নিশ্চয় সবসময় অস্তিত্বে ছিল। ভবিষ্যতেও থাকলে চিরকাল (অসীম সময় পর্যন্ত)। অসীম অথবা শূন্যকে মেনে নিতেই হবে। দুটোর অন্তত একটা না থাকলে মহাবিশ্ব অর্থহীন হয়ে যায়।

এরিস্টটল শূন্যতার ধারণাকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। ফলে তিনি শূন্যতাদারী মহাবিশ্বের বদলে চির ও অসীম মহাবিশ্বের পক্ষ নিলেন। তাঁর মতে, সময়ের চিরবহমানতা জেনোর অসীম বিভাজনের<sup>৯</sup> মতো একটি সম্ভাব্য অসীম।

ভুল হোক আর যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞানের এরিস্টটলীয় ধারণা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে অন্য কোনো মতবাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। বাতিলের খাতায় উঠেছে এর চেয়ে বাস্তব তত্ত্বও। এরিস্টটলের বানানো পদার্থবিজ্ঞান আর জেনোর অসীমকে অস্বীকারের প্রবণতা থেকে সরে আসার আগে বিজ্ঞান আর অগ্রগতি করতে পারেনি।

বুদ্ধির বিড়ম্বনায় জেনো জড়িয়ে পড়েছিলেন বড়সড় ঝামেলায়। খৃষ্টপূর্ব ৪৩৫ সালে তিনি ইলিয়ার স্বৈরচারী রাজা নিয়ারকসকে উৎখাত করার কাজে তৎপর হন। উদ্দেশ্য সাধনে তিনি অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেন। জেনোর দূর্ভাগ্য: নিয়ারকস ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান। জেনোকে গ্রেফতার করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের বের করতে জেনোর ওপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। অল্পতেই জেনো ভেঙে পড়লেন। সহচরদের ধরিয়ে দিতে রাজি হলেন। নিয়ারকস জেনোর কাছে আসলে জেনো তাকে আরও কাছে আসতে বললেন, যাতে নামগুলো গোপন থাকে। নিয়ারকস সামনে ঝুঁকে জেনোর দিকে মাথা বাড়াল। আচমকা জেনো নিয়ারকসের কানে দাঁত বসিয়ে দিলেন। নিয়ারকস চৈতন্যে ওঠে।

কিন্তু জেনোর কামড় ছাড়ার জো নেই। পাশের নির্যাতনকারীরা জেনোকে ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে নিয়ারকসকে উদ্ধার করে। আর এভাবেই মৃত্যু হয় অসীমের মহানায়কের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরেকজন গ্রিক দার্শনিক অসীমের ব্যাপারে জেনোকে ছাড়িয়ে যান। তিনি আর্কিমিডিস। সিরাকিউসের খেপা গণিতবিদ। সে সময়ের চিন্তাবিদদের মধ্যে কেবল তিনিই অসীম নিয়ে চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

সিসিলি দ্বীপে সিরাকিউস ছিল সবচেয়ে প্রাচুর্যময় শহর। আর্কিমিডিস ছিলেন এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাসিন্দা। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি খৃষ্টপূর্ব ২৮৭ সালের দিকে সামোসে জন্মগ্রহণ করেন। পিথাগোরাসের জন্মও একই স্থানে। জন্মের পর আর্কিমিডিস সিরাকিউসে পাড়ি জমান। রাজাকে প্রকৌশলগত সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। সিরাকিউসের রাজাই আর্কিমিডিসকে মুকুট পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। বলতে হবে মুকুটে খাটি সোনা আছে নাকি আছে সীসার মিশ্রণ। এ কাজটি তৎকালীন বিজ্ঞানীদের সাধ্যের অতীত ছিল।

আর্কিমিডিস গোসলের সময় পানির টাবে বসলেন। দেখলেন, টাবের কিনার দিয়ে পানি গড়িয়ে বাইরে পড়ল। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, মুকুটটি পানিতে ডুবিয়ে এর ঘনত্ব এবং আসলত্বের পরীক্ষা করে ফেলা যায়। খেয়াল করতে হবে কতটুকু পানি বাইরে পড়ে যাচ্ছে। দারুণ উপলব্ধির প্রভাবে আর্কিমিডিস নগ্ন অবস্থায়ই টাব থেকে লাফিয়ে নেমে সিরাকিউসের রাস্তা ধরে ছুটলেন, "ইউরেকা! ইউরেকা!"

আর্কিমিডিসের মেধা সিরাকিউসের সামরিক বাহিনীরও কাজে এসেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে গ্রিকদের আধিপত্যের ইতি ঘটে। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতন হয়ে আলাদা আলাদা রাজ্য তৈরি হয়। যারা একে অপরের সাথে বিবাদ করতে থাকে। পান্চাত্যে রোমকরা নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করে। রোমকরা সিরাকিউসের দিকে নজর দেয়। গল্পে আছে, আর্কিমিডিস রোমকদের থেকে সিরাকিউসকে রক্ষা করতে নগরবাসীকে অলৌকিক অস্ত্রের যোগান দেয়। এর মধ্যে ছিল পাথর নিক্ষেপক। ছিল ক্রেন, যা রোমকদের জাহাজকে শূন্য তুলে পরে ফেলে দিতে পানিতে। ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের দর্পণ। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে এ দর্পণ অনেক দূর থেকে রোমকদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। রোমক সৈন্যরা এসব যন্ত্রের খেল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হলো, এসব সৈন্যরা দেয়ালের ওপর দিয়ে কোনো রশি বা কাঠের চিহ্ন দেখলেও ভয়ে পালিয়ে যেত। না জানি আর্কিমিডিস কোন অস্ত্র তাক করবে তাদের দিকে!

আর্কিমিডিস অসীমের দেখা প্রথম পেয়েছিলেন তার যুদ্ধের দর্পণের কাঁচে। কনিক বা চোঙের মতো জিনিসের প্রতি গ্রিকরা বহু শতাব্দী ধরেই আকৃষ্ট ছিল। একটি কোন নিয়ে একে ব্যাসার্ধ বরাবর কাটুন (কোন হলো ঝালমুড়ির প্যাকেটের মতো। কলার মোচাও একই আকৃতির।---অনুবাদক)। কীভাবে কাটছেন তার ওপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে বৃত্ত, উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত। পরাবৃত্তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্য বা দূরবর্তী কোনো উৎসের আলোকে এটি একটি বিন্দুতে মিলন ঘটায়। ফলে আলোর সবটুকু শক্তি একটি জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়। জাহাজকে পোড়ানোর জন্যেও পরাবৃত্তের মতো দেখতে একটি দর্পণ লাগবে। আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য জেনেছিলেন। আর ঠিক এখানেই অসীম নিয়ে তাঁর খেলার শুরু।

পরাবৃত্ত বুঝতে গিয়ে আর্কিমিডিসকে একে পরিমাপ করার উপায় শিখতে হয়েছিল। পরাবৃত্তের খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম কারোই জানা ছিল না। ত্রিভুজ ও বৃত্তের পরিমাপ খুব সহজ ছিল। কিন্তু এর চেয়ে বেশি বিষম (irregular) বাহুর কার্ভের পরিমাপ সে সময়কার গ্রিক গণিতবিদদের সাধ্যের অতীত ছিল। পরাবৃত্তও ছিল তাই। তবে অসীমের আশ্রয় নিয়ে আর্কিমিডিস পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার বুদ্ধি বের করে ফেলেন। প্রথম কাজ হলো পরাবৃত্তের ভেতরে একটি ত্রিভুজ বসিয়ে দেওয়া। এর ফলে দুই দিকে দুটি ছোট ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে। ফাঁকা জায়গা দুটিতে

আর্কিমিডিস আরও ত্রিভুজ বসালেন। এর ফলে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল চারটি। বসানো হলো আরও ত্রিভুজ। এভাবেই চলল খেলা। (চিত্র ১২)

এ যেন একিলিজ ও কচ্ছপের গল্পের মতো। যেখানে রয়েছে অসীম সংখ্যক কাজের ধাপ। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপের চেয়ে ছোট। ছোট ছোট ত্রিভুজগুলোর ক্ষেত্রফল খুব দ্রুত শূন্যের কাছাকাছি চলে আসে। অনেকগুলো জটিল হিসাব-নিকাশ শেষে আর্কিমিডিস অসীমসংখ্যক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বের করেন। পেয়ে যান পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল। সেসময়ের গণিতবিদদের কাছে কাজটা হাস্যকর। আর্কিমিডিস অসীম নিয়ে খেলা করেছেন। তাঁর গণিতবিদ বন্ধুদের কাছে এ এক নিষিদ্ধ কাজ। তাদেরকে খুশী রাখতে অবশ্য আর্কিমিডিস একটি প্রমাণও হাজির করেছেন। সেময়ের স্বীকৃত গাণিতিক ধারণাই কাজে লাগিয়েছেন তাতে। এতে ব্যবহার করেছেন তথাকথিত আর্কিমিডিসের উপপাদ্য। আর্কিমিডিস অবশ্য স্বীকার করেছেন, এই উপপাদ্য আগের গণিতবিদদের দান। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই উপপাদ্য বলছে, যেকোনো সংখ্যাকে নিজের সাথে বারবার যোগ করলে যোগফল যেকোনো সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে শূন্য অবশ্যই এই নিয়মের মধ্যে পড়বে না।

লিমিট ও ক্যালকুলাস প্রকৃত অর্থে আবিষ্কারের আগে আর্কিমিডিসের ত্রিভুজের মাধ্যমে করা এই প্রমাণই এই ধারণাগুলোর সবচেয়ে কাছাকাছি জিনিস। পরবর্তীতে আর্কিমিডিস রেখার সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান পরাবৃত্ত ও বৃত্তের আয়তনও বের করে দেখান। বর্তমানে ক্যালকুলাসের শিক্ষার্থীরা ক্যালকুলাস শেখার শুরুতেই এসব সমস্যা নিয়ে কাজ করে। কিন্তু আর্কিমিডিসের উপপাদ্যে ছিল না শূন্যের ঠাঁই। অথচ শূন্যই অসীম ও অসীমের মধ্যকার সেতু। এমন এক সেতু, যা ক্যালকুলাস ও উচ্চতর গণিতের জন্যে অপরিহার্য।

সমকালীনদের মতো আর্কিমিডিসও অনেকসময় অসীমকে তাচ্ছিল্য করেছেন। ছিলেন এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বে বিশ্বাসী। এ মহাবিশ্ব ছিল বিশাল এক গোলকের অভ্যন্তরে। একবার তার মাথায় চাপল অদ্ভুত এক খেয়াল। তিনি ভাবলেন, পুরো (গোলকীয়) মহাবিশ্বে কতটি বালুকণা আঁটবে তা হিসাব করবেন তিনি। স্যান্ড রেকোনার লেখায় তিনি হিসাব কষে দেখলেন, একটি পোস্তদানায় (আফিমের বীজ) কয়টি দানা ধরবে। এরপর বের করলেন কয়টি পোস্তদানা আঙ্গুলের সমান চওড়া হবে। আঙ্গুলের প্রস্থ থেকে গেলেন স্টেডিয়ামের (বেশী দূরত্ব মাপতে এটাই ছিল গ্রিকদের প্রধান একক) দৈর্ঘ্যে। এভাবে পৌঁছে গেলেন মহাবিশ্বের সাইজ পর্যন্ত। আর্কিমিডিসের হিসাব অনুসারে পুরো মহাবিশ্বকে  $10^{12}$  টি বালুকণা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করা যাবে। যার ফলে (এরিস্টটলীয় মহাবিশ্বের) বাইরের স্থির তারকার গোলকও বালুতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। ( $10^{12}$  কিন্তু আসলেই বড়সড় এক সংখ্যা। ধরুন আপনার কাছে  $10^{12}$  টি পানির অণু আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই মিলে প্রতি সেকেন্ডে এক টন করে পানি পান করলে সবটুকু পানি শেষ করতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর লাগবে।) এই সংখ্যা এতই বড় ছিল যে গ্রিকদের গণনাবিদ্যা এর কাছে এসে পরাস্ত হয়। বিশাল বড় সংখ্যাদের প্রকাশ করার জন্যে আর্কিমিডিসকে একেবারে নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়।

গ্রিক সংখ্যাপদ্ধতিতে ১০,০০০ (অযুত) ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। অযুতের সাহায্যে গ্রিকরা অযুত অযুত (১০ কোটি) সংখ্যাকেও প্রকাশ করতে পারত। আরও কিছুটাও যেতে পারত আরও বড় সংখ্যার দিকে। কিন্তু একটি নতুন চিন্তার সূচনা করে আর্কিমিডিস এই বাধা পেরিয়ে যান। তিনি শুরু করেন খুব সরলভাবে। শুরুতে ১০০ কোটিকে ধরে নিলেন ১। আবার গণনা শুরু করে সংখ্যাগুলোকে নাম দিলেন দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যা। (আর্কিমিডিস ১০০,০০,০০,০০১-কে ১ ধরেননি। ১০০,০০,০০,০০০-কেও ০ ধরেননি। আধুনিক গণিতবিদেরা যদিও সেটাই করবেন। আর্কিমিডিস খেয়াল করেননি, ০ থেকে শুরু করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হত।) দ্বিতীয় ক্রমের সংখ্যারা অযুত অযুত থেকে চলে এল অযুত অযুত

অযুত অযুতে। তৃতীয় ক্রমের সংখ্যারা হলো অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত অযুত বা ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। এভাবে যেতে যেতে তিনি গেলেন ১০ কোটিতম ক্রম পর্যন্ত। এদেরকে তিনি নাম দেন প্রথম যুগের সংখ্যা। কাজটি সুখকর ছিল না। তবে কাজ তাতে হয়ে গেছে। নিজের চিন্তন পরীক্ষা করতে আর্কিমিডিসের যা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশিই হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগুলো বড় হলেও ছিল সসীম। মহাবিশ্বকে বালু দিয়ে ভর্তি করতে যত বালু লাগবে সে সংখ্যার চেয়ে বেশি। গ্রিক মহাবিশ্বে অসীমের দরকার পড়েনি।

আরও সময় পেলে হয়ত আর্কিমিডিস অসীম ও শূন্যের আকর্ষণ দেখতে শুরু করতেন। কিন্তু স্যান্ড রেকোনার (বালু গণনাকারী) বালু গুনতে গুনতে নিয়তির সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। রোমকদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা সিরাকিউসবাসীর ছিল না। সিরাকিউসের পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের জনবল ছিল দুর্বল। দেয়ালগুলো বেয়ে সহজেই এপারে চলে আসা যেত। এর ফলে রোমানরা কিছু সৈন্যকে শহরের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। আর তা বুঝতে পেরেই সিরাকিউসবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার মনোবল গেল ভেঙে। রোমানরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্কিমিডিসের সেদিকে মন দেওয়ার সময় নেই। তিনি মাটিতে বসে বালুতে বৃত্ত আঁকছিলেন। চেষ্টা করছিলেন একটি উপপাদ্য প্রমাণ করতে। এক রোমক সৈন্য ৭৫ বছর বয়সী আলুথালু আর্কিমিডিসকে দেখে পেছন পেছন যেতে বলল। আর্কিমিডিস মানলেন না। কারণ প্রমাণ তখনও শেষ হয়নি। সৈন্যটি রেগে গিয়ে তাঁর গর্দান কেটে ফেলল। এভাবেই রোমকদের অপ্রয়োজনীয় হত্যার শিকার হয়ে মারা যান প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী মানুষটি।

গণিতের জগতে রোমানদের অন্যতম বড় অবদানই আর্কিমিডিসের হত্যা। তারা প্রায় সাত শতাব্দী শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই পুরো সময়ে গণিতের বড় কোনো অগ্রগতি নেই। সময় তো আর থেমে থাকেনি। ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার হয়েছে। রোমানদের পতন হয়েছে। আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়েছে। শুরু হয়েছে অন্ধকার যুগ। আরও সাত শতাব্দী পরে পাশ্চাত্যে শূন্য ফিরে আসে।

এর মাঝে আবার দুজন সন্ন্যাসী শূন্য ছাড়াই একটা ক্যালেন্ডার বানান। যা আমাদেরকে চিরকালের জন্যে বিভ্রান্তির সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

## অন্ধ অভিসার

এ এক তুচ্ছ ও শিশুসুলভ আলাপ। আমাদের বক্তব্যের বিরোধীতাকারীদের নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ এটি।

- দ্য টাইমস (লন্ডন), ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৯৯

এই 'তুচ্ছ ও শিশুসুলভ' আলাপটি হলো নতুন শতাব্দীর সূচনা নিয়ে। নতুন শতাব্দী কি ০০ তে শুরু হবে, নাকি ০১ থেকে। এই আলাপটি এক শ বছর পরপর ঘড়ির কাঁটার মতো ফিরে ফিরে আসে। মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা শূন্যের কথা জানলে ক্যালেন্ডার নিয়ে এই ঝামেলায় পড়া লাগত না।

তবে না জানার জন্য সন্ন্যাসীদের দোষ দেওয়া যায় না। আসলে মধ্য যুগের পশ্চিমে শুধু খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীরাই গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছে। শুধু তাদের মধ্যেই কিছু বিজ্ঞ লোক খুঁজে পাওয়া যেত। দুটি কারণে তাদের গণিতের প্রয়োজন পড়েছিল। প্রার্থনা আর অর্থ। টাকা গুনতে তাদের জানতে হয় কীভাবে...হুম...টাকা গুনতে হয়। এর জন্যে তারা ব্যবহার করত অ্যাবাকাস বা কাউন্টিং বোর্ড। কাউন্টিং বোর্ডও অ্যাবাকাসের মতো ছিল। যেখানে পাথর বা এমন কিছুকে টেবিলের



ওপর চালাচালি করা হত। কাজটা করতে খুব একটা দক্ষতা থাকা লাগত না। তবে সে সময়ের তুলনায় সেটাই ছিল অত্যাধুনিক এক যন্ত্র। আবার প্রার্থনার জন্য পূজারীদের সময় ও তারিখ জানা লাগত। ফলে পূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সময়গণনা ছিল অপরিহার্য। নিয়মিত বিরতিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা করতে হত। (ইংরেজি noon বা দুপুর শব্দটি এসেছে nones থেকে। যার অর্থ হলো মধ্যযুগের দিনের মধ্যভাগের প্রার্থনা) সময় না জানলে রাতের প্রহরী কীভাবেই বা সঙ্গীদের আরামের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বলবে? একটা ভাল ক্যালেন্ডার না থাকলে কীভাবে জানা যাবে কখন ইস্টার<sup>১০</sup> উদযাপন করতে হবে? এটা ছিল এক বড় সমস্যা।

ইস্টারের তারিখ বের করা অত সহজ কোনো কাজ ছিল না। এক ক্যালেন্ডারে তারিখ আসে একেকটা। গির্জার কেন্দ্র ছিল রোমে। আর খ্রিষ্টানরা ব্যবহার করত রোমান সৌর ক্যালেন্ডার। এতে দিনের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৩৬৫। কিন্তু যিশু বা ঈসা (আ) ছিলেন জাতিতে ইহুদী। তিনি তাই ব্যবহার করতেন ইহুদীদের চান্দ্র পঞ্জিকা। যেটায় দিনের সংখ্যা মাত্র ৩৫৪-এর মতো। যিশুর (আ) জীবনে বড় ঘটনাগুলো চান্দ্র মাসের তারিখ দিয়ে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে সূর্যের ভূমিকা বেশি। ক্যালেন্ডার দুটির তারিখে গরমিল সবসময় হতেই থাকে। ফলে ছুটির দিন বের করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ইস্টারও এমন একটি সমস্যাময় ছুটির দিন। এ কারণে ১০০ বছরের ইস্টারের তারিখ বের করে রাখার জন্য কয়েক প্রজন্ম পর পর একজন সন্ন্যাসীকে দায়িত্ব দেওয়া হত।

দিওনিসিউস এক্সিগুস ছিলেন এমন একজন সন্ন্যাসী। ষষ্ঠ শতকে পোপ ১ম জন তাকে ইস্টারের তারিখগুলো আরও বেশি বের করে রাখার জন্য বলেন। তারিখগুলোকে রূপান্তর ও নতুন হিসাব করতে গিয়ে দিওনিসিউস একটু গবেষণা চালালেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যিশুর (আ) জন্মতারিখও বের করতে পারবেন। কিছু সময় গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে তিনি ঠিক করলেন তৎকালীন বর্তমান বছর হলো যিশুর (আ) জন্মের ৫২৫তম বছর। দিওনিসিউস ভাবলেন, যিশুর জন্ম বছরই ১ম বছর বা ১ম খ্রিষ্টাব্দ হওয়া উচিত। অবশ্য দিওনিসিউস বলেছিলেন, খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল আগের বছরের ২৫ ডিসেম্বরে। কিন্তু তিনি ১ জানুয়ারির ১ তারিখে ক্যালেন্ডার শুরু করেন রোমান বর্ষের সাথে মিল রাখার জন্য। তার পরবর্তী বছর ছিল ২য় খ্রিষ্টাব্দ, পরেরটা ৩য় খ্রিষ্টাব্দ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে আগের বছর প্রচলিত দুটি তারিখ নির্ধারণ পদ্ধতির জায়গায় নতুন এ নিয়ম আসল<sup>১১</sup>। কিন্তু সমস্যা একটা থেকে গেল। আসলে দুটি।

প্রথম কথা হলো, দিওনিসিউস যিশুর (আ) ভুল জন্মতারিখ বের করে। বিভিন্ন সূত্রের ঐকমত্য থেকে জানা যায়, রাজা হেরোড নবজাতক মসীহ (আ) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন। এ কারণে মেরি ও জোসেফ রাজার আক্রোশ থেকে বাঁচতে পালিয়ে যান। কিন্তু হেরোড মারা যান খ্রিষ্টপূর্ব তিন সালে। মানে খ্রিষ্টের (আ) জন্মের কয়েক বছর আগেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দিওনিসিউসের ভুল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, খ্রিষ্টের (আ) জন্ম হয়েছিল চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে। দিওনিসিউসের হিসাবে কয়েক বছরের ভুল হয়েছিল।

সত্যি বলতে এ ভুল কিন্তু অত মারাত্মক কিছু নয়। ক্যালেন্ডারের প্রথম বছর বাছাই করার ক্ষেত্রে কোন বছর বাছাই করা হলো তা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে পরের সব হিসাব হতে হবে নির্ভুল। চার বছরের ভুলে কোনো ক্ষতি নেই, যদি সবাই ভুলটার ব্যাপারে মেনে নেয়। যেমন আমরা মানলাম। কিন্তু দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডারে আরও মারাত্মক এক সমস্যা ছিল। আর তা হলো শূন্য।

শূন্যতম বছর ছিল না এতে। এমনিতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সে সময়ের বেশিরভাগ ক্যালেন্ডার প্রথম বছর থেকে শুরু। শূন্য নয়। শূন্যতে শুরু করার কোনো উপায়ই দিওনিসিউসের ছিল না। তিনি শূন্যের কথা জানতেনই না। তিনি বেড়ে ওঠেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর। রোমানদের স্বর্ণযুগেও তারা গণিতে ভাল কিছু করে দেখাতে পারেনি। ৫২৫

সালে শুরু অন্ধকার যুগের। পশ্চিমারা গোলমেলে রোমান পদ্ধতির সংখ্যার ব্যবহার করা শুরু করল। এই গণনাপদ্ধতিতে কোনো শূন্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দিওনিসিউস যিশুর (আ) জন্মের প্রথম বছরকে ধরেন বছর নং ১ (I)। পরের বছর হবে II। আর দিওনিসিউস এ সিদ্ধান্ত নেন DXXXV তম বছরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর তাছাড়া দিওনিসিউসের ক্যালেন্ডার তখনো অত জনপ্রিয় হয়নি। ৫২৫ সালে রোমান রাজ দরবারের বুদ্ধিজীবীরা এক মহা সমস্যায় পড়ল। পোপ জন মারা গেলেন। ক্ষমতার পালাবদল হলো। সব দার্শনিক ও দিওনিসিউসের মতো গণিতবিদদেরকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তাও ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। অন্তত প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছেন। (অন্যরা এত ভাগ্যবান ছিলেন না। অ্যানিসিউস বোথিউস ছিলেন প্রভাবশালী দরবারী। মধ্যযুগের অন্যতম পাশ্চাত্য গণিতবিদ ও উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব। দিওনিসিউসকে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রায় একই সময়ে বোথিয়াসও ক্ষমতা হারান। বন্দী করা হয় তাকে। বোথিয়াস ইতিহাসে ঠাঁই অবশ্য গণিতের জন্য পাননি। পেয়েছেন তার দ্য কম্পোলেশন অব ফিলোসফি (দর্শনের সাত্ত্বনা) গ্রন্থের জন্য। এখানে তিনি এরিস্টটলীয় ধরনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে তাকে পিটিয়ে মারা হয়।) যাই হোক, বছরের পর বছর এই দুর্বলতা নিয়ে চলতে থাকে নতুন পঞ্জিকা।

নতুন পঞ্জিকায় শূন্য নেই। সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে দুই শতাব্দী পরে। ৭৩১ সালের দিকে দিওনিসিউসের ইস্টার টেবিল ফুরিয়ে আসছে। উত্তর ইংল্যান্ডের ক্রমেই শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠা সন্ন্যাসী বিড টেবিলটাকে আবারও বড় করলেন। সম্ভবত এভাবেই তিনি দিনিওসিউসের কথা জানতে পেরেছিলেন। বিড ব্রিটেনের গির্জার ইতিহাস লিখেছিলেন দ্য ইক্লেসিয়েসটিক্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ পিপল বইয়ে। এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন নতুন পঞ্জিকা।

বইটি অসাধারণ সাফল্য পায়। কিন্তু এতে ছিল মস্ত বড় এক ভুল। বিড খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ সাল থেকে ইতিহাস শুরু করেন। মানে দিনিওসিউসের মূল বর্ষ থেকে অনেক আগেই। বিড নতুন তারিখ পদ্ধতি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তিনি দিনিওসিউসের পঞ্জিকাকে পেছন দিকে লম্বা করে নিলেন। বিডও কিন্তু শূন্যের কথা জানতেন না। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের আগের বছরটি তাই ছিল খ্রিষ্টপূর্ব এক। শূন্যতম বছরের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রথম দৃষ্টিতে এই ক্রমিক পদ্ধতিকে খারাপ কিছু মনে হবে না। কিন্তু এটা ঝামেলা ঠিকই বাঁধিয়েছে। খ্রিষ্টাব্দগুলোকে ধনাত্মক আর খ্রিষ্টপূর্ব সালগুলোকে ঋণাত্মক সাল মনে করুন। বিডের গণনাপদ্ধতি ছিল: ..., -৩, -২, -১, ১, ২, ৩, ...। শূন্যের জায়গা হওয়া উচিত ছিল -১ ও ১ এর মাঝে। কিন্তু শূন্যকে রাখা হয়নি। সবাইকে যা ঠেলে দিল ভুলের দিকে। ১৯৯৬ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে পঞ্জিকা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক সবাইকে সহস্রাব্দ বিতর্ক (মিলেনিয়াম কন্ট্রোভার্সারি) নিয়ে চিন্তা করার উপায় বাতলে দেন। এরপর কোনো কিছুই না ভেবে বলে দিলেন, যেহেতু যিশুর (আ) জন্ম চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালে, ১৯৯৬ হলো তাঁর জন্মের ২০০০তম বছর। দেখে একেই সঠিক মনে হয়। (১৯৯৬-(-৪)) = ২০০০। কিন্তু ভুল। আসলে এটা হবে ১৯৯৯তম বছর।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব সালের জানুয়ারির ১ তারিখে। তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে তার বয়স এক বছর। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে বয়স দুই। খ্রিষ্টপূর্ব এক সালে বয়স তিন। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স দাঁড়াল চারে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে তার বয়স হবে পাঁচ। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখ পর্যন্ত তার জন্মের পর কত বছর সময় অতিবাহিত হলো? অবশ্যই পাঁচ বছর। কিন্তু বছর বিয়োগ করে এটা পাওয়া যাবে না। ২-(-৪) = ৬। ভুল হচ্ছে শূন্যতম বছর না থাকার কারণে।

আসলে শূন্যতম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাচ্চাটির বয়স চার হওয়ার কথা। প্রথম খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে ছয়।

এভাবে হিসাব করে গেলে সব সংখ্যা ঠিকভাবে কাজ করবে। বাচ্চার বয়স বের করতে হলে সরল একটি বিয়োগ করতে হবে। ২ থেকে -৪। কিন্তু তা নয়। ঠিক ফল পেতে হলে যোগফল থেকে আরও বাড়তি এক বিয়োগ করতে হবে। অতএব, ১,৯৯৬ সালে যিশুর (আ) বয়স ২,০০০ বছর ছিল না। ছিল ১,৯৯৯। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। তার চেয়েও খারাপ আসলে।

ধরুন একটি বাচ্চার জন্ম হলো প্রথম বছরের প্রথম দিনের প্রথম সেকেন্ডে। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ তারিখে। দ্বিতীয় বছরে তার বয়স হবে এক, তৃতীয় বছরে দুই ইত্যাদি। ৯৯তম বছরে তার বয়স হবে ৯৮। ১০০তম বছরে ৯৯ বছর। এবার ধরুন বাচ্চার নাম দেওয়া হলো শতক। ১০০তম বছরে শতকের বয়স ৯৯। সে তার ১০০তম জন্মদিন পালন করবে ১০১তম বছরের জানুয়ারির ১ তারিখে। তার মানে দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হবে ১০১ সালে। একইভাবে তৃতীয় শতাব্দী শুরু হবে ২০১ সালে। আর বিংশ শতাব্দী ১৯০১ সালে। এর অর্থ হলো একবিংশ শতাব্দী বা তৃতীয় সহস্রাব্দ শুরু হবে ২,০০১ সালে। সহজে হয়ত ব্যাপারটা চোখে পড়ে না।

১,৯৯৯ সালের ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে সব হোটেল-রেস্টুরেন্ট অগ্রিম বুক হয়ে গেল। ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে নয় কিন্তু। সহস্রাব্দ উৎসব সবাই করল ভুল তারিখে। উৎসবকারীদের উৎসাহের কাছে হার মানল রয়েল গ্রিনউইচ মানমন্দিরও। অথচ পৃথিবীর সময় সংরক্ষণ ও তারিখের গোলমাল সমাধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব তাদেরই। মানমন্দিরের পারমাণবিক ঘড়ি এগিয়ে চলছে। আর নিচে ওদিকে মানুষ আশায় বসে আছে, সরকারি অর্থায়নে মহোৎসব হবে। হবে স্মরণীয় এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আয়োজকরা তারিখ ঠিক করে রেখেছে ৩১ ডিসেম্বর, ১,৯৯৯। অনুষ্ঠান শেষ ২,০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর, যখন কিনা মাত্র মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদরা সহস্রাব্দ উৎসব শুরু করেছেন।

জ্যোতির্বিদরা অন্যদের মতো করে সময় নিয়ে খেলতে পারেন না। তারা নজর রাখেন মহাকাশে। মহাকাশের ঘড়ি অধিবর্ষে ধাক্কা খায় না। মানুষ পঞ্জিকা বদলাতে চাইলেই বদলে যায় না মহাকাশ। এ কারণে জ্যোতির্বিদরা মানুষের পঞ্জিকাকে এড়িয়ে চললেন। তারা যিশুর (আ) জন্ম থেকে বছর গণনা করেন না। তারা গণনা শুরু করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭১৩ সালের জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে। এ সালটা মোটামুটি ঝামেলাবিহীন সংখ্যা। ১৫৮৩ সালে পণ্ডিত জোসেফ স্ক্যালিগার তারিখটি ঠিক করেন। তার বানানো জুলীয় (Julian) তারিখ মহাকাশের ঘটনার তারিখের হিসাব রাখার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। জুলীয় নামটা এসেছে স্ক্যালিগারের বাবার নাম থেকে। জুলিয়াস সিজার নয়। এ তারিখগুলোতে একের পর এক সংশোধন করতে থাকা পঞ্জিকাগুলোর মতো ঝামেলা ছিল না। পরে অবশ্য এ পদ্ধতিতে একটু পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জিত জুলীয় তারিখ একদম ২৪,০০,০০০ দিন ও ১২ ঘণ্টা কম। এতে শূন্যতম ঘণ্টা পড়েছে ১,৭১,৮৫৮ সালের মধ্যরাতে। এটাও মোটামুটি সাধারণ এক সংখ্যা। //

জ্যোতির্বিদরা হয়ত পরিমার্জিত ৫১,৫৪২ জুলীয় তারিখ উদযাপন করতে চাইবেন না। ইহুদিরা এড়িয়ে যাবে ৫৭৬০ সালের ২৩ তেভেত (ইহুদি পঞ্জিকার দশম মাস)। মুসলমানরা ভুলে যাবে ১,৪২০ সালের ২৩ রমাদান। তবে দ্বিতীয়বার ভাবলে হয়ত তারা এমনটা করবে না। সবাই বুঝতে পারবে তারিখটা হলো আসলে ১,৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আর ২,০০০ সালটার মধ্যে আছে বিশেষ কিছু একটা।

ঠিক কী কারণে তা জানা না গেলেও আমরা মানুষরা সুন্দর সংখ্যা ভালোবাসি। ভালোবাসি এমন সংখ্যা যাতে আছে অনেক অনেক শূন্য। আমরা ৯৯-এর পরে ১০০ দেখার জন্য বসে থাকি। ৯৯৯-এর পরে বসে থাকি ১,০০০ এর জন্য। বাচ্চারা ১০০, ১০০০ দেখলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

## শূন্যতম সংখ্যা

পোলিশ গণিতবিদ ওয়ালু সিয়েপিস্কি চিন্তিত হয়ে ভাবছেন লাগেজের আরেকটা ব্যাগ কোথায় গেল। স্ত্রী বলল, "প্রিয়, ছয়টি ব্যাগই তো আছে।" "তা কীভাবে হয়? আমি তো কয়েকবার গুনলাম: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫।

~ দ্য বুক অব নাম্বারস, জন কওনয়ে ও রিচার্ড গাই

দিনিসিউস ও বিড পঞ্জিকায় শূন্যকে না রেখে ভুল করে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগবে। কারণ বাচ্চার এক, দুই, তিন ... এভাবে গোনো। শূন্য, এক, দুই... এভাবে না। মায়ানরা ছাড়া আর কারও শূন্যতম বছর ছিল না। কেউ মাসের শুরু করেনি শূন্য দিন থেকে। একে অস্বাভাবিক লাগে। তবে পেছন দিকে গুনতে গেলে সেটাই আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক। শুরু!

স্পেস শাটল মহাশূন্যে ছুটে যাবার আগে শূন্যের জন্যে অপেক্ষা করে। শূন্যতম ঘণ্টায় ঘটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম ঘণ্টায় নয়। বোমার বিস্ফোরণগুলোর দিকে যেতে থাকলে আপনি যেতে থাকেন গ্রাউন্ড জিরোর দিকে।

ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ আসলে শূন্য থেকেই গণনা শুরু করে। স্টপওয়াচ চলতে শুরু করে ০:০০:০০ থেকে। এক সেকেন্ড পরে দেখা যায় ০:০১:০০। নতুন গাড়ির অডোমিটারে (দূরত্ব পরিমাপক) লেখা থাকে ০০০০০। যদিও কেনার আগে কিছু পথ গাড়িটা চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। সেনাবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে দিন শুরু হয় ০০০০ ঘণ্টায়। কিন্তু কোনো কিছু গুণতে গেলেই আমরা এক থেকে শুরু করে জোরে জোরে গুণতে থাকি। তবে গণিতবিদ বা কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা<sup>১২</sup> আলাদা।

১, ২, ৩,... ইত্যাদি গণনাবাচক সংখ্যা নিয়ে কাজ করলে সহজেই ক্রম অনুসারে সাজানো যায়। এক হলো প্রথম গণনাবাচক সংখ্যা, দুই হলো দ্বিতীয় গণনাবাচক সংখ্যা আর তিন হলো তৃতীয়। সংখ্যা আর ক্রম নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই। দুটো একই। বছ বছর ধরে এভাবেই সব চলছিল। সবাই তাতে খুশী। কিন্তু শূন্যের আগমনে সংখ্যা আর ক্রমের নির্ভেজাল সম্পর্কে ছেদ পড়ল। সংখ্যারা হলো এমন: ০, ১, ২, ৩,...। প্রথম সংখ্যা শূন্য। দ্বিতীয়টি এক। তৃতীয় সংখ্যা হলো দুই। সংখ্যা আর ক্রম এক থাকল না। পঞ্জিকার সমস্যার মূল কারণ এটাই।

দিনের প্রথম ঘণ্টা শুরু হয় মধ্যরাতের পরের শূন্যতম সেকেন্ডে। দ্বিতীয় ঘণ্টার শুরু রাত একটায়। আর তৃতীয় ঘণ্টা শুরু রাত দুটোয়। আমরা গুনি ক্রমবাচক সংখ্যা দিয়ে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়)। কিন্তু সময়ের হিসাব হয় সংখ্যাবাচক (০, ১, ২)। যেমন, রাত ২টা ৩০ মিনিট মানে হলো তৃতীয় ঘণ্টার ৩০ মিনিট পার হয়েছে। পছন্দ করি আর নাই করি, এটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। একটি বাচ্চা ১২ মাস পার করলে আমরা বলি তার এক বছর হয়েছে। সে তার জীবনের প্রথম ১২ মাস পূর্ণ করেছে। এক বছর পরে বয়স এক হয়ে থাকলে তার আগে বয়স কি শূন্য হবে না? হ্যাঁ, আমরা বলতেই পারি বাচ্চাটির বয়স ৬ সপ্তাহ বা ৯ মাস ইত্যাদি। শূন্যকে এড়িয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটা ভালোই!

দিনিসিউস শূন্যের কথা জানত না। তার পঞ্জিকা তাই শুরু হয় এক (১) নং বছর থেকে। ঠিক যেভাবে কাজটা করেছে তার পূর্বপুরুষরা। সে সময়ের মানুষরা পুরনো পদ্ধতির সংখ্যা ও ক্রমের সমতুল্যতার ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করত। এতে তাদের কোনো অসুবিধা হত না। তাদের মাথায় শূন্য না আসলে এ ব্যাপারটিতে কোনো সমস্যাই ছিল না।

## বিশাল শূন্যতা

তা একদম শূন্যতা ছিল না। সেটা ছিল সংজ্ঞাহীন এক ধরনের আকারহীনতা। ... সত্যিকার যুক্তি আমাকে বুঝিয়ে দেয়, পরম আকারহীনতাকে বুঝতে হলে সব ধরনের আকারের অবশিষ্টাংশ আমাকে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে হবে।  
আমি তা পারিনি।

~ সেন্ট অগাস্টিন, কনফেশনস

সন্ন্যাসীদেরকে এর জন্য আসলে দোষ দেওয়া যায় না। দিওনিসিয়ুস এক্সিগিউস, বোথিয়াস ও বিডদের পৃথিবী ছিল অন্ধকার। রোমের পতনের পর পশ্চিমা সভ্যতা এর অতীত ঐতিহ্যের ছায়া হয়ে রইল। ভবিষ্যতকে অতীতের চেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। জ্ঞানের সন্ধানে মধ্যযুগের পণ্ডিতরা সমসাময়িকদের দিকে না তাকিয়ে এরিস্টটল ও নব্যপ্লেটোনিয় মতবাদের দিকে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রাচীন সময় থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান আমদানি করার সাথে সাথে এরা অসীম ও শূন্যতার ভয়কেও আমদানি করে নিয়ে আসে।

মধ্যযুগের পণ্ডিতরা শূন্যতাকে বাজে জিনিস মনে করত। আবার বাজে জিনিসকেও মনে করত শূন্য। আক্ষরিক অর্থেই শয়তান ছিল শূন্য। বোদিয়াসের যুক্তি ছিল এ রকম: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। এমন কিছুই নেই যা তিনি করতে পারেন না। কিন্তু পরম মহান ঈশ্বর কখনও মন্দ কাজ করতে পারেন না। অতএব, মন্দ হলো শূন্য। মধ্যযুগীয় মন একেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। /////

তবে মধ্যযুগীয় দর্শনের অন্তরালে একটি দ্বন্দ্ব লুকিয়ে ছিল। এরিস্টটলীয় মতবাদ ছিল গ্রিকধর্মী। কিন্তু সৃষ্টির ইহুদি-খ্রিষ্টান ধারণা ছিল সেমেটিক। আর সেমেটিকদের শূন্যতা নিয়ে তেমন ভয় ছিল না। সৃষ্টির সূচনাই হয়েছে একটি বিশৃঙ্খল শূন্যতা থেকে। চতুর্থ শতকের ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির আগের অবস্থায় শূন্য শূন্য ধরনের কিছু একটা ছিল। যা একদম পুরোপুরি শূন্যতার চেয়ে খানিক বেশি। তবু শূন্যের ভীতি ছিল মারাত্মক রকমের। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তাই বাইবেলকে সংশোধন করে এরিস্টটলীয় মতবাদের সাথে মেলানোর চেষ্টা চালায়। অথচ করার কথা উল্টোটা।

তবে আশার কথা হলো, সব সভ্যতা শূন্যকে এতটা ভয় করেনি।

### তথ্যনির্দেশ

১। গ্রিক দার্শনিক জেনো তার নিজের ও পারমিনিডিসের কিছু মতবাদ প্রমাণের জন্যে বেশ কিছু প্যারাডক্স তৈরি করেন। মূলত তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, গতি বলতে কিছু নেই। সবই চোখের ভুল। প্যারাডক্সগুলোর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত একটি হলো একিলিজ ও কচ্ছপ প্যারাডক্স। এমন বেশ কিছু প্যারাডক্স নিয়ে জানা যাবে অনুবাদকের অসীম সমীকরণ বইয়ে। এছাড়াও পড়ুন: [www.statmania.info](http://www.statmania.info)

২। কথাটি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নববিধানের জনের সুসমাচার (Gospel)-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ। তবে মূল সংস্করণে 'অনুপাত' শব্দের বদলে 'শব্দ' বলা হয়েছে। তবে গ্রিক ভাষায় অনুপাতকে বলা হয় লোগোস। আবার শব্দ বোঝাতেও একই শব্দ বোঝানো হয়। যার ফলে প্রথাগত অনুবাদের চেয়ে অনুপাত বলাটাই শ্রেয়।

-লেখকের নোটের আলোকে অনুবাদক।

৩। পৃথিবীর রাতের আকাশে খালি চোখে শুধু পাঁচটি গ্রহই দেখা সম্ভব। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এ কারণেই প্রাচীনকালে মানুষ গ্রহ বলতে এই পাঁচটিকেই চিনত।

৪। সবচেয়ে সুন্দর সংখ্যা অবশ্যই একেজনের কাছে একেকটি। কারও কাছে পাই (৩.১৪১৬) সবচেয়ে সুন্দর। কারও কাছে (আমিসহ) আবার সুন্দর অয়লার সংখ্যা (২.৭১৮...)।

৫। কারণ অর্ধ-ইঞ্চিকে আদর্শ বানাতে মোট দাগ হবে ২৪টি। তাহলে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে পড়বে  $১০+১$  টি = ১১টি দাগ। বাকি অংশও এভাবে।

৬। মূলদ সংখ্যার ইংরেজি নাম rational number, যাকে আক্ষরিক বাংলা করলে হয় যৌক্তিক সংখ্যা।

৭। ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর সেট বা গুচ্ছকে বলা হয় স্বাভাবিক বা গণনা সংখ্যা।

৮। এ শর্তটা প্রয়োজনীয়, তবে যথেষ্ট নয়। পদগুলো খুব ধীরে শূন্যের দিকে অগ্রসর হলে যোগফল সসীম সংখ্যায় গিয়ে নাও মিলতে পারে।

৯। জেনো যেভাবে যেকোনো সসীম জিনিসকে অসীম বানিয়ে দিতেন। ধরুন বাস ধরতে হলে আপনাকে ১ মাইল হাঁটতে হবে। ১ মাইল যেতে হলে আগে ৫০০ মিটার যেতে হবে। ৫০০ মিটার যেতে হলে ২৫০ মিটার তো আগে যেতে হবে। সেজন্যে আবার ১২৫ মিটার। এভাবে চিন্তা করলে অসীম সংখ্যক দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। যা আসলে একটি কৃত্রিম অসীম। কারণ সবগুলো দূরত্ব যোগ করলে দাঁড়ায় ঐ এক (১) মাইলই।

১০। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যিশুর (আ) ক্রুশবিদ্ধ করার (শুক্রবার) পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তৃতীয় দিনে (রবিবার) তিনি পুনরুত্থিত হন। এ ঘটনার নামই ইস্টার। বর্তমানে প্রতি বছর ২০ এপ্রিল ইস্টার সানডে পালিত হয়।

১১। একটি পদ্ধতিতে ১ম বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল রোম শহরের প্রতিষ্ঠাকে ভিত্তি ধরে। আরেকটিতে সম্রাট ডায়োক্লিসানের সিংহাসনে আরোহণকে ভিত্তি ধরা হয়। খ্রিস্টানদের কাছে তাদের নবীর জন্ম একটি শহর প্রতিষ্ঠার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে শহরকে আবার ভ্যান্ডাল ও গথরা কয়েকবার লুণ্ঠন করেছে। আবার কোনো সম্রাটের শাসনকালের সূচনা নিয়েও তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। যার আবার ছিল এক দূর্ভাগ্যজনক শখ: খ্রিস্টানদের ভোজের জন্য সে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণীদেরকে বন্দী করে ধরে রাখত।

১২। কম্পিউটার প্রোগ্রামাররা কোনো কাজ বারবার করার জন্য প্রোগ্রাম লিখলে শূন্য থেকে শুরু করেন। ধরা যাক কোনো কাজ দশ বার করা হবে। তাহলে শূন্য থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত। কোনো প্রোগ্রামার মনের ভুলে এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত যেতে পারে। ফলে দশ ধাপের বদলে কাজটি হবে নয় ধাপ। ১৯৯৮ সালে অ্যারিজোনাতে এমন একটি ভুলই একটি লটারি ভণ্ডুল করে দেয়। বারবার তোলার পরেও নয় উঠছিল না। পরে এক মুখপাত্র বিব্রত বদনে স্বীকার করে, 'ভুলবশত নয় প্রোগ্রামে বাদ পড়েছিল।'

## তৃতীয় অধ্যায়

### শূন্যের বরণ

[প্রাচ্যে শূন্যের আগমন]

অসীমের মাঝেই আছে আনন্দ। সসীমের মাঝে কোনো মজা নেই।

~ ছান্দোগ্য উপনিষদ

পশ্চিমের শূন্যের ভীতির মাঝেও প্রাচ্য শূন্যকে স্বাগত জানায়। ইউরোপে শূন্য ছিল নিগূহীত। কিন্তু ভারতে ও পরে আরবে শূন্যের বিকাশ ঘটে। শেষবার যখন আমরা শূন্যকে দেখেছি, সেখানে শূন্য ছিল শুধুই একটি স্থানীয় মান। ব্যাবিলনীয় গণনাপদ্ধতিতে শূন্য ছিল একটি ফাঁকা দাগ। শূন্য কিছু কাজে লেগেছিল, কিন্তু নিজে কোনো সংখ্যা ছিল না। এর কোনো মান ছিল না। এর বাঁয়ের অঙ্কগুলোই একে অর্থবহ করে তুলত। নিজে একা থাকলে আক্ষরিকভাবেই এর কোনো অর্থ হত না। ভারতে এসে অবস্থা পাল্টাল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর পারস্য বাহিনী নিয়ে ব্যাবিলন থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। এই আগ্রাসনের সময় ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথমবারের মতো ব্যাবিলনীয় সংখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। জানতে পারে শূন্যের কথাও। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব সালে অ্যালেক্সান্ডার মারা যান। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত জেনারেলরা সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে রোম ক্ষমতায় আরোহণ করে। গ্রিস রোমের থাবায় আটকে পড়ে। তবে অ্যালেকজান্ডার যতটা এসেছিলেন, রোমকদের ক্ষমতা ততটা পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ও রোমের পতনের প্রভাব থেকে দূরের ভারত মুক্ত রইল।

ভারত এরিস্টটলের প্রভাব থেকেও মুক্ত রইল। হ্যাঁ, অ্যালেকজান্ডার এরিস্টটলের শিষ্য ছিলেন। তাঁর দর্শনও অবশ্যই নিয়ে আসেন ভারতে। তবে গ্রিক দর্শন ভারতে কখনোই সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। গ্রিসের মতো ভারতে অসীম বা শূন্যতা নিয়ে কোনো ভীতি ছিল না। বরং এখানে এ ধারণাকে বরণ করা হয়।

হিন্দু ধর্মে শূন্যতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হিন্দু ধর্মের সূচনা বহুশ্বেতবাদের ধারণা থেকে। অনেক দিক থেকেই গ্রিক রূপকথার মতো এখানেও যোদ্ধা দেবতাদের গল্প প্রচলিত আছে। তবে অ্যালেকজান্ডারের আগমনের বহু শতাব্দী আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেবতারা একীভূত হতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতাদের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলেও মৌলিকভাবে এটি একেশ্বরবাদী ও অন্তর্বীক্ষণমূলক ধর্ম হয়ে গেছে। সকল দেবতা সর্বদ্রষ্টা ব্রহ্মার বিভিন্ন অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। পশ্চিমে গ্রিকদের উত্থানের প্রায় একই সময়ে হিন্দু ধর্ম পশ্চিমা রূপকথার সাথে মিল হারাচ্ছিল। স্বতন্ত্র দেবতাদের ভূমিকা হারিয়ে যাচ্ছিল। আধ্যাত্মিক শক্তি ধর্মটায় অনুভূত হচ্ছিল। নিঃসন্দেহে, আধ্যাত্মিকতার উৎস প্রাচ্য।

প্রাচ্যের অনেক ধর্মের মতোই হিন্দু ধর্মে আছে দ্বৈতবাদের কথা। পাশ্চাত্যেও মাঝেমাঝে এর উদয় ঘটেছিল। তবে এ ধরনের চিন্তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এমন একটি বিপরীত চিন্তা হলো মানিকিজম বা মানি ধর্ম। এখানে বলা হয়, পৃথিবীটা সমান ও বিপরীত পরিমাণ ভালো ও খারাপ দ্বারা প্রভাবিত। দূরপ্রাচ্যের ইন ও ইয়াং এবং নিকটপ্রাচ্যের জরথুষ্ট্রের ভালো ও খারাপের মতো সৃষ্টি ও ধ্বংস ছিল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দেবতা শিব একইসাথে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের নায়ক। ছবিতে দেখানো হয়, তার এক হাতে সৃষ্টির ঢাক, আরেক হাতে ধ্বংসের শিখা। তবে শিব আবার শূন্যতারও প্রতিনিধিত্ব করে। এই দেবতার একটি দিক হলো নিষ্কল শিব। আক্ষরিকভাবে এই শিবের অর্থই হলো অংশবিহীন শিব। চূড়ান্ত ভয়েড বা শূন্যতা ও পরম নাথিংনেস। প্রাণহীনতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিও

ভয়েড বা শূন্য থেকে। যেভাবে জন্ম অসীমের। হিন্দু ধর্মের মহাবিশ্ব পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে আলাদা ছিল। এখানে মহাবিশ্বের পরিধি অসীম। আমাদের মহাবিশ্ব পেরিয়ে আছে আরও বহু বহু মহাবিশ্ব।

ওদিকে মহাবিশ্ব আবার তার শূন্যতাকেও ভুলে যায়নি। শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম। আবার শূন্যতার প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়াল মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এক গল্পে আত্মা সম্পর্কে মৃত্যু এক শিষ্যকে বলছে, “সব প্রাণীর হৃদয়ে লুকায়িত আছে আত্মা, স্বকীয়তা। সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র, সুবিশাল মহাকাশের চেয়ে বড়।” এ আত্মা বাস করে সব জিনিসের মধ্যে। এ আত্মা মহাবিশ্বের নির্যাসের অংশ। এর নেই মৃত্যু। কেউ মারা গেলে আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়। প্রবেশ করে আরেক দেহে।<sup>১</sup> আত্মার স্থানান্তরের মাধ্যমে মানুষটার নবজন্ম হয়। হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে পুনর্জন্মের চক্র থেকে পুরোপুরি বের করে আনা। মৃত্যুর প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে মরা থেকে প্রাণহীনতার মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের পথ হলো বাস্তবতার ভ্রম থেকে সরে আসা। দেবতার কথা হলো, “আত্মার বাড়ি দেহ। আনন্দ ও কষ্টের শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ দেহের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কখনও মুক্তি পাবে না। মুক্তির জন্য রক্ত-মাংসের চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার শূন্যতা ও নিরবতাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মা তখন মানবিক চাহিদা ত্যাগ করে উড়ে চলে যাবে। যোগ দিবে সম্মিলিত চেতনার সমাবেশে। যে অসীম আত্মা পুরো মহাবিশ্বে বিস্তৃত। একইসাথে যেটা সব জায়গায়, আবার কোথাও না। একইসাথে অসীম (infinity) ও শূন্য (nothing)। এসব কারণে ভারতীয় সমাজে ভয়েড (শূন্যতা) ও ইনফিনিটির জগতে বিচরণ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই শূন্যকে তারা গ্রহণ করল।

## শূন্যের পুনর্জন্ম

*দেবতাদের একদম সূচনাকালে অস্তিত্বের জন্ম হয় অনস্তিত্ব থেকে।*

-ঋগ্বেদ

ভারতীয় গণিতবিদরা শূন্যকে গ্রহণ করেই বসে থাকলেন না। তারা এর ভূমিকাও পাল্টে দিলেন। স্থান-নির্দেশক (placeholder) থেকে সংখ্যায় রূপান্তর করলেন। এই পুনর্জন্মই শূন্যের শক্তির উৎস।

ভারতীয় গণিতের উৎস সময়ের চাদরে ঢাকা। ৪৭৬ সালে রোমের পতনের বছরে লেখা একটি ভারতীয় বইয়ে গ্রিক, মিশরীয় ও গণিতের প্রভাবের কথা জানা যায়। যে প্রভাবের সূচনা অ্যালেকজান্ডার। মিশরীয়দের মতো ভারতীয়রা দড়ি দিয়ে জমির হিসাব ও মন্দিরের নকশা করত। তাদের ছিল জ্যোতির্বিদ্যারও অভিনব কৌশল। গ্রিকদের মতোই তাঁরা সূর্যের দূরত্ব বের করার চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রয়োজন ত্রিকোণমিতি। ভারতীয় সংস্করণ সম্ভবত গ্রিকদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি থেকে ধার করা।

পঞ্চম শতকের কোনো এক সময়ে ভারতীয় গণিতবিদরা সংখ্যা লেখার পদ্ধতি পাল্টে ফেলেন। গ্রিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে তাঁরা ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তবুও ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ভারতীয় সংখ্যা হলো দশ-ভিত্তিক। ব্যাবিলনীয়রা লিখত ষাট-ভিত্তিক সংখ্যা। আমরা এখন যেসব সংখ্যা লিখি (0, 1, ..., 9 দিয়ে) এগুলোর বিকাশ ঘটেছে ভারতীয়দের ব্যবহৃত চিহ্ন থেকে। এদেরকে আরবি সংখ্যা না বলে ভারতীয় সংখ্যা বলাই যথার্থ হত।

কেউ জানে না, কখন ভারতীয়রা ব্যাবিলনীয়দের মতো স্থানীয়-মান ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করে।<sup>২</sup> হিন্দু সংখ্যার সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় এক সিরিয় বিশপের লেখায়। ৬৬২ সালের তাঁর লেখায় দেখা যায়, কীভাবে ভারতীয় 'নয়টি চিহ্নের সাহায্যে' হিসাবনিকাশ করত। নয়টি, দশটি নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শূন্যই এখানে অনুপস্থিত। তবে নিশ্চিত করে তা বলা যাবে না। বিশপের এই লেখার আগেই হিন্দু সংখ্যার প্রচলন ছিল। ঐ সময়ের



আগেই ভারতীয়রা শূন্যকে বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করেছে তা প্রমাণিত। বিশপ হয়ত তা জানতেন না। দশ-ভিত্তিক সংখ্যায় প্লেস হোল্ডার হিসেবে চিহ্নের মাধ্যমে শূন্যের ব্যবহার নবম শতকের আগেই হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ততদিনে ভারতীয় গণিতবিদরা বিশাল মাইলফলক অর্জন করে ফেলেছেন।

গ্রিক জ্যামিতির সামান্য অংশই তারা ধার করেছিলেন। গ্রিকরা সমতল আকৃতিগুলোকে ভালবাসত। কিন্তু ভারতীয়দের এসবে আগ্রহ ছিল ছিল না। বর্গের কর্ণ মূলদ নাকি অমূলদ সংখ্যা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। আর্কিমিডিসের মতো কনিক বা কোণের বিভাজন নিয়েও ভাবেনি। তবে সংখ্যা নিয়ে খেলতে শিখে গিয়েছিল তারা।

সংখ্যার ভারতীয় পদ্ধতি তাদের হাতে দারুণ সব অস্ত্র তুলে দেয়। অ্যাবাকাসের ব্যবহার ছাড়াই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সংখ্যা পদ্ধতির সুবাদে তারা বড় বড় সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতেন অবলীলায়। অনেকটা আমরা এখন যেমন পারি। একটু শিখে নিলেই যে কেউ ভারতীয় সংখ্যার সাহায্যে অ্যাবাকাসের চেয়ে দ্রুত গুণ করতে পারতেন। অ্যাবাকাসবাদী ও ভারতীয় সংখ্যা ব্যবহারকারী অ্যালগোরিস্টদের মধ্যে হত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর দিন শেষে জিতত অ্যালগোরিস্টরাই।

### চিত্র ১৪: সংখ্যার বিবর্তন

ভারতীয় সংখ্যা যোগ ও গুণের মতো দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যকর হলেও এদের মূল অবদান ছিল আরও অনেক বড়। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা জ্যামিতি থেকে আলাদা হলো। সংখ্যার কাজ আর নিছক বস্তুর পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। গ্রিকদের মতো করে ভারতীয়রা বর্গ সংখ্যার মধ্যে বর্গচিত্র কল্পনা করেনি। অথবা দেখেনি দুই সংখ্যার গুণের মধ্যে আয়তক্ষেত্রকে। তারা বরং দেখেছে দুই সংখ্যার খেলা। যে সংখ্যারা জ্যামিতিক গুরুত্ব থেকে মুক্ত। আমরা এখন যাকে অ্যালজেব্রা বা বীজগণিত বলি তার জন্ম এখানেই। এ ধরনের চিন্তার কারণে অবশ্য ভারতীয়রা জ্যামিতিতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। তবে এর ছিল আরেকটি অপ্রত্যাশিত প্রভাব। এর ফলে ভারতীয়রা গ্রিকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হন। জিরোকে প্রত্যাখ্যান করে যে সীমাবদ্ধতায় জড়িয়ে পড়েছিল গ্রিকরা।

### চিত্র ১৫: অ্যালগোরিস্ট বনাম অ্যাবাকাসবাদী

ফলে সংখ্যারা জ্যামিতিক তাৎপর্য থেকে মুক্তি পেল। এবার আর যোগ-বিয়োগকে জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে না। দুই একর জমি থেকে কেটে তিন একর নেওয়া যাবে না। কিন্তু দুই থেকে তিনকে বিয়োগ করতে তো কোনো বাধা নেই। এখনকার দিনে আমরা জানি:  $২ - ৩ = - ১$  বা মাইনাস ১। তবে প্রাচীনকালে এ ভাবনা এত সহজ ছিল না। তারা বহু সমীকরণ সমাধান করেছেন। তবে ঋণাত্মক সমাধান পেলেই ভাবতেন এই সমাধানের কোনো বাস্তব অর্থ নেই। সহজ কথা: জ্যামিতিকভাবে চিন্তা করলে ঋণাত্মক ক্ষেত্রফলের কী-ইবা অর্থ হতে পারে! গ্রিকদের কাছে তাই এটা ছিল অর্থহীন। ভারতীয়দের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যাপক সমাদর পেল। আসলে ভারত ও চীনেই ঋণাত্মক সংখ্যার আবির্ভাব। সপ্তম শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত এক সংখ্যাকে আরেক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার নিয়ম বানিয়েছিলেন। নিয়মের গাণ্ডির মধ্যে ছিল ঋণাত্মক সংখ্যারও। তিনি লেখেন, "ধনাত্মককে ধনাত্মক বা ঋণাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ধনাত্মক আসে। ধনাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মককে ধনাত্মক দিয়ে ভাগ করলেও তাই।" এসব নিয়ম আমরা আজকাল সহজেই জানি। দুই সংখ্যাকে ভাগ দিলে ধনাত্মক হবে, যদি তাদের চিহ্ন একই হয়।

$২ - ৩$  যেমন একটি সংখ্যা, তেমনি  $২ - ২$  আরেকটি সংখ্যা। এটা হলো শূন্য। অ্যাবাকাসের শূন্যতার প্রতিনিধি হিসেবে শুধুই স্থান দখলকারী প্লেসহোল্ডার নয়। বরং সংখ্যা হিসেবে শূন্য। শুধু অবস্থান নয়, এর আছে নির্দিষ্ট মান। আছে সংখ্যারেখায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা। শূন্য সমান  $২ - ২$  বলে একে  $(২ - ১)$  ও  $(২ - ৩)$  এর মাঝে স্থান দিতে হবে। মানে ১

ও (-১) এর মাঝে। আর কোনো জায়গা নেই। শূন্যকে ৯-এর পরে বসানোর সুযোগ নেই। যদিও কম্পিউটার কিবোর্ডে তা করা হয়। সংখ্যারেখায় শূন্যের আছে নিজস্ব স্থান, যা তার একান্তই নিজের। দুইকে বাদ দিয়ে যেমন সংখ্যারেখা হয় না, তেমনি হয় না শূন্যকে বাদ দিয়েও। শেষ পর্যন্ত শূন্যের আগমন ঘটেছে।

তবে ভারতীয়রাও শূন্যকে খুব অদ্ভুত সংখ্যা মনে করত। কারণও আছে। শূন্যকে যেকোনো কিছু দিয়ে গুণ করলে শূন্য আসে। যেন এটি সবাইকে শোষণ করে নেয়। আর শূন্যকে দিয়ে ভাগ করতে গেলে যেন নরক গুলজার! ব্রহ্মগুপ্ত  $0 \div 0$  ও  $1 \div 0$  এর মান বের করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি লেখেন, "সাইফারকে (শূন্য) সাইফার দিয়ে ভাগ দিলে কিছুই থাকে না।" মানে তিনি মনে করতেন শূন্যকে নিজেকে দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য থাকে। তাঁর চিন্তা ভুল ছিল, যা আমরা পরে দেখব।  $1 \div 0$  কে তিনি কী ভাবতেন তা জানা নেই। কারণ তাঁর কিছু কথা অস্পষ্ট। আসলে তিনি হাত দোলাচ্ছিলেন আর আশা করছিলেন সমস্যা কেটে যাবে।

এ ভুল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভারতীয়রা বুঝলেন  $1 \div 0$  হলো অসীম। দ্বাদশ শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর লেখেন, "যে ভগ্নাংশের হর সাইফার, তা এক অসীম রাশি।" এর সাথে কিছু যোগ করলে কী হবে তাও বলেন তিনি, "বহু কিছু যোগ বা বিয়োগ করলেও এতে কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক যেভাবে অসীম ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর বদলান না।"

ঈশ্বরকে পাওয়া গেল অসীমের মধ্যে। এবং শূন্যের মধ্যে।

## আরবি সংখ্যা

মানুষ কি ভুলে গেছে, আমি তাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছি?

- পবিত্র কুরআন

সপ্তম শতকে রোমের পতনের সাথে সাথে পশ্চিমও প্রভাব হারাল। তবে প্রাচ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছিল। প্রাচ্যের আরেকটি সভ্যতা ভারতকে ছাড়িয়ে গেল। পশ্চিমের তারা ডুবতে ডুবতে আরেকটি তারার উদয় ঘটল। সেটা ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শূন্যকে ভারত থেকে নিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমও ইসলাম থেকে শূন্যকে নিয়েছিল। তবে শূন্যের রাজত্ব শুরু হয়েছিল প্রাচ্যে।

৬১০ সালের এক সন্ধ্যা। চল্লিশ বছর বয়সী মুহাম্মাদ (সা) হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে, জিবরাইল (আ) এসে বললেন, "পড়ুন।" মুহাম্মাদ (সা) পড়লেন। এরপর তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। ৬৩২ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। এর এক দশকের মধ্যেই তাঁর অনুসারীরা মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য অধিকার করে। ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের পবিত্র শহর জেরুজালেমের পতন হয়। ৭০০ সালের মধ্যে ইসলাম পূর্বের সিন্ধু নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পশ্চিমে পৌঁছে আলজিয়ার্স পর্যন্ত। ৭১১ সালে মুসলমানরা স্পেন দখল করে। পৌঁছে যায় ফ্রান্স পর্যন্ত। ওদিকে প্রাচ্যে ৭৫১ সালে চীনারা পরাজিত হয়। তাদের সাম্রাজ্যে সীমানা এত বড় হয় যা খোদ আলেকজান্ডারের কাছেও অকল্পনীয় মনে হবে। চীন যাওয়ার পথে পদানত হয় ভারত। আর এখানেই আরবরা ভারতীয় সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

মুসলমানরা অল্প দিনের মধ্যেই বিজিত এলাকার মানুষের জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে ফেলত। পণ্ডিতরা বইপত্র আরবিতে অনুবাদ করতে লাগলেন। নবম শতকে খলিফা মামুন বাগদাদে দারুল হিকমাহ বা জ্ঞানের ঘর নামে সুবিশাল এক লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। এটা প্রাচ্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল

খাওয়ারিজমি।

খাওয়ারিজমি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। এর মধ্যে আছে *আল জাবর ওয়াল মুকাবাল*। সাধারণ সমীকরণগুলোর সমাধান করার উপায় বলা আছে এখানে। *আজ জাবর* অর্থ *সম্পূর্ণ করা*। এখান থেকেই আমরা অ্যালজেবরা বা বীজগণিত শব্দটা পেয়েছি। হিন্দু সংখ্যাপদ্ধতি নিয়েও তিনি একটি বই লেখেন। এর ফলে আরব বিশ্বের মাধ্যমে সংখ্যার এ নতুন শৈলী ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ছড়িয়ে পড়ল হিন্দু সংখ্যাকে দ্রুত গুণ ও ভাগ করার নিয়মও (অ্যালগোরিদম)। আসলে অ্যালগোরিদম শব্দটা আল খোয়ারিজমির নাম থেকেই এসেছে। সংখ্যার প্রতীকগুলো আরবরা ভারত থেকে নিলেও বাকি বিশ্ব এদেরকে আরবি সংখ্যা নাম দিয়ে দিল।

জিরো শব্দটার মধ্যেই আছে হিন্দু ও আরবি ছোঁয়া। হিন্দু-আরবি সংখ্যা গ্রহণ করার সময় আরবরা শূন্যকেও গ্রহণ করে নেয়। জিরোর ভারতীয় নাম *শূন্য* বা *শূন্য*। যার অর্থ ফাঁকা। আরবরা একে বললেন *সিফর*। পশ্চিমের পণ্ডিতরা সহকর্মীদের কাছে একে পরিচিত করতে গিয়ে একে ল্যাটিন রূপ দান করলেন। ফলে *সিফর* হলো *জেফিরুস*। *জিরো* (*zero*) শব্দটার মূল এই *জেফিরুস*-ই। পাশ্চাত্যের অন্য গণিতবিদরা শব্দটাকে এতটা বদলাননি। এরা জিরোকে বলতেন *সিফরা*। এটাই পরে হলো সাইফার (*cipher*)। সংখ্যার নতুন গুচ্ছে জিরো এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল যে মানুষ সব সংখ্যাকেই সাইফার বলা শুরু করল। এ থেকে আসে ফরাসি শব্দ *শিফ্রে* বা *ডিজিট* (অঙ্ক)।

তবে খাওয়ারিজমির হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে লেখালেখির বহু পরে পশ্চিমারা শূন্যকে গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি মুসলিম বিশ্ব প্রাচ্যের ঐতিহ্য লালন করলেও এরিস্টটলের শিক্ষা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। এর কারণ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিজয়গুলো। ওদিকে ভারতীয় গণিতবিদরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন, শূন্য হলো ভয়েড বা শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ। ফলে মুসলমানরা শূন্যকে গ্রহণ করলে এরিস্টটলকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁরা সেটাই করলেন।

মুসা মায়মনিডিজ বারো শতকের একজন ইহুদি পণ্ডিত। তিনি আতঙ্কের সাথে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের কথা লেখেন। তিনি দেখেন, মুসলমানরা এরিস্টটলের স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বাদ দিয়ে পরমাণুবাদীদের শরণাপন্ন হলেন। আগে থেকেই এরিস্টটলপন্থীদের সাথে পরমাণুবাদীদের বিরোধ। প্রতিকূল অবস্থায়ও তাদের মতবাদ হারিয়ে যায়নি। তাদের কথা হলো, পরমাণু নামের স্বতন্ত্র কণা দিয়ে বস্তু গঠিত। এই কণারা চলাচল করতে পারলে এদের মধ্যে থাকবে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান। আর তা নাহলে পরমাণুরা একে অপরের সাথে ধাক্কা খেতে থাকবে। অন্য কণার গতিপথ থেকে সরতে পারবে না।

### আমি যা তাই: শূন্য

*শূন্যতাই প্রাণ আর প্রাণই শূন্যতা... আমাদের সীমাবদ্ধ মন তা উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ এটি অসীমের সাথে যুক্ত।*

- আজরিয়েল

শূন্য হয়ে গেল নতুন শিক্ষা, এরিস্টটলের প্রত্যাখ্যান এবং ভয়েড ও ইনফিনিটিকে গ্রহণ করে নেওয়ার প্রতীক। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে মুসলমান-শাসিত অঞ্চলে শূন্য ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র এর সংঘর্ষ হলো এরিস্টটলের মতবাদের সাথে। মুসলমান পণ্ডিতরাও ছেড়ে কথা বললেন না। এগারো শতকের মুসলিম দার্শনিক আবু হামিদ আল গাযালি তো ঘোষণাই দিলেন, এরিস্টটলীয় মতবাদ লালন করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। এরপরেই বিতর্কের অবসান হলো।

শূন্য নিয়ে এ বিতর্কে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রাচ্য থেকে আসা ইসলাম একটি সেমেটিক<sup>৩</sup> ধর্ম। মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ভয়েড বা শূন্য থেকে। ওদিকে ভয়েড ও ইনফিনিটির প্রতি এরিস্টটলের রয়েছে সীমাহীন

ঘৃণা। ফলে এরিস্টটলের মতবাদ যেখানেই থাকবে, সেখানে শূন্য থেকে সৃষ্টির মতবাদ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আরব ভূমিতে শূন্য ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানরা একে সাদরে গ্রহণ করল। আর ছুড়ে ফেলে দিল এরিস্টটলকে। এ দলে পরে যোগ দিল ইহুদিরা।

হাজার বছর ধরে ইহুদিদের জীবনযাত্রার কেন্দ্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য। দশম শতকে স্পেন তাদের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল। খলিদা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ছিল এক ইহুদি মন্ত্রী। তিনি ব্যাবিলন থেকে বহু বুদ্ধিজীবিকে নিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক ইহুদি জনগোষ্ঠী বেড়ে উঠল স্পেনে।

স্পেন ও ব্যাবিলন দুই জায়গাতেই মধ্যযুগের শুরুর দিকের ইহুদিরা এরিস্টটলের মতবাদ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। খ্রিষ্টানদের মতোই তারাও অসীম ও ভয়েডকে মেনে নেননি। তবে ইসলামী শিক্ষার মতোই ইহুদি ধর্মতত্ত্বের সাথেও এরিস্টটলের দর্শনের বিরোধ ছিল। এ কারণেই বারো শতকের ইহুদি রাব্বি বিশাল এক পুস্তক রচনা করেন। উদ্দেশ্য হলো প্রাচ্যের সেমেটিক বাইবেলের সাথে পাশ্চাত্যের গ্রিক দর্শনের বিরোধ দূর করা।

মায়মনিডিজ শূন্যকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ শেখেন এরিস্টটলের কাছ থেকে। গ্রিক যুক্তিকে তিনি এবার নতুন রূপ দান করলেন। পৃথিবীর চারপাশের ফাঁপা গোলকদের কিছু একটা নাড়াচ্ছে। হয়তো বা পরের গোলকটি তা করছে। তাহলে পরের গোলককে কে নাড়াচ্ছে? অবশ্যই তার পরের গোলক। কিন্তু অসীম গোলক তো থাকা সম্ভব নয়, কারণ অসীম অসম্ভব। তার মানে সর্বশেষ গোলক কেউ একজন নাড়াচ্ছে। এটাই হলো পরম চালক ঈশ্বর।

মায়মনিডিজের যুক্তি আসলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। ধর্মতত্ত্বে এটি অনেক মূল্যবান। তবে একইসাথে বাইবেল ও অন্যান্য সেমেটিক সংস্কৃতিতে অসীম ও ভয়েডের প্রচুর উদাহরণ আছে। মুসলমানরা এর মধ্যেই সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ৮০০ বছর আগের সেন্ট অগাস্টিনের মতো মায়মনিডিজও সেমেটিক বাইবেলকে নতুন রূপ দিয়ে গ্রিক মতবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। যে মতবাদ কোনো কারণ ছাড়াই ভয়েডকে ভয় পায়। প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা গ্রিকদের মতবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টকে রূপক বলতেন। তবে মায়মনিডিজ নিজের ধর্মকে পুরোপুরি গ্রিক আদলে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ধর্মীয় ঐতিহ্যগত কারণে তিনি বাইবেলের শূন্য থেকে সৃষ্টির বিবরণ মেনে নিতে বাধ্য। আর এর সহজ অর্থ হলো এরিস্টটলের বিপক্ষে যাওয়া।

এরিস্টটল বলেছিলেন, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সবসময় ছিল। মায়মনিডিজ বললেন, এ যুক্তির প্রমাণে ভুল আছে। ধর্মগ্রন্থের সাথেই তো বিরোধ এর! ফলে এরিস্টটলের মতবাদকে বিদায় নিতেই হবে। মায়মনিডিজ বললেন, সৃষ্টির সূচনা হয়েছে শূন্য থেকে। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত কথা হলো *ক্রিয়েশিও এক্স নিহিলো*। যার অর্থ বস্তুর সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল কাজের ফল। এরিস্টটল যতই ভ্যাকুয়ামকে নিষিদ্ধ করে গিয়ে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এর মাধ্যমে ভয়েড বা শূন্যতা অধর্ম থেকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত হল।

ইহুদিদের জন্য মায়মনিডিজের পরবর্তী সময়টা হলো শূন্যের যুগ। তেরো শতকে নতুন আরেক মতবাদের প্রসার হলো। এর নাম কাবালিজম বা ইহুদি মরমিবাদ। কাবালীয় চিন্তার কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হলো গামেত্রিয়া। ব্যাপারটা হলো বাইবেলের লেখার মধ্যে সাক্ষাতিক বার্তা অনুসন্ধান। গ্রিকদের মতো হিব্রু জাতির লোকেরাও বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করত। অতএব সব শব্দের আছে সাংখ্যিক মান। এর মাধ্যমে শব্দের লুকানো অর্থ বোঝা যেত। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের (Gulf war) অংশগ্রহণকারীরা জানত সাদ্দাম শব্দের মান: সামেক (৬০) + আলেফ (১) + দালেদ (৪) + আলেফ (১) + মেম (৬০০)। মোট ৬৬৬। যে সংখ্যাকে খ্রিষ্টানরা অশুভ প্রাণীর সংখ্যা মনে করে। যে প্রাণী মহাপ্রলয়ের সময় আবির্ভূত হবে। সাদ্দাম শব্দে একটা নাকি দুটি দালেদ অক্ষর হবে তা নিয়ে কাবালীদের চিন্তা নেই। যোগফল মিলিয়ে দিতে তারা শব্দের বানান এদিক-সেদিক করে নেয়। কাবালীয়দের বিশ্বাস, একই মানের শব্দ ও শব্দগুচ্ছের মধ্যে

আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে। যেমন বাইবেলের জেনেসিস বা আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১০ নং অনুচ্ছেদ বলছে, "রাজদণ্ড জুড়াহর কাছ থেকে সরবে না, ... যতদিন না শিলহ আসে।" হিব্রু ভাষায় "যতদিন না শিলহ আসে" কথাটার মান ৩৫৮। হিব্রুতে মাসায়াহ বা মসীহ শব্দের মানও একই। অতএব এ অনুচ্ছেদ মসীহর আগমনের পূর্বাভাস দিচ্ছে। কিছু সংখ্যাকে পবিত্র বা শুভ মনে করা হত। কাবালীয়রা বাইবেলে খুঁজত এসব সংখ্যা। অনুসন্ধান করে দেখত কোনো গুপ্ত বার্তা পাওয়া যায় কিনা। সাম্প্রতিক বেস্টসেলার বই *দ্য বাইবেল কোড* এ পদ্ধতিতে পূর্বাভাস দেখাতে চেয়েছে।

কাবালাহ জিনিসটা নিছক সংখ্যার খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ছিল প্রকট। যে কারণে অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এর সাথে হিন্দু ধর্মের দারুণ মিল রয়েছে। এই যেমন কাবালাহ মতবাদে ঈশ্বরের দ্বৈত প্রকৃতির ধারণার ব্যবহার আছে। হিব্রু কথা *আইন সফ* অর্থ অসীম। এটা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির দিক বোঝানো হয়। ঈশ্বরের যে দিক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মহাবিশ্বের প্রতিটি আনাচে-কানাচে রয়েছে যার প্রভাব। একইসাথে এর আছে আরেকটি নাম: *আইন* (ayin) বা শূন্যতা। অসীম ও ভয়েড একাকার। দুটিই ঈশ্বরের অংশ। আরও চমকপ্রদ ব্যাপার আছে। আইন শব্দের অক্ষরগুলোকে ঘুরিয়ে লিখলে (অ্যানাগ্রাম) হয় আনই (aniy)। হিব্রুতে যার অর্থ "আমি"। এর চেয়ে সহজ করে আর কীভাবে বার্তা দেওয়া যায়: 'আমি কিছুই না,' আবার 'আমি অসীম'।

একদিকে ইহুদিরা প্রাচ্যের বাইবেলের জন্য পশ্চিমী আবেগকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ওদিকে একই লড়াই চলছে খৃষ্টান সমাজে। একদিকে তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে। নবম শতকে শার্লোমেনের শাসনামলে লড়াই হয়েছে। ক্রুসেড হয়েছে এগারো, বারো ও তেরো শতকে। তবে এসব লড়াইয়ের সময় যোদ্ধা, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও বণিকরা ইসলামী ধারণাগুলোও পশ্চিমে নিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা দেখল আরবদের নক্ষত্রের উন্নতি মাপার যন্ত্র অ্যাস্ট্রোলেইব। আরবদের উদ্ভাবিত এ যন্ত্র সন্ধ্যায় সময়ের হিসাব রাখতে দারুণ কাজে আসে। ফলে সময়মত নামাজ পড়া যায়। যন্ত্রটিতে বেশিরভাগ সময় আরবি সংখ্যা লেখা হত।

নতুন সংখ্যা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। যদিও দশম শতকের পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার এগুলো দেখে মুগ্ধ হন। সম্ভবত এক ভ্রমণে স্পেন গিয়ে তিনি সংখ্যাগুলো দেখেন। ইতালিতে ফিরে আসার সময় নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। তবে তার এ সংস্করণে শূন্য ছিল না। থাকলে সেটা আরও কম জনপ্রিয়তা পেত। গির্জায় তখনও এরিস্টটলের তীব্র প্রভাব। গির্জার সেরা চিন্তাবিদরা তখনও অসীম পরিমাণ বড় বা ছোট বস্তু ও ভয়েডকে মেনে নেননি। তেরো শতকে অবশ্য ক্রুসেডাররা এ ধারণাগুলোর কাছাকাছি গিয়েছিল। তবুও সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস ঘোষণা দেন, ঈশ্বর কোনো পণ্ডিত ঘোড়া যেমন বানাবেন না, তেমনি অসীম আকারের বড় কিছুও বানাবেন না। কিন্তু এরই আবার অর্থ দাঁড়ায়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন। খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে সেও এক নিষিদ্ধ চিন্তা।

১২৭৭ সালে ফ্রান্সের বিশপ এটিয়ে টেম্পিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক সভা ডাকেন। উদ্দেশ্য এরিস্টটলীয় মতবাদের আলোচনা। আরও সঠিক করে বললে এ মতবাদের প্রতি আক্রমণ। ঈশ্বরের সর্বশক্তির গুণের বিপরীত অনেকগুলো এরিস্টটলীয় বক্তব্য টেম্পিয়ে বাতিল করেন। এমন একটি কথা হলো, "ঈশ্বর আকাশকে সরলরেখা বরাবর সরাসরে পারবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে পেছনে একটি ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে।" (ঘূর্ণায়মান গোলকের এ অসুবিধা নেই, কারণ ঘুরলেও গোলক একই স্থান দখল করে থাকে। গোলককে নাড়িয়ে আকাশের নতুন স্থানে নিয়ে গেলে আগের জায়গায় কিছু থাকবে না। শুধু সেক্ষেত্রেই ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে।) আসলে ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম তৈরি করতে পারেন। ফলে হঠাৎ করেই ভয়েড নিয়ে আলোচনার দুয়ার খুলে গেল। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এরিস্টটলের বানানো নিয়ম বাধ্য নন।

টেম্পিয়ের ঘোষণাতেই এরিস্টটলের দর্শনের মৃত্যু হয়নি—ঠিক। তবে নিশ্চিতভাবেই সেটা ছিল উত্তর গগনে কালো মেঘ। আরও কয়েক শ বছর গির্জা এরিস্টটলের মতবাদ আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তবে এরিস্টটলের পতন এবং ভয়েড ও ইনফিনিটির উত্থান শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যে শূন্যের আগমনের জন্য এর চেয়ে অনুকূল পরিবেশ আর হয় না। বারো

শতকের মাঝামাঝির সময়ের কথা। আল-খওয়ারিজমির *আলজাবর* বইয়ের প্রথম রূপান্তরগুলো স্পেন ও ইংল্যান্ড হয়ে ইউরোপের বাকি অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল। শূন্য আগেই রওয়ানা দিয়েছিল। গির্জা এরিস্টটলের শিকল ভেঙে দিতে দিতে শূন্য এসে পৌঁছে গেল।

### শূন্যের বিজয়

... শূন্য একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। আমরা একে সরল ভাবি, কারণ এর আসল গুণ আমরা খেয়াল করি না। তবে হিসাব-নিকাশের মধ্যে ক্ষেত্রে এই সহজ-সরল গুণটির কারণেই প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গণিত সেরাদের কাতারে স্থান পেয়েছিল।

-পিয়েরে সিমোঁ লাপ্লাস

খৃষ্টানরা শুরুতে শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে বাণিজ্যিক কারণে অল্পদিনের মধ্যেই এর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পিসার লিওনার্দো শূন্যকে পুনরায় পশ্চিমে নিয়ে আসেন। ইতালীয় বণিকের এই ছেলোটি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করেছিলেন। লিওনার্দো না বলে ফিবোনাচি বললে মানুষ তাঁকে সহজে চেনে। তিনি মুসলমানদের কাছে গণিত শেখেন। অল্পদিনের মাথায় নিজেই ভালো গণিতবিদ হয়ে ওঠেন।

তাঁর *লিভের আবাসি* বইয়ের একটি ছোট ও সামান্য গাণিতিক সমস্যার জন্যই তিনি সবচেয়ে পরিচিতি পান। বইটি ১২০২ সালে প্রকাশিত হয়। ধরুন একজন কৃষকের এক জোড়া বাচ্চা খরগোশ আছে। বয়স্ক হতে বাচ্চা খরগোশের দুই মাস সময় লাগে। এরপর থেকে তারা প্রতি মাসে এক জোড়া করে বাচ্চা জন্ম দিতে থাকে। বাচ্চারাও বয়স্ক হলে আবার বাচ্চা দিতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্দিষ্ট একটি মাসে কয় জোড়া খরগোশ দেখা যাবে?

দেখা যাক। প্রথম মাসে থাকবে এক জোড়া খরগোশ। বয়স্ক না হওয়ায় এরা সন্তান জন্ম দেবে না।

দ্বিতীয় মাসেও এক জোড়াই থাকবে।

তৃতীয় মাসে খরগোশের জোড়াটি সন্তান উৎপাদন করেছে। এখন খরগোশ আছে দুই জোড়া।

চতুর্থ মাসের শুরুতে প্রথম জোড়াটি আবার সন্তান জন্ম দিয়েছে। তবে দ্বিতীয় জোড়া এখনও বয়স্ক হয়নি। ফলে এখন খরগোশ আছে তিন জোড়া।

পরের মাসে প্রথম জোড়াটি আবারও এক জোড়া খরগোশ উপহার দিয়েছে। দ্বিতীয় জোড়াও বয়স্ক হয়ে সন্তান পেয়ে গেছে। তবে তৃতীয় জোড়া এখনও বয়স্ক হয়নি। তাহলে সবমিলিয়ে খরগোশ এখন পাঁচ জোড়া।

এভাবে চলতে থাকলে খরগোশের জোড়ার সংখ্যা বিভিন্ন মাসে এরকম হবে: ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ...। কোনো নির্দিষ্ট মাসের খরগোশের সংখ্যা পেতে হলে আগের সব মাসের খরগোশের সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে। গণিতবিদরা মুহূর্তেই এই ধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। যেকোনো সংখ্যা নিয়ে একে তার আগের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিন। যেমন  $৮/৫ = ১.৬$ ।  $১৩/৮ = ১.৬২৫$ ।  $২১/১৩ = ১.৬১৫৩৮...$ । অনুপাতগুলো একটি দারুণ সংখ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর নাম সোনালী অনুপাত (Golden ratio)। যার মান  $১.৬১৮০৩...$ ।

পিথাগোরাস খেয়াল করেছিলেন, প্রকৃতি সম্ভবত সোনালী অনুপাত দ্বারা চালিত হচ্ছে। ফিবোনাচি এর পেছনের নিয়ামক ধারাটি আবিষ্কার করলেন। শামুকের খোলসের আকার মেনে চলে এ ধারা। মেনে চলে আনারসের ডানাবতী ও বামাবতী খাঁজগুলো। এ কারণেই প্রকৃতির এ জিনিসগুলো সোনালী অনুপাতের কাছাকাছি যেতে থাকে।

এই ধারার জন্যই ফিবোনাচি সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। তবে তাঁর *লিভের আবাসি* পঞ্চখামারের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য বহন করে। ফিবোনাচি গণিত শিখেছিলেন মুসলমানদের কাছে। ফলে তিনি আরবি সংখ্যা সম্পর্কে জানতেন। জানতেন শূন্যের

কথাও। এই নতুন পদ্ধতি তিনি তাঁর *লিভের আবাসি* বইয়ে উল্লেখ করেন। ইউরোপ শেষ পর্যন্ত জানল শূন্যের কথা। বইয়ে তিনি জটিল হিসাব করার ক্ষেত্রে আরবি সংখ্যার চমৎকার দিকটি তুলে ধরেন। ইতালীয় বণিক ও ব্যাংকাররা দ্রুতই নতুন পদ্ধতিটার সুবিধা গ্রহণ করলেন। সাথে নিলেন শূন্যকেও।

আরবি সংখ্যা আসার আগে ব্যাংকের কাউন্টারের লোকেরা অ্যাবাকাস বা কাউন্টিং বোর্ড ব্যবহার করতেন। জার্মানরা কাউন্টিং বোর্ডকে বলত রেশেনব্যাংক। এজন্যই আমরা ঋণদাতাদের ব্যাংক বলি। সেসময় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল খুবই আদিম। ঋণের হিসাব রাখতে কাউন্টিং বোর্ডের পাশাপাশি ব্যবহার ছিল ট্যালী স্টিকের। স্টিকের এক পাশে অর্থের পরিমাণ লেখা হত। এরপর একে দুই ভাগ করা হত (চিত্র ১৬)। ঋণদাতাই রাখত দুই খণ্ডের বড় অংশটি। এর নাম স্টক। আর দাতাকে বলা হত স্টকহোল্ডার।<sup>৪</sup>

### চিত্র ১৬: ট্যালি স্টিক

আরবি সংখ্যা ইতালীয় বণিকদের মন জয় করে নেয়। ব্যাংকাররা কাউন্টিং বোর্ড থেকে মুক্তি পেলেন। ব্যবসায়ীরা এ সংখ্যার উপকার টের পেলেও স্থানীয় সরকার এদের দেখল ঘৃণার চোখে। ১২৯৯ সালে ফ্লোরেন্সে আরবি সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়। আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ ছিল আরবি সংখ্যাকে সহজেই পাল্টে ফেলা যায় ও ভুল সংখ্যা দেখানো যায়। (যেমন আরবি ০-কে কলমের খোঁচায় সহজেই ৬ বানিয়ে ফেলা যায়।) তবে শূন্য এবং অন্যান্য আরবি সংখ্যার সুবিধাটুকু অত সহজেই উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। ইতালীয় বণিকরা এগুলোর ব্যবহার ছাড়েননি। তারা এগুলো দিয়ে পাঠাতেন সাক্ষেতিক বার্তাও। আর এ কারণেই *সাইফার* (cipher) শব্দের অর্থ হয়েছে গুপ্ত সঙ্কেত।

শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চাপের কাছে নত হতে হয় সরকারকে। ইতালিতে আরবি প্রতীক অনুমোদন পায়। ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপজুড়ে। পৌঁছে গেল শূন্য। এবং ভয়েড। মুসলমান ও হিন্দুদের প্রভাবে এরিস্টটলের দুর্গ ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। চতুর্দশ শতকের শুরুতেই ইউরোপে এরিস্টটলীয় মতবাদের জাঁদরেল সমর্থকও এ মতবাদকে সন্দেহের চোখে দেখত। ক্যান্টারবেরির সে সময়ের পরবর্তী আর্চবিশপ থমাস ব্র্যাডওয়ার্ডিন এরিস্টটলীয় মতের পুরনো শত্রু পরমাণুবাদকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা চালান। একইসাথে তিনি এও ভাবেন, নিজের যুক্তিটি ঠিক আছে তো! কারণও আছে। তাঁর যুক্তির ভিত্তি ছিল জ্যামিতি। যার অসীমসংখ্যক বার বিভাজনযোগ্য রেখা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরমাণুবাদকে বাতিল করে দেয়। তবে এরিস্টটলের পরাজয় তখনও দূরে বাতিঘর।

### তথ্যনির্দেশ

- ১। এখানে উল্লেখিত তথ্য সব মতের মানুষের ধারণার সাথে মিলবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।
- ২। স্থানীয় মানের উদাহরণ: ১২ সংখ্যাটিতে দুটি অঙ্ক ১ ও ২। ২-এর স্থানীয় মান ১ ও ১-এর মান ১০। এভাবে ৪৩২-এর ক্ষেত্রে ২-এর ১, ৩-এর ১০ ও ৪-এর ১০০। স্থানীয় মান দিয়ে সব সংখ্যার মান বের করা যায়। যেমন  $৪৩২ = ৪ \times ১০০ + ৩ \times ১০ + ২ \times ১ = ৪০০ + ৩০ + ২ = ৪৩২$ ।
- ৩। ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মকে একসঙ্গে সেমেটিক ধর্ম বলে।
- ৪। স্টিকের ব্যবহার করতে ঝামেলার অন্ত ছিল না। ইংরেজ অর্থমন্ত্রণালয় ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এক ধরনের ট্যালি স্টিকে হিসাব রাখত। চার্লস ডিকেন্স প্রাচীন এ পদ্ধতির পরিণাম সম্পর্কে বলেন, “১৮৩৪ সালে দেখা যায়, অনেক স্টিক জমা হয়ে গেছে। প্রশ্ন দাঁড়াল, ক্ষয়ে যাওয়া, পোকায় খাওয়া ও পুরনো এসব স্টিককে কী করা হবে? এগুলো রাখা ছিল ওয়েস্টমিনিস্টারে। যেকোনো বুদ্ধিমান মানুষ বুঝবেন, এগুলোকে লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করাই সবচেয়ে সহজ হবে। পাশের পাড়ার কোনো গরিব মানুষকে তা দিয়ে দিলেই হলো। তবে এগুলো কোনো কাজেই আসেনি। সরকারি আইন বলছে, এগুলো ব্যবহারই করা যাবে না। তাই, নির্দেশ এল, এগুলোকে গোপনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শেষ পর্যন্ত

ইংল্যান্ডের সংসদের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের চুলায় এগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুরনো স্টিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন ধরে যায় দেয়াল ও ছাদে। সে আগুন চলে যায় হাউস অব কমন্স (নিম্নকক্ষ) পর্যন্ত। দুই হাউসই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুনঃনির্মাণের জন্য স্থপতি ডেকে আনা হয়। আর তার খরচ বর্তমানে বিশ লাখ পেরিয়ে গেছে।

## চতুর্থ অধ্যায় শূন্যের অসীম ঈশ্বর [শূন্যের ধর্মতত্ত্ব]

নতুন দর্শন সন্দেহ তৈরি করেছে  
আগুন নিভে গেছে  
হারিয়ে গেছে সূর্য ও পৃথিবী  
কেউ জানে না খুঁজবে কোথায়  
সব ভেঙে চুরমার  
সব যোগান, সব সম্পর্ক  
রাজপুত্র, প্রজা, বাবা, ছেলে হয়েছে বিস্মৃত

~ জন ডন, অ্যানাটমি অব দ্য ওয়াল্ড

শূন্য ও অসীম ছিল রেনেসাঁরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইউরোপ ধীরে ধীরে জেগে উঠল অন্ধকার থেকে। জেগে উঠল শূন্য ও অসীম। অন্য ভাষায় 'কিছুই না' ও 'সবকিছু'। গির্জার এরিস্টটলীয় ভিত্তি গুড়িয়ে গেল। পথ খুলল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের।

যাজকশ্রেণী বিপদটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। বড় বড় যাজকরা শূন্য ও অসীমের ভয়ানক ধারণা নিয়ে পরীক্ষা চালায়। যদিও গির্জার পছন্দের এ ধারণাগুলো ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মূলে কুঠারাঘাত। রেনেসাঁ যুগে আঁকা সব চিত্রকর্মের কেন্দ্রে থাকত শূন্য। আর বিশপ ঘোষণা করেছিলেন, মহাবিশ্ব অসীম। সীমানাবিহীন। কিন্তু শূন্য ও অসীমের প্রতি ভালবাসা স্থায়ী হতে পারল না।

গির্জা হুমকির মুখে পড়লে ফিরে গেল সেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনে। আবারও গ্রহণ করল বহু বছর ধরে সমর্থন দিয়ে আসা এরিস্টটলের মতবাদ। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে ততদিনে। শূন্য ততক্ষণে পাশ্চাত্যে আসন গেঁড়ে বসেছে। গির্জার আপত্তি আর কেউ কানে নিল না। শূন্যকে ছাড়তে রাজী নয় বিজ্ঞানসমাজ।

## খুলল রুদ্ধদ্বার

হে ঈশ্বর, কুয়োর জলে বন্দী হয়ে নিজেকে অসীম জগতের রাজা ভাবলে কি আমি খারাপ স্বপ্ন দেখছি?

--- উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, হ্যামলেট



রেনেসাঁর শুরুতে বোঝা যায়নি শূন্য যে গির্জার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। শূন্য ছিল নিছক একটি শৈল্পিক হাতিয়ার। একটি অসীম শূন্যতা, চিত্রশিল্পের মাধ্যমে যা প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

পনের শ শতকের আগের চিত্রশিল্প ও অঙ্কন ছিল প্রাণহীন। ছবিগুলো ছিল বিকৃত, দ্বিমাত্রিক ও বিশাল আকারে। ছোট ও বিশ্রী প্রাসাদ থেকে চ্যাপ্টা নাইটদের উঁকি মারতে দেখা যেত (চিত্র ১৭)। সেরা শিল্পীরাও বাস্তবধর্মী দৃশ্য আঁকতে পারতেন না। তারা শূন্যের শক্তির ব্যবহার জানতেন না।

### চিত্র ১৭: চ্যাপ্টা নাইট ও বিশ্রী প্রাসাদ

ইতালীয় স্থাপত্যবিদ ফিলিপো ব্রুনেলেশি প্রথম অসীম শূন্যের ব্যবহার দেখান। মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু (vanishing point) ব্যবহার করে তিনিই প্রথম একটি বাস্তবভিত্তিক ছবি আঁকেন।

মাত্রার ধারণা থেকে আমরা জানি, একটি বিন্দু একটি শূন্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে কাজ করি। আইসটাইন দেখান, জগতটা আসলে চতুর্মাত্রিক। এটা নিয়ে আমরা পরেও কথা বলব। আপনার দেয়াল ঘড়ি, কফির মগ কিংবা এ বইটি সবই ত্রিমাত্রিক জিনিস। এখন একটু কল্পনা করুন: একটি বিশাল হাত বইটিকে চাপা দিল। ত্রিমাত্রিকের বদলে বইটি এখন দ্বিমাত্রিক এক আয়ত। বইটির একটি মাত্রা (উচ্চতা) হারিয়ে গেছে। এর এখন শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। উচ্চতা নেই। এবার ধরুন সেই দৈত্যাকার হাত বইটিকে পাশ থেকে চাপা দিল। বইট এখন আর আয়তক্ষেত্রের মতো নেই। হয়ে গেছে লাইন বা রেখা। আরেকটি মাত্রা কম এখন। নেই প্রস্থ ও উচ্চতা। আছে শুধু দৈর্ঘ্য। এটা এখন একমাত্রিক বস্তু। এই মাত্রাটাকেও উধাও করে দেওয়া যাবে। লাইন বরাবর আবার চাপা দিলে লাইন হয়ে যাবে বিন্দু। এক অসীম শূন্যতা, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কিছুই নেই। বিন্দু আসলে শূন্যমাত্রিক বস্তু।

১৪২৫ সালে ব্রুনেলেশি বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন ভবন ব্যাপটিস্টেরির একটি চিত্রের কেন্দ্রে এমন একটি বিন্দু বসান। মিলিয়ে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত এ শূন্যমাত্রিক বস্তু ক্যানভাসের ওপর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ডট। এর মানে হলো পর্যবেক্ষক থেকে অসীম দূরের বস্তু (চিত্র ১৮)। চিত্রের দূরের দৃশ্যগুলো ক্রমেই এই বিন্দুর কাছাকাছি হয়। পর্যবেক্ষক থেকে দূরে গেলে হতে থাকে ছোট থেকে আরও ছোট। মানুষ, গাছ বা বিল্ডিং-- সবকিছুই যথেষ্ট দূরে গেলে হয়ে যায় শূন্যমাত্রিক বিন্দু। হারিয়ে যায় দৃষ্টির সীমানা থেকে। চিত্রের কেন্দ্রের শূন্য অসীম স্থানকে ধারণ করে।

আপাত বিরোধী এই বস্তুই ব্রুনেলেশির চিত্রকে জাদুর মতো পাল্টে দিল। চিত্রটা ব্যাপটিস্টেরি ত্রিমাত্রিক ভবনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলল। আসল বস্তুর সাথে যেন পার্থক্যই নেই। মজার ব্যাপার হলো ব্রুনেলেশি আয়নায় ভবনটিকে দেখে চিত্রের সাথে তুলনা করেন। প্রতিফলিত ছবির সাথে আঁকা চিত্র হুবহু মিলে গিয়েছিল। এই ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু দ্বিমাত্রিক অঙ্কনকে ত্রিমাত্রিক ভবনের নিখুঁত নকলে পরিণত করল।

### চিত্র ১৮: মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু

মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুতে শূন্য আর অসীমের সম্পর্ক কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। শূন্য দিয়ে গুণ সংখ্যারেখাকে ছোট করে বিন্দু বানিয়ে দেয়। একইভাবে ভ্যানিশিং পয়েন্ট মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাকে একটি ডটের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এ বিন্দুর নাম সিংগুলারিটি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্তীতে এ ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ঐ সময়ে গণিতবিদরা শূন্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিত্রশিল্পীদের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না। পনের শতকে তো আসলে

চিত্রশিল্পীরাই ছিলেন সৌখিন গণিতবিদ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অঙ্কনের দৃষ্টিকোণ (perspective) নিয়ে একটি সহায়িকা লিখেছিলেন। চিত্রশিল্প নিয়ে তাঁর আরেক বইয়ে আছে এক সতর্কবাণী, “গণিতবিদ ছাড়া কেউ আমার লেখা পড়বেন না।” এ গণিতবিদ-চিত্রশিল্পীরাই দৃষ্টিকোণ পদ্ধতিকে নিখুঁত করে তোলেন। অল্প দিনের মাথায় দেখা গেল, এরা যেকোনো বস্তুকে তিন মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। শিল্পীরা মুক্তি পেলেন সমতলের মতো চিত্রের হাত থেকে। শূন্য বদলে দিয়েছে শিল্পের জগতকে।।

আক্ষরিক অর্থেই শূন্য ক্রনেলেশির চিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। গির্জাও শূন্য এবং অসীম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখল। যদিও গির্জার মতবাদ তখনও এরিস্টটলের ওপর নির্ভরশীল। জার্মান কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা ক্রনেলেশির সমসাময়িক মানুষ। তিনি অসীমের ধারণা দেখেই ঘোষণা করেন, “টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি।”। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। গির্জা তখনও বুঝতে পারেনি, এ ধারণা কত বৈপ্লবিক হতে পারে।

মধ্যযুগীয় এরিস্টটলীয় মতবাদের একটি পুরনো ও শক্তিশালী কথা ছিল, “মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবী অনন্য ও বিশেষ একটি জিনিস, যার মতো নেই আর কিছু।” এ কথাটাও ভ্যাকুয়ামের নিষেধাজ্ঞার মতোই শক্তিশালী ছিল। এ কথা অনুসারে, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে শুধু পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ আছে। এরিস্টটল মনে করতেন, সব বস্তু তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পেতে চায়। পাথর বা মানুষের মতো ভারী জিনিসের স্থান ভূমি। বাতাসের মতো হালকার বস্তু থাকবে আকাশে। এ কথার ছিল নানান ফলাফল। এর অর্থ দড়ায়, গ্রহরা বায়ুর মতো হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি। আরেকটি অর্থ হলো আকাশের মানুষ ভূমিতে পড়ে যাবে। ফলে বাদামের মতো মহাবিশ্বের খোলসের ভেতরের কেন্দ্রেই শুধু প্রাণীরা বাস করতে পারবে। অন্য গ্রহে প্রাণ থাকার ভাবনা এক গোলকের দুই কেন্দ্র থাকার মতোই হাস্যকর।

টেম্পিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি করতে পারেন। টেম্পিয়ের জোর দিয়ে বললেন, ঈশ্বর এরিস্টটলের যেকোনো নিয়ম ভাঙতে পারেন। ঈশ্বর চাইলেই অন্য পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। হাজার হাজার অন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। সবগুলোতে থাকতে পারে প্রাণের অস্তিত্ব। এটা ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। এরিস্টটল কী বললেন তাতে কিছু যায়-আসে না।

নিকোলাস অব কিউসা তো আরও বেশি সাহসী। তিনি বললেন, ঈশ্বরে আসলে সেটাই করেছেন। তিনি বলেন, “অন্য তারার অঞ্চল আমাদের মতো একইরকম। আমাদের বিশ্বাস, এদের কোনোটাই প্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়নি।” আকাশে আছে অসীমসংখ্যক তারা। আকাশে জ্বলজ্বল করে গ্রহরা। চাঁদ ও সূর্য থেকে আসে আলো। আকাশের তারারা কেন আমাদের গ্রহ, চন্দ্র বা সূর্যের মতো হতে পারবে না? হয়তোবা তারা পৃথিবীকে উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখে, যেভাবে আমরা দেখি তাদেরকে।” নিকোলাস নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর আসলেই অসীমসংখ্যক অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে। নিকোলাসকে তবুও ধর্মদ্রোহী বলা হয়নি। নতুন ভাবনার প্রতিও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি গির্জা।

এবার কাজে নামলেন আরেক নিকোলাস। তিনি নিকোলাসের দর্শনকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের রূপ দিলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখালেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। ঘুরছে বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে।

সন্ন্যাসী ও চিকিৎসক কোপার্নিকাসের বাড়ি পোল্যান্ড। গণিত শিখেছিলেন জ্যোতিষবিদ্যার কাজ সহজ করার জন্য। যাতে করে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা আরও ভাল করা যায়। ফলে কাজ করতে হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে। আর তা করতে গিয়ে দেখলেন গ্রহদের গতিবিধির হিসাব রাখার গ্রিক নিয়ম অনেক অনেক জটিল। টলেমির ঘড়িসদৃশ আকাশ ছিল দারুণ নিখুঁত। যেখানে পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে। তবে এ মডেল ছিল মারাত্মক জটিল। বছরজুড়ে গ্রহরা আকাশে চলাচল করে। তবে মাঝেমাঝে থেমে যায়। চলতে থাকে পেছন দিকে।<sup>১</sup> গ্রহদের এই অদ্ভুত আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টলেমি নিয়ে আসেন

মন্দবৃত্তের (epicycle) ধারণা। বৃত্তের পরিধির ওপরে কেন্দ্রবিশিষ্ট অন্য ছোট বৃত্ত এরা। এদের মাধ্যমে গ্রহদের পেছনমুখী গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল (চিত্র ১৯)। //

কোপার্নিকাসের ভাবনার শক্তিশালী দিক ছিল এর সরলতা। কেন্দ্রে পৃথিবী ও এর চারপাশে মন্দবৃত্তে পরিপূর্ণ মহাবিশ্বের বদলে তিনি সূর্যকেই কেন্দ্রে কল্পনা করলেন। যার চারপাশে গ্রহরা ঘোরে সরল বৃত্তপথে। কক্ষপথে পৃথিবী কোনো গ্রহকে পেছনে ফেললে সে গ্রহ পেছনে চলছে বলে মনে হবে। মন্দবৃত্তের কোনো দরকার নেই। কোপার্নিকাসের চিন্তা বাস্তব উপাত্তের সাথে পুরোপুরি মেলেনি। কক্ষপথ আসলে বৃত্তাকার নয়। তবে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা ছিল সঠিক। টলেমির নমুনার চেয়ে তাঁর নমুনা ছিল অনেক সরল। পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে। *টেরা নন এস্ট সেন্ট্রা মুন্ডি*।

নিকোলাস অব কিউসা ও নিকোলাস কোপার্নিকাস এরিস্টটল ও টলেমির সীমাবদ্ধ মহাবিশ্বকে ভেঙে দিলেন। পৃথিবী সরে গেল মহাবিশ্বের কেন্দ্রের আরামদায়ক জায়গা থেকে। মহাবিশ্বকে ঘিরে নেই কোনো খোলস। মহাবিশ্ব বিস্তৃত অসীম অবধি। আছে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত জগত। সবগুলোতে হয়তো আছে রহস্যময় প্রাণী। কিন্তু অন্য সৌরজগতে প্রভাব রাখতে না পারলে রোম কীভাবে একমাত্র সঠিক গির্জার দাবিদার হবে? অন্য গ্রহে কি তবে অন্য পোপ আছে? ক্যাথলিক গির্জার জন্য অসুবিধাজনক এক অবস্থা। সে অসুবিধা আরও বড় হয়েছে নিজেদের ঘরের লোকদেরই চিন্তার পরিবর্তন শুরু হওয়ার কারণে।

১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস তাঁর সেরা কর্মটি প্রকাশ করেন মৃত্যুশয্যা়া শুয়ে। এর ঠিক পরপরই গির্জা নতুন চিন্তাগুলোকে দমন করা শুরু করে দিয়েছিল। নিজের *ডে রেভোউলশনিবাস* বইটা কোপার্নিকাস পোপ তৃতীয় পলের নামে উৎসর্গও করেছিলেন। তবে গির্জাও তখন আক্রান্ত। ফলে নতুন চিন্তা ও এরিস্টটলকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা আর সহ্য করা হলো না।

গির্জার ওপর আক্রমণ তীব্র হয় ১৫১৭ সালে। কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত এক জার্মান সন্ন্যাসী উইটানবার্গের গির্জার দরজায় এক গুচ্ছ আপত্তির তালিকা সাঁটিয়ে দেন। (লুথার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তাঁর বিশ্বাসের ঘরে আলো জ্বলেছিল শৌচাগারে বসা অবস্থায়। এই তত্ত্ব বিষয়ে লেখা একটি বইয়ের মন্তব্য এরকম, “মানসিক সংকীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য (অন্ত্রের সংকীর্ণতা) থেকে তিনি মুক্তি পান একইসাথে।” এভাবেই শুরু হয় সংস্কার-আন্দোলন। বুদ্ধিজীবীরা সকল দিকে পোপের কতৃত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। ১৫৩০-এর দশকে সহজে সিংহাসনে বসে যাওয়া নিশ্চিত করতে অষ্টম হেনরি পোপের কতৃত্বকে তুচ্ছত্যাগ করলেন। নিজেকেই ঘোষণা করেন ইংল্যান্ডের প্রধান যাজক।

#### চিত্র ১৯: মন্দবৃত্ত, পেছনমুখী গতি ও সৌরকেন্দ্রিক নমুনা

ক্যাথলিক গির্জাও পাল্টা আঘাত হানে। কয়েক শতক ধরে নিজেরাও বিভিন্ন দর্শন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল ঠিকই, তবে নিজেদের মধ্যে মতভেদের হুমকি দেখা দিলে তারা পুনরায় অর্থডক্স বা প্রচলিত ধারায় ফিরে গেল। গ্রহণ করে নিল প্রচলিত শিক্ষাকে। অগাস্টিন ও বোথিয়াসের মতো এরিস্টটলীয় দর্শনের পণ্ডিতদের দিকে ও এরিস্টটলের দেওয়া ঈশ্বরের প্রমাণের দিকে ঝুঁকে গেল। কার্ডিনাল ও যাজকদের জন্য প্রাচীন মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রাখা হলো না। শূন্য হলো ধর্মদ্রোহিতার প্রতীক। আবদ্ধ মহাবিশ্বকে মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হলো। ভয়েড ও ইনফিনিটিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এসব শিক্ষা প্রচারের জন্য বেশ কিছু গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ১৫৩০-এর দশকে সৃষ্ট এমন একটি অন্যতম গোষ্ঠীর নাম জেসুইট সম্প্রদায়। এ দলে ছিল সুপ্রশিক্ষিত একদল বুদ্ধিজীবী, যাদের কাজ প্রতিবাদী প্রোটেস্ট্যান্টদের আক্রমণ করা। ধর্মদ্রোহিতার সাথে লড়াই করার আরও অস্ত্রও ছিল গির্জা কাছে। স্প্যানিশ ইনকুইজিশন ১৫৪৩ সালে প্রোটেস্ট্যান্টদের পোড়ানো শুরু করে। যে বছর মারা গিয়েছিলেন কোপার্নিকাস। ঐ একই বছর পোপ তৃতীয় পল নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন। গির্জার এই প্রতি-সংস্কারের লক্ষ্য ছিল নতুন চিন্তা দমন করে পুরনো

মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বিশপ এন্টোয় টেম্পিয়ে ও কার্ডিনাল নিকোলাস অব কিউসা যে ধারণা তেরো শতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, একই ধারণার জন্য ষোলো শতকে তাদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারত।

হতভাগা জিওরডানো ব্রুনোর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল। ব্রুনো ছিলেন সাবেক ডমিনিকান যাজক। ১৫৮০-এর দশকে প্রকাশ করেন *অন্য দ্য ইনফাইনাইট ইউনিভার্স অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস* বই। এখানে তিনি নিকোলাস অব কিউসার মতো একই কথা বলেন। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। আমাদের মতো আছে আরও অসীম জগত। ১৬০০ সালে তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যালিলেও গ্যালিলেই কোপার্নিকাস মতবাদের বিখ্যাত অনুসারী। ১৬১৬ সালে গির্জা তাঁকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। একই বছর কোপার্নিকাসের *ডে রেভোউলশনিবাস* নিষিদ্ধের খাতায় যুক্ত হয়। এরিস্টটলকে আক্রমণ মানেই গির্জার ওপর আক্রমণ।

গির্জার প্রতি-সংস্কার নতুন দর্শনকে সহজে ধ্বংস করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে বরং এর শক্তি বাড়ল। এর পেছনে অবদান রেখেছেন কোপার্নিকাসের উত্তরসূরীরা। সতের শতকে এগিয়ে আসলে জ্যোতিষবিদ-সন্ধ্যাসী জোহানেস কেপলার। কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে পরিশুদ্ধ করলেন তিনি। টলেমির নমুনার তুলনায় এটা আগের চেয়েও নিখুঁত হলো। পৃথিবীসহ বিভিন্ন গ্রহ বৃত্তের বদলে উপবৃত্ত (ellipse) পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এর মাধ্যমে আকাশে গ্রহদের অবস্থাস্থ রকম নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা গেল। সূর্যকেন্দ্রিক নমুনাকে ভূকেন্দ্রিক নমুনার চেয়ে খারাপ বলার আর সুযোগ থাকল না। কেপলারের নমুনা টলেমির নমুনার চেয়ে সরল। আর অনেক বেশি নিখুঁত। গির্জার আপত্তি পায়ে দলে কেপলারের সূর্যকেন্দ্রিক নমুনা টিকে গেল। কারণ কেপলার সঠিক, আর এরিস্টটল ভুল।

পুরনো মতবাদের ভুলগুলো ঠিক করার চেষ্টা গির্জা করল বটে! তবে ততদিনে এরিস্টটল, ভূকেন্দ্রিক নমুনা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয়ে গেছে। দার্শনিকরা যেসব কথা হাজার বছর ধরে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন, তার সবগুলোকে প্রশ্নের মুখে পড়ল। এরিস্টটলীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখা গেল না। আবার তাকে বাতিলও করা যাচ্ছে না। তাহলে কোনটা মেনে নিতে হবে? আক্ষরিকভাবে বললে, কিছুই না।

## শূন্য এবং ভয়েড

*এক অর্থে আমি ঈশ্বর ও শূন্যের মাঝামাঝি কিছু একটা।*

- রেন ডেকার্ট

ষোলো ও সতের শতকের দর্শন যুদ্ধের একদম কেন্দ্রে ছিল শূন্য ও অসীম। ভয়েড এরিস্টটলের দর্শনকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। আর অসীম বড় মহাবিশ্বের ধারণা সীমাবদ্ধ মহাবিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টির কেন্দ্রে থাকতে পারে না। অনুসারীরা আর থাকল না গির্জার প্রভাবাধীন। ক্যাথলিক গির্জা এবার আগের চেয়ে তীব্র আকারে শূন্য ও ভয়েডকে অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু শূন্য তো আসন গেঁড়ে বসে গেছে। জেসুইট সম্প্রদায়ের মতো গির্জার প্রতি নিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবীরাও দোলাচলে পড়ে গেলেন। কেউ এরিস্টটলকে আঁকড়ে থাকলেন। কেউ আবার নতুন দর্শন মেনে নিলেন, যেখানে আছে শূন্য, ভয়েড ও অসীম। //

রেন ডেকার্টও প্রশিক্ষিত জেসুইট ছিলেন। তিনিও নতুন ও পুরনো মতবাদ নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আবার রাখলেন নিজের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতেও। ১৫৯৬ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রে তাঁর জন্ম। তিনি শূন্যকে নিয়ে এলেন সংখ্যারেখার মাঝে। অসীম ও শূন্যতার মাঝে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজলেন তিনি। আবার এরিস্টটলকে পুরোপুরি ছাড়তেও পারলেন না। তার মধ্যে শূন্যতার ভীতি ছিল প্রবল। সে ভয়ে তার অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করলেন।

পিথাগোরাসের মতো ডেকার্টও দার্শনিক-গণিতবিদ। তাঁর সবচেয়ে অমর কাজ সম্ভবত একটি গাণিতিক উদ্ভাবন। যাকে এখন আমরা বলি কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক। স্কুলে জ্যামিতি পড়া যে কেউ তা দেখেছে। বন্ধনীর ভেতরের এক গুচ্ছ সংখ্যা দিয়ে স্থানের ওপর বিন্দুর অবস্থান পাওয়া যায়। যেমন (৪,২) দিয়ে বোঝায় ৪ একক ডানে ও ২ একক উপরে। কিন্তু কার ডানে বা উপরে? এটাই মূলবিন্দু। শূন্য (চিত্র ২০)।

অক্ষরেখা ১ দিয়ে শুরু করা যাবে না--এটা ডেকার্ট বুঝলেন। তা করতে গেলে ভুল হয়ে যাবে। যে ভুল বিড করেছিলেন ক্যালেন্ডার ঠিক করতে গিয়ে। তবে বিডের সাথে ডেকার্টের পার্থক্য আছে। ডেকার্টের সময় ইউরোপে আরবি সংখ্যার প্রচলন শুরু হয়েছে। অতএব, তিনি শূন্য থেকে গণনা শুরু করলেন। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার একদম কেন্দ্রে বসালেন শূন্যকে। যেখানে দুই অক্ষ একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে। মূলবিন্দু (০,০) হলো কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। (আমরা এখন যে চিহ্ন ব্যবহার করি, ডেকার্টের চিহ্ন তা থেকে একটু আলাদা ছিল। প্রথমত, তাঁর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ঋণাত্মক সংখ্যার ঠাঁই ছিল না। যদিও তাঁর সহকর্মীরা কদিন পরেই তাঁর হয়ে কাজটা করে দেন।

### চিত্র ২০: কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক

ডেকার্ট অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার শক্তি অনুভব করলেন। এটা কাজে লাগিয়ে তিনি ছবি ও আকৃতিকে সমীকরণ ও সংখ্যায় পরিণত করলেন। কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বর্গ, ত্রিভুজ, তরঙ্গাকার রেখার মতো সব জ্যামিতিক বস্তুকে গাণিতিক সম্পর্কের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। যেমন ধরুন, মূল বিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত। একে প্রকাশ করা যাবে এক সেট বিন্দু দিয়ে, যাদের জন্য  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  সমীকরণটি সত্য। পরাবৃত্ত হতে পারে  $y - x^2 = 0$ । সংখ্যা ও আকৃতির মিলন ঘটালেন ডেকার্টে। পশ্চিমের জ্যামিতি শিল্প আর প্রাচ্যের বীজগণিত শিল্পের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেল। সব আকৃতিকেই  $f(x, y) = 0$  আকারের সমীকরণ হিসেবে লেখা যায় (চিত্র ২১)। স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল শূন্য। আর যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতিতে ভেতরে ভেতরে শূন্য লুকায়িত ছিল।

ডেকার্টের মন বলত, ঈশ্বরের সাম্রাজ্যেও শূন্য আছে ভেতরে ভেতরে। ঠিক যেমন আছে অসীম। ওদিকে এরিস্টটলীয় দেয়াল হেলে যাচ্ছিল। ডেকার্ট আবার জেসুইট সম্প্রদায়ের নিবেদিত সৈনিক। তাই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পুরনো প্রমাণের বদলে শূন্য ও অসীম দিয়ে নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালালেন।

প্রাচীনকালের মানুষের মতো ডেকার্টও মনে করতেন শূন্য থেকে কোনো কিছু তৈরি করা যায় না। এমনকি জ্ঞানও না। এর অর্থ দাঁড়ায়, সকল চিন্তা-ভাবনা, সকল দর্শন, ভবিষ্যতের সব আবিষ্কার জন্মের সময় মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে। জ্ঞানার্জন মানে আসলে মহাবিশ্বের ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে আগে থেকে স্থাপিত সেই সূত্রগুলো বের করে আনা। ডেকার্টের মতে, আমাদের মনের মধ্যে অসীমরকম নিখুঁত এক সত্তার ধারণা আছে। অতএব, এই অতিশয় নিখুঁত সত্তা বা ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। অন্য সবার মধ্যে তার তুলনায় কমতি আছে। তারা সসীম। অবস্থান শূন্য ও ঈশ্বরের মাঝামাঝি কোথাও। অসীম ও শূন্যের মিশ্রণ।

ডেকার্টের দর্শনে শূন্যকে বারবার দেখা গেছে। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তিনি মনে করতেন ভয়েড বা চূড়ান্ত শূন্যের অস্তিত্ব নেই। ডেকার্ট প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের সময়ের সন্তান। তিনি এরিস্টটল সম্পর্কে জেনেছেন এমন এক সময়ে যখন গির্জা তার মূলনীতিগুলোর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। ফলে এরিস্টটলের মতবাদ ডেকার্টের মাথায় আসন গেঁড়ে নেয়। তাতে প্রভাবিত হয়ে তিনি ভ্যাকুয়ামকে অস্বীকার করেন।

### চিত্র ২১: একটি পরাবৃত্ত, বৃত্ত ও উপবৃত্তাকার রেখা

এ সময় আসলে কোনো একটি পক্ষ বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। ভ্যাকুয়ামকে পুরোপুরি অস্বীকার করার অধিবিদ্যাগত সমস্যা ডেকার্টের অবশ্যই জানা ছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি পরমাণু ও ভ্যাকুয়াম সম্পর্কে লেখেন, “বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবশ্যই বলা যায়, এগুলো ঘটবে না। তবে এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এগুলো ঈশ্বরই করতে পারেন। যেমন, তিনি প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তন করতে পারেন।” তবুও তাঁর আগের মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের ধারণাই লালন করতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন, কোনো কিছুই সরলপথে চলতে পারে না। কারণ তাতে করে পেছনে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হবে। বরং মহাবিশ্বের সবকিছু চলে বৃত্তাকার পথে। এটা আসলে ছিল এরিস্টটলীয় চিন্তা। তবু যত কিছুই হোক, শেষ পর্যন্ত ভয়েড বা শূন্যতা কিছুদিনের মধ্যেই এরিস্টটলকে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়।

আজকের দিনেও শিশুদের শেখানো হয়, “প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না।” শিক্ষকরা হয়তো ঠিক জানেন না এ কথাটার উৎপত্তি কোথায়। এটা ছিল এরিস্টটলীয় দর্শনের সম্প্রসারিত একটি অংশ: শূন্যস্থানের অস্তিত্ব নেই। কেউ শূন্যস্থান তৈরি করতে চাইলে প্রকৃতি তা ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে। কথাটাকে ভুল প্রমাণ করেন গ্যালিলেওর সহকারি ইভানজেলিস্টা টরিসেলি। তিনিই প্রথম ভ্যাকুয়াম তৈরি করেন।

ইতালির শ্রমিকরা কুয়া ও খাল থেকে পানি তুলতে এক ধরনের পাম্প ব্যবহার করত, যা অনেকটা বড় সিরিঞ্জের মতো কাজ করত। পাম্পের মধ্যে ছিল একটি পিস্টন, যা একটি নলের ভেতরে আঁটোসাঁটো করে লাগানো থাকত। নলের নিচের মাথা পানিতে ডোবানো থাকত। পিস্টনকে উপরে তোলা হলে পানির স্তর নল বেয়ে উঠে আসত।

এক শ্রমিকের কাছে গ্যালিলেও জানতে পেরেছিলেন, এ পাম্প একটি সমস্যা হচ্ছিল। এটি দিয়ে পানি ওঠানো যেত মাত্র ৩৩ ফুট। এরপরে উপরের চাপদণ্ড যতই উঠতে থাকুক, পানির স্তর একই থাকত। সমস্যাটা কৌতূহলের জন্ম দিল। গ্যালিলেও তাঁর সহকারি টরিসেলির কাছে পাঠিয়ে দেন সমস্যাটি। কাজ পেয়ে টরিসেলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তাঁকে জানতেই হবে পাম্পের রহস্যময় সীমাবদ্ধতার রহস্য। ১৬৪৩ সালের কথা। টরিসেলি পরীক্ষা চালানোর জন্য লম্বা একটি নল নিলেন। এক মাথা বন্ধ করে পারদ দিয়ে ভর্তি করলেন একে। এবার উপুড় করে খোলা মাথা পারদ ভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। নলটাকে বায়ুর মধ্যে উপুড় করলে পারদ পড়ে গিয়ে বাতাস দিয়ে ভর্তি হত নল। ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু টরিসেলি তো তা না করে নলটিকে ডুবিয়েছেন পারদের মধ্যে। নলের পারদের জায়গা দখলে নেওয়ার জন্য বাতাসের আসার সুযোগ নেই। প্রকৃতি সত্যিই শূন্যস্থানকে অপছন্দ করলে নলের পারদ উপরেই ঝুলে থাকত। নিচে পড়ে গেলেই তো উপরে শূন্যস্থান তৈরি হবে। কিন্তু পারদ তা করেনি। নেমে গেল খানিকটা। উপরে থাকল ফাঁকা স্থান। এই স্থানে কী থাকল? কিছুই না। ইতিহাসে এই প্রথম কেউ শূন্যস্থান ধরে রাখতে পারলেন।

নল যত বড়-ছোট যাই হোক, পারদ নিচে নেমে যাচ্ছে। থেমে যাচ্ছে পাত্র থেকে প্রায় ৩০ ইঞ্চি উপরে এসে। অন্যভাবে বললে, উপরের শূন্যস্থানের সাথে লড়াই করে পারদ ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে। প্রকৃতি সর্বোচ্চ ৩০ ইঞ্চির ভ্যাকুয়াম অপছন্দ করে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ডেকার্ট বিরোধী আরেক পণ্ডিত।

১৬২৩ সালে ডেকার্টের বয়স ২৭ বছর। ডেকার্টের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লেজ প্যাসকেলের বয়স তখন শূন্য। প্যাসকেলের বাবা এঁটিয়ে ছিলেন গুণী বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তরুণও প্যাসকেলও ছিলেন বাবার মতোই মেধাবী। তরুণ বয়সে তিনি প্যাসকালিন নামে একটি যান্ত্রিক হিসাব-যন্ত্র বানান। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর আসার আগে প্রকৌশলীদের ব্যবহৃত কিছু ক্যালকুলেটরের সাথে এর মিল ছিল।

প্যাসকেলের বয়স ২৩ বছর থাকতে তার বাবা বরফখণ্ডের ওপর পিছলে পড়ে গিয়ে উরু ভাঙেন। একদল জ্যানসেনবাদী তার যত্ন নেন। ক্যাথোলিক এই গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠেছিল মূলত জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই প্যাসকেলের পুরো পরিবারের মন জয় করে নেয় তারা। প্যাসকেলও জেসুইট বিরোধী হয়ে গেলেন। প্রতি-প্রতি-সংস্কারবাদী। নতুন পাওয়া ধর্মটা প্যাসকেলের জন্য মানানসই ছিল না। এ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশপ জ্যানসেন। তিনি ঘোষণা করেন বিজ্ঞানচর্চা পাপ। প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি কৌতূহল এক ধরনের লালসা। ভাগ্য ভাল, প্যাসকেলের এ লালসা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাঁর ধর্মীয় আবেগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি বিজ্ঞান দিয়েই ভ্যাকুয়ামের রহস্য আবিষ্কার করেন।

প্যাসকেলের ধর্মান্তরের সময় এঁটিয়ের এক বন্ধু তাদের বাড়িতে এলেন। পেশায় সামরিক প্রকৌশলী। তিনি টরিসেলির পরীক্ষা করে দেখালেন প্যাসকেলকে। প্যাসকেল তাতে মুগ্ধ। পানি, মদ ও অন্যান্য প্রবাহী পদার্থ নিয়ে নিজেই পরীক্ষা শুরু করলেন। এর ফলাফলই ১৬৪৭ সালে *নিউ এক্সপেরিমেন্টস কন্সার্নিং ভ্যাকুয়াম* (শূন্যস্থান সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা) হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে এতেও মূল প্রশ্নটির উত্তর এল না। পারদ কেন ৩০ ইঞ্চি ওঠে আর পানি ৩৩ ফুট? সে সময়ের কিছু তত্ত্ব এরিস্টটলের দর্শনের কিছু অংশকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বলা হয়, প্রকৃতির শূন্যস্থান ভীতি সীমিত। শূন্যস্থানের নির্দিষ্ট কিছু অংশই কেবল নষ্ট করা যায়। তবে প্যাসকেলের ভাবনা ছিল আলাদা।

১৬৪৮ সালের শরৎকাল। প্যাসকেলের মাথায় হঠাৎ একটা ভাবনা এল। তার শ্যালককে পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়ের ওপর। সাথে পারদ ভর্তি নল। পাহাড়ের চূড়ায় পারদ ৩০ ইঞ্চির চেয়ে অনেক কম উঠল (চিত্র ২২)। প্রকৃতি কি তবে সমতলের চেয়ে পাহাড়ে শূন্যস্থান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়?

## চিত্র ২২: প্যাসকেলের পরীক্ষা

প্যাসকেলের মতে, আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এ আচরণ প্রমাণ করে, পারদের নল বেয়ে ওঠার কারণ ভ্যাকুয়ামভীতি নয়। আসল কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের ওজন পাত্রের পারদকে নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে। আর তাতে পারদ ফাঁকা নল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। পানি বা পারদ যাই হোক, বায়ুর চাপে তা খালি নল বেয়ে উঠে যাবে উপরে। ঠিক যেভাবে টুথপেস্টের নলের নিচে আলতো চাপ দিলে পেস্ট উপর দিয়ে বের হয়ে আসে। এখন, বায়ুর চাপ তো সীমিত। এ চাপ পারদকে চাপ দিয়ে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠাতে পারে। পাহাড়ের চূড়ায় বায়ুর চাপ কম। তাই সেখানে ৩০ ইঞ্চিও পারে না।

এখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে। শূন্যস্থান কিছুকে টেনে নেয় না। বরং বায়ুমণ্ডল চাপ দেয়। প্যাসকেলের এ সরল পরীক্ষা এরিস্টটলের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিল। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে ঘৃণা করে না। প্যাসকেল লেখেন, “এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি, শূন্যস্থানের সাথে প্রকৃতির কোনো শত্রুতা নেই। প্রকৃতি শূন্যস্থানকে এড়িয়ে চলার কোনো চেষ্টা করে না। বরং শূন্যস্থানকে বিনা বাক্যে ও বিনা বাধায় মেনে নেয়।” এরিস্টটল পরাজিত হলেন। বিজ্ঞানীদের ভয়েডভীতি দূর হলো। শুরু করলেন ভয়েডের বিশ্লেষণ। নিষ্ঠাবান জ্যানসেনবাদী প্যাসকেল শূন্য এবং অসীমের মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজলেন। কাজটি করলেন এক ধরনের অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে।

## ঈশ্বর নিয়ে বাজি

*প্রকৃতিতে মানুষ কী? অসীমের তুলনায় কিছুই না। শূন্যের তুলনায় সবকিছু। শূন্য ও সবকিছুর মাঝামাঝি কিছু একটা।*  
-- ব্রেজ প্যাসকেল, পেনসিস।

প্যাসকেল একইসাথে বিজ্ঞানী ও গণততবিদ। বিজ্ঞানী হিসেবে করেছেন শূন্যস্থানের অনুসন্ধান। ভয়েডের বৈশিষ্ট্য। গণিতে অবদান রেখেছেন একেবারে নতুন একটু শাখা তৈরিতে। সম্ভাবনা তত্ত্ব। সম্ভাবনা তত্ত্বকে শূন্য ও অসীমের সাথে মিলিয়ে তিনি পেলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সম্ভাবনা তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল অভিজাত ধনী লোকদের জুয়ায় বেশি লাভ করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। প্যাসকেলের তত্ত্ব ছিল দারুণ সফল। কিন্তু তাঁর গণিতচর্চা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৬৫৪ সালের ২৩ নভেম্বর। প্যাসকেলের মধ্যে তীব্র এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়। হয়তোবা এটা জ্যানসেনবাদীদের বিজ্ঞানবিরোধিতার প্রভাব। তবে কারণ যাই হোক, প্যাসকেলের নতুন আবেগ তাঁকে গণিত ও বিজ্ঞান থেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে দিল। (চার বছর পরে একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেসময় অসুস্থতার কারণে তাঁর ঘুমের সমস্যা হচ্ছিল। গণিতচর্চা শুরু করলে ব্যথা কমে যায়। প্যাসকেল মনে করতেন এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁকে বার্তা দিয়েছেন, তার জ্ঞানচর্চায় তিনি নাখোশ নন।) তিনি হয়ে গেলেন ধর্মতাত্ত্বিক। কিন্তু নিজের মূল পরিচয় ছাড়তে পারলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়েও বারবার তিনি বোকা ফরাসি জুয়াড়িদের কাছে ফিরে গেলেন। প্যাসকেল বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাই ভাল। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাজি ঈশ্বরের পক্ষে।

ঠিক জুয়ার প্রত্যাশিত লাভ হিসাব করার মতো করেই তিনি ঈশ্বরকে মেনে নেওয়ার হিসাব কষলেন। শূন্য ও অসীমের গণিতের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন, ঈশ্বর আছেন বলেই ধরে নেওয়া উচিত।

বাজির হিসাব দেখার আগে সহজ আরেকটি খেলা দেখে নেওয়া যাক। ধরুন ক ও খ নামে দুটি খাম আছে। আপনাকে খাম দেখানোর আগে কয়েন টস করে ঠিক করা হলো কোন খামে কত টাকা থাকবে। টসে হেড পড়লে ক খামে ১০০ টাকা থাকবে। আর টেল পড়লে টাকা থাকবে খ খামে। পরিমাণ ১০, ০০০,০০০। আপনি কোন খামটি নেবেন?

অবশ্যই খ। এতে আছে অনেক বেশি টাকা। সম্ভাবনার তত্ত্বের প্রত্যাশা (expectation) বলতে একটি হাতিয়ার আছে। যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারব প্রতিটি খামের মান কত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক খামে ১০০ টাকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। খামের একটা দাম আছে—ঠিক। তবে সেটা পুরোপুরি ১০০ নয়। কারণ আমরা নিশ্চিত করে জানি না, এতে টাকা আছে কিনা। গণিতবিদ খামের সম্ভাব্য পরিমাণগুলো যোগ করবেন। গুণ করবেন ঐ পরিমাণের সম্ভাবনা দিয়ে।

০ পেলে: জেতার সম্ভাবনা  $1/2 \times ০$  টাকা = ০ টাকা  
 ১০০ পেলে: জেতার সম্ভাবনা  $1/2 \times ১০০$  টাকা = ৫০ টাকা  
 মোট প্রত্যাশা =  $০ + ৫০ = ৫০$  টাকা

ফলে ক খামের প্রত্যাশিত মান ৫০ টাকা।  
 একইভাবে খ খামের প্রত্যাশিত মান বের করা যাবে।

০ জেতার সম্ভাবনা  $1/2 \times ০$  টাকা = ০ টাকা  
 ১০,০০০,০০০ টাকা জেতার সম্ভাবনা  $1/2 \times ১০,০০০,০০০$  টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা  
 মোট প্রত্যাশা = ৫,০০,০০০ টাকা

হিসাবটা এক নজরে দেখুন টেবিলে:

মান	টাকা থাকলে (সম্ভাবনা $1/2$ )	টাকা না থাকলে (সম্ভাবনা $1/2$ )	প্রত্যাশিত মান
১০০	$1/2 \times ১০০ = ৫০$	$1/2 \times ০$	$০ + ৫০ = ৫০$ টাকা
১০,০০০,০০০	$1/2 \times ১০,০০০,০০০ = ৫,০০,০০০$	$1/2 \times ০$	$০ + ৫,০০,০০০$ টাকা



অতএব খ খামের প্রত্যাশিত মান ক খামের ১০,০০০ গুণ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দুই খামের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকলে খ খাম নিতে হবে।

প্যাসকেলের বাজিও এই খেলার মতোই। পার্থক্য হলো এখানে দুই খামের বদলে আছে খৃষ্টান ও নাস্তিক। আসলে প্যাসকেল শুধু খৃষ্টান মত নিয়ে হিসাব করেছিলেন। তবে যুক্তির সম্প্রসারণে নাস্তিকের বিশ্বাসও চলে আসে।) যুক্তির খাতিরে আপাতত ধরে নিন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০-৫০। (প্যাসকেল অবশ্য ঈশ্বর বলতে খৃষ্টানদের ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন) এখন, খৃষ্টীয় খাম নেওয়া মানে নিষ্ঠাবান খৃষ্টান হওয়ার পথ বেছে নেওয়া। এ পথ বেছে নিলে দুটো সম্ভাবনা থাকে। ধরুন, একজন মানুষ অনুগত খৃষ্টান হয়ে জীবনধারণ করল। পরে দেখা গেল ঈশ্বর বলতে কেউ নেই। তাহলে মানুষটা মৃত্যুর সাথে সাথে শূন্যতার গহীনে হারিয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে থাকলে সে স্বর্গে যাবে। ভোগ করবে অনন্তকালীন সুখ: অসীম। তাহলে খৃষ্টানের জন্য প্রত্যাশিত মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা  $1/2 \times 0 = 0$   
 স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা  $1/2 \times \text{অসীম} (\infty) = \infty$   
 প্রত্যাশিত মান =  $\infty$

আর যাই হোক, অসীমের ( $\infty$ ) অর্ধেক তো অসীমই ( $\infty$ )। অতএব, খৃষ্টান হওয়ার লাভ অসীম। এখন, নাস্তিক হলে কী হবে? নাস্তিক সঠিক হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। মত সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাতে কোনো লাভ নেই। ঈশ্বর নেই মানে স্বর্গও নেই। কিন্তু মত ভুল প্রমাণ হলে এবং ঈশ্বর থেকে থাকলে সে অনন্তকাল নরকে থাকবে (ঋণাত্মক অসীম)। অতএব নাস্তিকের জন্য প্রত্যাশিত মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা  $1/2 \times 0 = 0$   
 নরকে যাওয়ার সম্ভাবনা  $1/2 \times \text{অসীম} (-\infty) = -\infty$   
 প্রত্যাশিত মান =  $-\infty$

মানে ঋণাত্মক অসীম। এর চেয়ে খারাপ কিছু হতেই পারে না। প্যাসকেলের যুক্তিতে, একজন জ্ঞানী মানুষ নাস্তিক না হয়ে অবশ্যই খৃষ্টান হবে।

তবে এখানে আমরা ধরে নিয়েছি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ৫০-৫০। সম্ভাবনা যদি  $1/1000$  হয় তাহলে? সেক্ষেত্রে খৃষ্টান হওয়ার মান হবে:

শূন্যতায় হারানোর সম্ভাবনা  $999/1000 \times 0 = 0$   
 স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা  $1/1000 \times \text{অসীম} (\infty) = \infty$   
 প্রত্যাশিত মান =  $\infty$

মান একই আছে। অসীম। আর নাস্তিকের প্রত্যাশিত মানও এখনও ঋণাত্মক অসীম। এক্ষেত্রে খৃষ্টান হয়ে থাকা এখনও অনেক বেশি সুবিধাজনক। সম্ভাবনা  $1/10,000$  কিংবা  $1/10,000,000$  বা আরও অনেক ছোট কোনো সংখ্যা হলেও একই ফল বের হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম শূন্য।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা শূন্য হলে প্যাসকেলের বাজি অর্থহীন। খৃষ্টান হওয়ার প্রত্যাশিত মান হবে  $0 \times \infty = 0$ । যা এক অর্থহীন কথা। অন্যথায় শূন্য ও অসীমের জাদুতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই অপেক্ষাকৃত ভাল সিদ্ধান্ত। প্যাসকেল জানতেন বাজিতে জিততে কী করা লাগবে। যদিও তা করতে গিয়ে গণিত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১। গ্রহদের চলাচলের ব্যতিক্রমী আচরণের ব্যাখ্যা জানতে পড়ুন

ক. আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, 'সৌরজগৎ', মহাবিশ্বের সীমানা, ঢাকা: অন্বেষা, ২০১৯, পৃ. ৭৫

খ. আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, বিশ্ব ডট কম, <https://sky.bishwo.com/2024/07/retrograde-motion.html>, ১৪/০৭/২০২৪

## পঞ্চম অধ্যায় অসীম শূন্য শূন্য এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

গণিত সাধারণত নীতিতে অনড় থাকে। কিন্তু অসীম পরিমাণ বড় ও ছোট জিনিসের আগমন গণিতকে নীতিতে আপোষ করতে অভ্যস্ত করল। গাণিতিক বিষয়সমূহের পরম সিদ্ধতা ও অখণ্ডনীয় প্রমাণের আদিম অবস্থা চিরতরে বিদায় নিল। বিতর্কের যুগের উদ্বোধন হলো। আমরা সে বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম, যেখানে মানুষ অন্তরীকরণ ও যোগজীকরণ করে বুঝে-শুনে নয়, বরং বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কারণ, এখন পর্যন্ত এর ফলাফল সঠিক পাওয়া গেছে।

-- ফ্রিডরিখ এংগেলস

শূন্য এবং অসীম এরিস্টটলীয় দর্শনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। শূন্যতা ও অসীম বাদামের খোসাচ আবদ্ধ মহাবিশ্বের ধারণা বাতিল করে দিয়েছিল। বাতিল করে দিয়েছিল প্রকৃতির শূন্যস্থানকে অপছন্দ করার ধারণা। প্রাচীন জ্ঞান হয়ে গেল মূল্যহীন। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির ক্রিয়াকৌশল বিষয়ক সূত্র তৈরি করছিলেন। তবে এ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মধ্যেও একটি অসুবিধা থেকে গেল: শূন্য। বিজ্ঞান জগতে নতুন শক্তিশালী হাতিয়ার তখনক্যালকুলাস। কিন্তু এর গভীরে লুকিয়ে থাকল একটি প্যারাডক্স<sup>১</sup>। ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক আইজ্যাক নিউটন ও গটফ্রিড উইলহেলম লিবনিজ। শূন্য দিয়ে ভাগ আর অসীমসংখ্য শূন্যকে যোগ করে তারা বানিয়ে ফেলেন গণিতের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। দুটো কাজই অবৈধ। এ যেন  $1 + 1 = 0$  লেখা। মৌলিকভাবে ক্যালকুলাস গাণিতিক যুক্তি মেনে চলেনি। একে গ্রহণ করতে হলে নিতে হয় বিশ্বাসের আশ্রয়। বিজ্ঞানীরা তা করলেন। কারণ ক্যালকুলাস হলো প্রকৃতির ভাষা। এ ভাষাটা ভাল করে বুঝতে হলে অসীম শূন্যকে জয় করা চাই।

ইউরোপ ঘুমিয়ে কাঁটাল এক হাজার বছর। খৃষ্টীয় ফাদাররা দারুণ দক্ষতায় সে ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছিল।  
ইউরোপীয়রা সে ঘুম থেকে জেগে উঠল শূন্যকে সাথে নিয়ে।

-- টোবিয়াস ড্যান্টসিগ, নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স

শূন্যের অভিশাপ গণিতকে দুই হাজার বছর তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল অ্যাকিলিজকে আজীবন কচ্ছপের পেছনে ছুঁতে হবে। ধরতে পারবে না কখনোই। জেনোর সরল ধাঁধার মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসীম। অ্যাকিলিজের অসীম ধাপ গ্রিকদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। তারা অসীম পদক্ষেপকে যোগ করার কথা ভাবেনি কভুও। যদিও অ্যাকিলিজের

পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট হয়ে শূন্যের দিকে এগোচ্ছিল। শূন্যের ধারণা ছাড়া আসলে এ যোগ করার সাধ্য তাদের ছিল না। তবে পশ্চিম শূন্যকে গ্রহণ করে নিলে গণিতবিদরা অসীমকে করায়ত্ত করলেন। শেষ হলো অ্যাকিলিজের রেস।

জেনোর ধারায় অসীম অংশ আছে, সত্য। তবুও আমরা সবগুলো পদক্ষেপ যোগ করতে পারি। এরপরেও পাব সসীম মান।  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots = 2$ । এ কৌশল প্রথম খাতান ব্রিটিশ যুক্তিবিদ রিচার্ড সুইসেথ। অসীম পদকে যোগ করে সসীম মান বের করেন তিনি। তিনি সংখ্যার একটি অসীম ধারা নেন।  $1/2, 2/8, 3/8, 4/16, \dots, n/2^n, \dots$ । এবার এদেরকে যোগ। পাওয়া যাচ্ছে দুই। দেখাই যাচ্ছে, ধারার সংখ্যাগুলো ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি হচ্ছে। কেউ হয়ত বলে ফেলবেন, এ কারণই তো সসীম মান আসার জন্য যথেষ্ট। হায়! অসীম যদি এত সরল হত!

প্রায় একই সময়ের কথা। ফরাসি গণিতবিদ নিকোল ওরেম কাজ করছিলেন আরেকটি অসীম সংখ্যার ধারা নিয়ে। গালভরা নাম তরঙ্গ ধারা।

$1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + \dots$  জেনো এবং সুইসেথের ধারার মতোই পদগুলো শূন্যের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সুইসেথ এদেরকে যোগ করতে গিয়ে দেখেন, যোগফল ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। প্রত্যেকটা পদ আলাদাভাবে শূন্যের দিকে গেলেও যোগফল যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে রেখে ওরেম এটা দেখান।  $1/2 + (1/3 + 1/4) + (1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8) + \dots$ । প্রথম গুচ্ছের মান  $1/2$ । পরের গুচ্ছ  $(1/4 + 1/8)$  বা  $1/2$ -এর চেয়ে বড়। (কারণ তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশি) একইভাবে পরের গুচ্ছ  $(1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8)$  বা  $1/2$ -এর চেয়ে বড়। এভাবেই চলছে। ক্রমেই  $1/2$  করে যোগ হচ্ছেই। যোগফলও বড় হচ্ছে। যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলো শূন্যের দিকে গেলেও তা যথেষ্ট দ্রুত হারে হচ্ছে না। তার মানে, সংখ্যারা নিজেরা শূন্যের দিকে গেলেও অসীম সংখ্যার যোগফল অসীম হতে পারে। তবুও অসীম যোগফলের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক কিন্তু এটা নয়। শূন্য নিজেও অসীমের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়।

এই ধারাটার কথা ভাবুন:

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

এর যোগফল শূন্য দেখানো কঠিন কিছু নয়। কত সহজ কাজ:

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \dots$$

অতএব শূন্য। কিন্তু অন্যভাবে দেখুন।

$$1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$$

একে লেখা যায়

$$1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \dots$$

যার মান ১। শূন্যের অসীম যোগফল একইসাথে ০ ও ১ হতে পারে। ইতালীয় পুরোহিত গুইডো গ্রান্ডি তো এই ধারা দিয়ে প্রমাণ করেন ঈশ্বর শূন্য (০) থেকে মহাবিশ্ব (১) সৃষ্টি করতে পারেন। আসলে এই ধারাকে যেকোনো কিছুর সমান প্রমাণ করা যায়। তা করতে হলে ১ ও (-১) এর বদলে ৫ ও (-৫) দিয়ে শুরু করুন (অথবা মূল ধারা থেকেই ৫টি ১ বের করে নিয়ে বাকিদেরকে  $(1 - 1) + (1 - 1) + \dots$  এভাবে লিখুন।

অসীমসংখ্যক জিনিসকে নিজেদের সাথে যোগ করলে অঙ্কিত ও অস্বাভাবিক ফলাফল পাওয়া যায়। কখনো সংখ্যারা শূন্যের দিকে গেল যোগফল হয় ২ বা ৫৩-এর মতো নাদুসনুদুস কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা। কখনো আবার যোগফল ধেয়ে চলে অসীমের দিকে। শূন্যের অসীম যোগফল আবার যেকোনো কিছু সমান হতে পারে। কী অঙ্কিত কাণ্ড ঘটে চলছে! কেউ জানত না কীভাবে অসীমকে করায়ত্ত্ব করা যায়।

ভাগ্য ভাল যে গাণিতিক জগতের চেয়ে ভৌত জগতটাকে বেশি অর্থবহ লাগে। বাস্তব জগতে কাজ করলে আর অসীমসংখ্যক জিনিসকে যোগ করাটা কাজেও আসে। যেমন ধরুন পাত্রের আয়তন বের করতে গেলে কাজটা করা লাগতে পারে। ১৬১২ সাল ছিল এমন কাজের উপযুক্ত একটি সময়।

এখানেও নায়ক জোহানেস কেপলার। যিনি গ্রহদের উপবৃত্তাকার পথের প্রমাণ দিয়েছিলেন। ঐ বছরটিতে তিনি পাত্রের আয়তন নিয়ে মগ্ন থাকেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন পাত্রের নির্মাতা ও ব্যবহারকারীরা কাজটা করে খুব কাঁচা হাতে। কেপলার তাদের সাহায্যে কাজে নেমে পড়লেন। মনে মনে তিনি পাত্রকে অসীমসংখ্যক অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করলেন। এরপর আবার তাদেরকে জোড়া দিয়ে পাত্রের আয়তন বের করলেন। পাত্রের আয়তন পরিমাপের উল্টো পদ্ধতি মনে হতে পারে একে। তবে ভাবনাটি ছিল চমৎকার।

সমস্যাটাকে সহজ করে বলা যাক। ত্রিমাত্রিক বস্তুর বদলে দুই মাত্রার একটি জিনিস কল্পনা করি। ধরুন একটি ত্রিভুজ। ২৩ নং চিত্রের ত্রিভুজের উচ্চতা ও ভূমি ৮ একক করে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেতে ভূমি ও উচ্চতা গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হয়। অতএব এ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩২ একক।

এবার ধরুন অন্যভাবে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব। ত্রিভুজের ভেতরে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র বানিয়ে সেগুলোর ক্ষেত্রফল যোগ করব। প্রথম চেষ্টায় আমরা পাচ্ছি ১৬ একক ( $8 \times 8$ )। যা মূল ক্ষেত্রফল থেকে অনেক কম। পরেরবার আরেকটু ভাল ফল এসেছে। এবার নিয়েছি তিনটি আয়ত। পেলাম  $2 \times 2 + 2 \times 8 + 2 \times 6 = 28$  একক। আগের চেয়েও ভাল হলেও মূল মান থেকে বেশ দূরে এখনও। তৃতীয় চেষ্টায় পাই ২৮। বোঝাই যাচ্ছে, আয়তক্ষেত্রকে ক্রমশ ছোট করতে থাকলে এদের মোট ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের খুব কাছাকাছি হয়। অনেক ছোট আয়তদের  $\Delta x$  চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।  $\Delta x$  ছোট হওয়া মানে আসলে শূন্যের দিকে যাওয়া। (এ আয়তদের যোগফল হলো  $\sum f(x)$ , যেখানে গ্রিক বর্ণ  $\sum$  (সিগমা) হলো একটি উপযুক্ত পরিসরের যোগফল বা সমষ্টির প্রতীক। আর  $f(x)$  হলো আয়তক্ষেত্রগামী রেখার সমীকরণ। প্রতীকের আধুনিক পদ্ধতিতে  $\Delta x$  শূন্যের দিকে যেতে থাকলে  $\sum$  চিহ্নকে নতুন আরেকটি প্রতীক  $\int$  দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর  $\int$ -এর সাথে  $dx$  বসিয়ে সমীকরণকে  $\int f(x)dx$  লেখা হয়। এর নাম ইন্টিগ্র্যাল বা যোগজ।

### চিত্র ২৩: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পরিমাপ

কেপলারের এ কাজটার কথা বেশি মানুষ জানে না। তবে এ কাজটিই তিনি করেছিলেন তিন মাত্রায়। ব্যারেলের আয়তন পরিমাপ করতে গিয়ে। এর জন্য তিনি ব্যারেলকে কেটে বিভিন্ন তল বানান। পরে এদের আয়তন যোগ করে পান পাত্রের আয়তন। শূন্য নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। তবে কেপলার সে সমস্যার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যান।  $\Delta x$ -এর মান শূন্যের দিকে যেতে থাকলে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করতে হয়। যার কোনো অর্থই নেই। কেপলার এ সমস্যা উপেক্ষা করেন। যুক্তির বিচারে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করা অর্থহীন কাজ হলেও কাজটার ফলাফল পাওয়া গেল যথাযথ।

বস্তুকে অসীম পরিমাণ ছোট ধরে কাজ করা বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেপলার একা নন। অসীম ও অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র এসব খণ্ডের কথা নিয়ে ভেবেছিলেন গ্যালিলেও-ও। এই দুটি ধারণা আমাদের সসীম জ্ঞানের পরিধির বাইরে। তিনি লেখেন, “প্রথমটি আমরা বুঝতে পারি না এর বিশালতার কারণে, আর পরেরটি এর তুচ্ছতার জন্য।” তবে অসীম শূন্য রহস্যময় হলেও গ্যালিলেও এর শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন, “একবার ভাবুন দুটোকে একত্র করলে কী হতে পারে।” গ্যালিলেওর ছাত্র বোনাভেন্তুরা কাভালিয়েরি এ ভাবনার আংশিক উত্তর দিয়েছিলেন।

ব্যারেলের বদলে কাভালিয়েরি জ্যামিতিক বস্তু নিয়ে কাজ করেন। কাভালিয়েরির মতে ত্রিভুজের মতো সব ক্ষেত্রফলই অসীমসংখ্যক শূন্যদৈর্ঘ্যের রেখা দিয়ে গঠিত। আর আয়তন গঠিত অসীমসংখ্যক শূন্যউচ্চতার তল নিয়ে। এসব অবিভাজ্য রেখা ও তল ক্ষেত্রফল ও আয়তনের পরমাণুর মতো। এদেরকে আর ভাগ করা যাবে না। চিকন খণ্ড দিয়ে কেপলার ঠিক যেভাবে ব্যারেলের আয়তন মেপেছিলেন, কাভালিয়েরি সেভাবেই অসীমসংখ্যক অবিভাজ্য শূন্যকে যোগ করে জ্যামিতিক বস্তুর ক্ষেত্রফল বা আয়তন বের করেন।

কাভালিয়েরির বক্তব্য জ্যামিতিকদের বিব্রত করে। শূন্য ক্ষেত্রফলের অসীমসংখ্যক রেখা যোগ করে দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ পাওয়া যায় না। একইভাবে অসীমসংখ্যক শূন্য আয়তনের তল যোগ করে ত্রিমাত্রিক কাঠামো পাওয়া যাবে না। সমস্যা আসলে একই জায়গায়: অসীম শূন্যের কোনো অর্থ নেই। তবে কাভালিয়েরির পদ্ধতি সবসময় সঠিক উত্তর দিচ্ছিল। অসীম শূন্যকে যোগ করার যুক্তিগত ও দার্শনিক সমস্যা গণিতবিদরা উপেক্ষা করেন। এর কারণও আছে। অসীম ক্ষুদ্র বা অবিভাজ্য ধারণার মাধ্যমে সমাধান মিলল দীর্ঘদিনের এক ধাঁধাঁর। এটা হলো স্পর্শকের সমস্যা।

স্পর্শক হলো একটি রেখা, যা কোনো কার্ভকে শুধু স্পর্শ করে সোজা চলে যায়। মসৃণভাবে বেয়ে চলা একটি কার্ভের যেকোনো বিন্দুতেই এমন একটি রেখা থাকবে যা কার্ভকে আলতো করে স্পর্শ করে চলে যাবে। কার্ভকে স্পর্শ করবে একটিমাত্র বিন্দুতে। এটাই স্পর্শক। গণিতবিদরা দেখলেন, গতি নিয়ে কাজ করতে গেলে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, সুতোয় একটি বল বেঁধে আপনার মাথার চারপাশে ঘোরাচ্ছেন। বল ঘুরবে বৃত্তাকার পথে। হঠাৎ সুতো ছিঁড়ে গেলে বল এক দিকে উড়ে চলে যাবে। আর এ গমন পথ হবে স্পর্শক রেখা বরাবর। বল নিক্ষেপের সময় বেসবল খেলোয়াড়ের বাহু বৃত্তচাপের পথ বেয়ে ঘোরে। বল ছেড়ে দেওয়া মাত্রই সেটা চলে স্পর্শক বরাবর (চিত্র ২৪)। আবার ধরুন পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়া বল কোথায় এসে থামবে জানতে হলে বের করতে হবে কোথায় স্পর্শক অনুভূমিকের সমান্তরাল। স্পর্শক রেখা কম-বেশি খাড়া হতে পারে। এ পরিমাপের নাম ঢাল। পদার্থবিদ্যায় আছে যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ধরুন, একটি কার্ভ দিয়ে একটি বাইসাইকেলের অবস্থান প্রকাশ করা হলো। তাহলে স্পর্শক রেখার ঢাল বলে দেবে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করার সময় বাইসাইকেলের বেগ কত থাকবে।

#### চিত্র ২৪: স্পর্শক বরাবর গতি

এ কারণেই সতের শতকের বহু গণিতবিদ কোনো কার্ভের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক রেখার পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ তালিকায় আছেন ইভানজেলিস্টা টরিসেলি, রেন ডেকার্ট, ফরাসি ভদ্রলোক পিয়ের ডে ফের্মা (তাঁর শেষ উপপাদ্যের জন্য বিখ্যাত) আর ইংরেজ ভদ্রলোক আইস্যাক ব্যারো। তবে কাভালিয়েরির মতোই সবগুলোতেই অসীম ক্ষুদ্রের সমস্যা পাওয়া গেল।

কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক আঁকতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো অনুমান দিয়ে শুরু করা। এবার পাশেই আরেকটি বিন্দু নিয়ে দুটোকে যোগ করে দিন। যে রেখা পাওয়া যাবে সেটাই ঠিক স্পর্শক নয়। তবে কার্ভটা খুব বেশি উঁচি-নিচু না হলে রেখা দুটি খুব কাছাকাছি হবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমাতে থাকলে অনুমিত রেখা স্পর্শক

রেখার খুব কাছাকাছি হতে থাকবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলো একে অপর থেকে শূন্য দূরত্বে থাকলে অনুমান হবে নিখুঁত। পাওয়া গেছে স্পর্শক। তবে ঝামেলা একটা আছে।

### চিত্র ২৫: স্পর্শক রেখার অনুমান

একটি রেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর ঢাল। ঢাল মাপার জন্য গণিতবিদরা দেখেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি রেখা কত উঁচুতে উঠল। যেমন ধরুন, একটি পাহাড়ে আপনি পূর্ব দিকে গাড়ি চালাচ্ছেন। প্রতি মাইল পূর্বে যেতে যেতে আপনি অর্ধমাইল মাইল উপরে উঠছেন। এমন পাহাড়ের ঢাল মাপা খুব সহজ। আপনি ভূমির সমান্তরালে যেতে এক মাইল গিয়ে উপরে উঠেছেন অর্ধেক মাইল। এই অর্ধেক মাইলই এই পাহাড়ের ঢাল। গণিতের ভাষায় এ ঢালের মান  $1/2$ । একই কথা খাটে রেখার জন্যও। রেখার ঢাল মাপার জন্য দেখতে হবে নির্দিষ্ট অনুভূমিক দূরত্ব ( $\Delta x$ ) পার হতে হতে কতটুকু ওপরে ওঠে ( $\Delta y$ )। রেখার ঢাল তাই হবে  $\Delta y/\Delta x$ ।

স্পর্শক রেখার ঢাল হিসাব করতে গেলে শূন্য কাছাকাছি মান বের করার প্রক্রিয়াটাকে ধ্বংস করে দেয়। স্পর্শক রেখার আসন্ন মান যত ভাল হতে থাকে, আসন্ন মান পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা বিন্দুগুলো তত কাছাকাছি হতে থাকে। তার মানে, বিন্দুগুলোর অনুভূমিক দূরত্বের পার্থক্যের ( $\Delta x$ ) সাথে সাথে উচ্চতার পার্থক্যও ( $\Delta y$ ) শূন্যের দিকে যেতে থাকে। স্পর্শকের আসন্ন মান নিখুঁত হতে থাকলে  $\Delta y/\Delta x$ -এর মান  $0/0$ -এর দিকে যেতে থাকে। শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে মহাবিশ্বের যেকোনো সংখ্যা পাওয়া সম্ভব। স্পর্শক রেখার ঢালের কি কোনো অর্থ আছে?

অসীম বা শূন্য নিয়ে কাজ করতে গেলেই গণিতবিদরা যুক্তির গোলকধাঁধায় পড়ে যান। ব্যারেলের আয়তন বা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে তারা অসীম শূন্যকে যোগ করেছেন। কার্ভের স্পর্শক বের করতে তারা শূন্যকে ভাগ দিয়েছেন শূন্য দিয়েই। স্পর্শক ও ক্ষেত্রফল বের করার মতো সরল কাজকে শূন্য ও অসীম স্ববিরোধী কাজের মতো করে বানিয়ে ছাড়ল। ছোট সমস্যা মনে করে এদের কথা হয়তো সবাই ভুলেই যেত। কিন্তু মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে যে অসীম ও শূন্যই মূল ভূমিকা পালন করে।

### শূন্য ও মরমি ক্যালকুলাস

পর্দা উঠিয়ে অন্দরমহলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখব শূন্যতা, অন্ধকার ও বিভ্রান্তি। ভুল না হয়ে থাকলে আমি বরং বলব পুরোপুরি অসম্ভব ও অসঙ্গতি। এরা না অসীম রাশি, আর না অসীম পরিমাণ ছোট, আর না শূন্যের সমান ছোট।  
আমরা কি এদেরকে মৃত রাশির ভূত বলতে পারি?

-- বিশপ বার্কলি, দ্য অ্যানালিস্ট

স্পর্শক ও ক্ষেত্রফলের দুই সমস্যাই অসীম ও শূন্যের সাথে টক্কর লাগায়। এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। দুই সমস্যা আসলে একই। দুটোই ক্যালকুলাসের জিনিস। ক্যালকুলাসের মতো এত শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। এই যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা আগে অদেখা চাঁদ ও তারার জগত দেখতে সক্ষম হন। কিন্তু ক্যালকুলাসের কাজটা অন্য মাত্রার। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর গতি নির্ণায়ক সূত্রগুলোকে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। যে সূত্রই শেষ পর্যন্ত বলে দেয়, চাঁদ ও তারা তৈরি হয়েছিল কীভাবে। ক্যালকুলাস হয়ে গেল প্রকৃতিরই ভাষা। কিন্তু এরই পরতে পরতে আবার মিশে আছে অসীম ও শূন্য। যা নতুন এই হাতিয়ারের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ক্যালকুলাসের প্রথম উদ্ভাবক জন্মের পর প্রথম নিঃশ্বাসের আগেই অল্পের জন্য মারা যাচ্ছিলেন। ১৬৪২ সালের বড়দিনের দিন তাঁর জন্ম। ময়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে চলে আসেন স্বাভাবিক সময়ের আগেই হয়। ছোট্ট এক শরীর

মুচড়ে পৃথিবীর আলো দেখেন আইজ্যাক নিউটন। আকারে এত ছোট ছিলেন যে এক লিটারের একটি মগেই তার জায়গা হয়ে যেত। বাবা ছিলেন কৃষক। মারা যান নিউটনের জন্মের দুই মাস আগেই।

ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন অস্থিরতার<sup>২</sup> মধ্য দিয়ে। মা চেয়েছিলেন নিউটনও যেন বড় হয়ে কৃষিকাজে যুক্ত হয়। ১৬৬০-এর দশকে ক্যামব্রিজে ভর্তি হন। পড়াশোনায় ভাল করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই স্পর্শক সমস্যা সমাধানের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বের করেন। যেকোনো মসৃণ কার্ভের যেকোনো বিন্দুর স্পর্শক বের করতে পারতেন তিনি। এ কাজটা ক্যালকুলাসের অর্ধেক। নাম অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন (differentiation)। তবে আমরা আজ ব্যবকলন যেভাবে লিখি, নিউটনের পদ্ধতি তা থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল।

নিউটন ব্যবকলন লিখতেন ফ্লুক্সোন বা গাণিতিক রাশিমালার প্রবাহ দিয়ে। তিনি অবশ্য এদের বলতেন ফ্লুয়েন্ট। নিউটনের ফ্লুক্সোনের একটি উদাহরণ নীচের সমীকরণ থেকে বোঝা যাবে:

$$y = x^2 + x + 1$$

এ সমীকরণে ফ্লুয়েন্ট হলো  $y$  ও  $x$ । নিউটন ধরে নেন, সময়ের সাথে  $y$  ও  $x$  এর মধ্যে পরিবর্তন বা প্রবাহ ঘটছে। এদের পরিবর্তনের হার বা ফ্লুক্সোনকে যথাক্রমে  $\dot{y}$  ও  $\dot{x}$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যবকলন করতে নিউটন প্রতীক নিয়ে একটুখানি চাতুরী করেছেন। তিনি ফ্লুক্সোনদের পরিবর্তিত হতে দিয়েছেন। তবে সেটা অসীম ক্ষুদ্র হারে। তার মানে তিনি আসলে এদেরকে পরিবর্তন ঘটানোর বা প্রবাহিত হওয়ার জন্য কোনো সময়ই দেননি। নিউটনের প্রতীকে মুহূর্তের মধ্যে  $y$  হয়ে যাবে  $(y + O\dot{y})$ , যেভাবে  $x$  হয়ে যাবে  $(x + O\dot{x})$ । ( $O$  অক্ষর দিয়ে প্রবাহিত সময়ের পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। এটা পুরোপুরি শূন্য না হলেও প্রায় শূন্য। আমরা পরে আরও দেখব।) সমীকরণ তাহলে হয় এমন:

$$y + O\dot{y} = (x + O\dot{x})^2 + (x + O\dot{x}) + 1$$

$(x + O\dot{x})^2$  কে ভেঙে পাই:

$$y + O\dot{y} = x^2 + 2x(O\dot{x}) + (O\dot{x})^2 + (x + O\dot{x}) + 1$$

পদগুলোকে সাজিয়ে পাই

$$y + O\dot{y} = (x^2 + x + 1) + 2x(O\dot{x}) + 1(O\dot{x}) + (O\dot{x})^2$$

এখন  $y = (x^2 + x + 1)$  হওয়ায় সমীকরণের উভয় পাশ থেকে এটাকে বাদ দেওয়া যায়। বাকি থাকে

$$O\dot{y} = 2x(O\dot{x}) + 1(O\dot{x}) + (O\dot{x})^2$$

আর এরপরেই আসে সেই বিদ্রোহী কৌশলটা। নিউটন বললেন  $O\dot{x}$  অনেক ছোট।  $(O\dot{x})^2$  সে তুলনায় আরও অনেক অনেক ছোট। এটি রাশিমালা থেকে উধাও হয়ে যাবে। মূলত এটা শূন্য এবং উপেক্ষণীয়। তাহলে থাকে:

$$O\dot{y} = 2x(O\dot{x}) + 1(O\dot{x})$$

তার মানে  $O\dot{y}/O\dot{x} = 2x + 1$ , যা কার্ভটির যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখার ঢাল (চিত্র ২৬)। অসীম ক্ষুদ্র সময়কাল  $O$  সমীকরণ থেকে ঝরে যায়।  $O\dot{y}/O\dot{x}$  হয়ে যায়  $\dot{y}/\dot{x}$ ।  $O$  নিয়ে আর ভাবারই দরকার নেই।

এ কৌশলে মেলে সঠিক উত্তর। কিন্তু রাশি উধাও করে দেওয়ার ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। নিউটনের কথা অনুসারে  $(Ox)^2$ ,  $(Ox)^3$ ,  $Ox$  এর উচ্চঘাতগুলো যদি শূন্য-ই, তবে তো  $Ox$  নিজেও শূন্য হবে<sup>৩</sup>। অন্যদিকে,  $Ox$  শূন্য হলে শেষের দিকে আমরা যে  $Ox$  দিয়ে ভাগ দিয়েছি সেটা আসলে শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়ার-ই নামান্তর। একই কথা খাটে একদম শেষ ধাপের ক্ষেত্রে। এখানেও  $Oy/Ox$  ভগাংশের হর ও লব থেকে  $O$ -কে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা শূন্য দিয়ে ভাগ দিয়েছি। শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়া গাণিতিক যুক্তিতে নিষিদ্ধ কাজ।

চিত্র ২৬:  $y=x^2+x+1$  পরাবৃত্তের কোনো বিন্দুতে ঢাল বের করতে হলে  $2x + 1$  ব্যবহার করতে হবে।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতি ছিল খুবই বিভ্রান্তিকর। এটা করতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে একটি অবৈধ গাণিতিক প্রক্রিয়ার। কিন্তু এর ছিল বিশাল এক সুবিধা। এ পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর। ফ্লুক্সোন পদ্ধতি সমাধান করেছে স্পর্শকের সমস্যা। সমাধান করেছে ক্ষেত্রফলের সমস্যাও। কোনো কার্ভ বা রেখা দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে করতে হবে ব্যাবকলনের বিপরীত কাজ। যাকে আমরা বলি যোগজীকরণ (integration)।  $y = x^2 + x + 1$  সমীকরণক ব্যাবকলন করলে স্পর্শকের ঢাল  $2x + 1$  পাওয়া যায়। তেমনি  $2x + 1$  কে যোগজীকরণ করলে কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র পাওয়া যায়। এ সূত্র হলো  $y = x^2 + x + 1$ । দুটি সীমা  $x = a$  এবং  $x = b$  এর মধ্যে কার্ভটির ক্ষেত্রফল হবে  $(b^2 + b + 1) - (a^2 + a + 1)$  (চিত্র ২৭)। (সঠিক করে বললে সূত্রটা আসলে  $y = x^2 + x + c$ ), যেখানে  $c$  একটি ইচ্ছামূলক (arbitrary) ধ্রুবক। ব্যাবকলনের মাধ্যমে তথ্য হারিয়ে যায়। আর তাই যোগজীকরণ একদম নিখুঁত ফল দিতে পারে না। তা পেতে হলে দুটি সীমার  $(a, b)$  মান দিয়ে দিতে হবে।)

ক্যালকুলাস হলো দুটি উপকরণের সমাবেশ: যোগজীকরণ ও অন্তরীকরণ। হ্যাঁ, শূন্য ও অসীম নিয়ে খেলতে গিয়ে নিউটন গণিতের কিছু নিয়ম ভেঙেছেন। কিন্তু ক্যালকুলাস ছিল মারাত্মক শক্তিশালী এক অস্ত্র। কোনো গণিতবিদই একে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

প্রকৃতি কথা বলে সমীকরণের ভাষায়। অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার। গণিতের নিয়ম তৈরি হয়েছিল ভেড়া গুনতে আর জমির পরিমাপ করতে গিয়ে। আবার এই নিয়মগুলো দিয়েই চলে মহাবিশ্বের কাজ। প্রাকৃতিক সূত্রের প্রকাশ পায় গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে। আর সমীকরণ এক অর্থে একটি যন্ত্র। যাতে একটি সংখ্যা দিলে আরেকটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। প্রাচীনকালেও মানুষ সমীকরণের কিছু নিয়ম জানত। যেমন লিভার বা চাপযন্ত্রের সূত্র। তবে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা হলে একের পর সূত্রের আবির্ভাব হতে থাকল। কেপলারের তৃতীয় সূত্রের কথাই ধরুন। এ থেকে জানা যায়, গ্রহরা কক্ষপথে পুরো ঘুরে আসতে কত সময় লাগবে। এ সময়টা হলো  $r^3/t^2 = k$ , যেখানে  $t$  হলো সময়, দূরত্ব  $r$  এবং  $k$  একটি ধ্রুবক।

১৬৬২ সালে রবার্ট বয়েল দেখান, আবদ্ধ পাত্রের গ্যাসে বাইরে থেকে চাপ দিলে ভেতরে চাপ বাড়বে। মজার ব্যাপার হলো চাপ  $p$  ও আয়তন  $v$ -এর গুণফল সবসময় ধ্রুব থাকে।  $p v = k$  যেখানে  $k$  ধ্রুবক। ১৬৭৬ সাল। রবার্ট হুক দেখেন স্প্রিংয়ের বল  $f$  পাওয়া যায় ঋণাত্মক ধ্রুবক  $(-k)$  কে দূরত্ব  $x$  দিয়ে গুণ করে। মানে  $f = -kx$ , যেখানে  $x$  হলো স্প্রিংকে টেনে যতটা বাড়ানোর পরিমাণ। প্রথমদিকের এই সমীকরণ-সূত্রগুলো দিয়ে সরল সম্পর্ক খুব দারুণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু সমীকরণের আছে সীমাবদ্ধতা। এদের অপরিবর্তনীয়তাই এদের সার্বজনীন সূত্র হওয়ার পথে বাধা।

চিত্র ২৭:  $2x+1$  রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মান পেতে  $x^2 + x + 1$  ব্যবহার করতে হবে।



উদাহরণ হিসেবে স্কুলজীবনে পড়ে আসা একটা বিখ্যাত সমীকরণ দেখা যাক। এটা থেকে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট (constant) বেগ  $v$  নিয়ে চললে  $t$  সময় পরে কত দূর ( $x$ ) পৌঁছতে পারবেন। সে দূরত্বটা হলো  $x = vt$ । প্রতি ঘণ্টায় অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যাবে দূরত্ব। এক শহর থেকে আরেক শহরে নির্দিষ্ট বেগে যেতে কত সময় লাগবে তা বের করতে এ সমীকরণ দারুণ কার্যকর। যেমন ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে চললে ৬০ মাইল যেতে সময় লাগবে ৩০ মিনিট। কিন্তু বাস্তবে কয়টা জিনিস নির্দিষ্ট বেগে চলে? উপর থেকে একটি বল ছেড়ে দিলে এর বেগ ক্রমেই বাড়বে। এক্ষেত্রে  $x = vt$  সূত্র একদম ভুল। (স্থিরাবস্থা থেকে) পতিত বলের ক্ষেত্রে সূত্র হবে  $x = gt^2/2$ , যেখানে  $g$  হলো মহাকর্ষীয় ত্বরণ। আবার বলের ওপর ক্রমেই বেশি বল (এবং সে কারণে ত্বরণ, মানে বেগের বৃদ্ধি) প্রয়োগ করলে  $x$  হবে  $t^3/3$ -এর মতো কিছু। বেগকে সময় দিয়ে গুণ করে দূরত্ব পাওয়া সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। সকল ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা চলে না।

নিউটন ক্যালকুলাস দিয়ে এ সূত্রগুলোকে জোড়া দিয়ে এক গুচ্ছ সূত্র বানালেন, যেগুলো সকল অবস্থায় ও সকল ক্ষেত্রে কাজ করে। এই প্রথম বিজ্ঞান সাক্ষাৎ পেল সার্বজনীন সূত্রের। যে সূত্র ছোট ছোট আংশিক সূত্রগুলোর পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ায়। শূন্য ও অসীমের কারণে গণিতবিদরা জানতেন, ক্যালকুলাসের গভীরে লুকিয়ে আছে ক্রটি। তবুও তাঁরা সহজেই নতুন এই হাতিয়ার লুফে নিলেন। সত্য কথা হলো, প্রকৃতি সাধারণ সমীকরণের ভাষায় নয়, কথা বলে অন্তরকীয় সমীকরণের (differential equation) ভাষায়। আর অন্তরকীয় সমীকরণ উপস্থাপন ও সমাধানের হাতিয়ারই হলো ক্যালকুলাস।

অন্তরকীয় সমীকরণ আমাদের চেনাজানা আর দশটা সমীকরণের মতো নয়। সাধারণ সমীকরণ হলো যন্ত্রের মতো। এতে একটি সংখ্যা দিলে ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সংখ্যা। অন্তরকীয় সমীকরণও যন্ত্রের মতোই। তবে এক্ষেত্রে যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয় সংখ্যার বদলে সমীকরণ। আর যন্ত্র ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সমীকরণ। সমস্যার অবস্থার বিবরণ দেওয়া সমীকরণ দিলে (যেমন বল প্রব বেগে চলছে কিনা বা বলের ওপর কোনো বল (force) প্রযুক্ত হলো কিনা) পাওয়া যাবে কাজীকৃত উত্তরের সমীকরণ (যেমন বল সরলরেখা বা পরাবৃত্ত পথে চলছে)। একটিমাত্র অন্তরকীয় সমীকরণ অগণিতসংখ্যক সমীকরণ-সূত্র নিয়ন্ত্রণ করে। আবার অন্য সমীকরণ-সূত্রের মতো এরা কখনও সত্য আবার কখনও মিথ্যা নয়। এরা সর্বদাই সত্য। সার্বজনীন সূত্র। এ যেন প্রকৃতির কলকজা পর্যবেক্ষণ।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতির ক্যালকুলাস কাজটা করল অবস্থান, বেগ ও ত্বরণের মতো জিনিসগুলোকে জোড়া দিয়ে। অবস্থানকে  $x$  চলক দিয়ে প্রকাশ করেই তিনি বুঝলেন বেগ আসলে ফ্লুক্সোন ছাড়া কিছুই নয়। এই ফ্লুক্সোনকেই আধুনিক গণিতে  $x$  এর ডেরিভেটিভ (derivative) বা অন্তরক ( $\dot{x}$ ) বলে। আর ত্বরণ ( $\ddot{x}$ ) বেগের ( $\dot{x}$ ) অন্তরক ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্থান থেকে বেগ ও সেখান থেকে ত্বরণে যাওয়া আর আবার উল্টো দিকে ফিরে আসার জন্য অন্তরীকরণ (ডট বাড়ানো) ও যোগজীকরণ (ডট কমানো) করে যেতে হবে। এই চিহ্ন দিয়েই নিউটন একটিমাত্র সরল অন্তরকীয় সমীকরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সব বস্তুর গতি প্রকাশ করে ফেলেন। সমীকরণটা হলো  $F = m\ddot{x}$ , যেখানে  $F$  হলো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল আর  $m$  সে বস্তুর ভর। (অবশ্য এটা সে অর্থে সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। বস্তুর ভর প্রব থাকলেই কেবল এটা সত্য। নিউটনের সূত্র আরও সাধারণ সংস্করণ হলো  $F = \dot{p}$ , যেখানে  $p$  হলো বস্তুর ভরবেগ (momentum) পরে আইনস্টাইন নিউটনের সূত্রে আরও পরিমার্জন করেন।) আপনার কাছে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সমীকরণ থাকলে অন্তরকীয় সমীকরণ বলে দেবে সে বস্তুটা ঠিক কীভাবে চলাচল করবে। যেমন মুক্তভাবে পড়ন্ত বল পরাবৃত্ত পথে চলবে। আবার ঘর্ষণহীন স্প্রিং এদিক-ওদিক দোল খাবে চিরকাল। আর ঘর্ষণ থাকলে স্প্রিং ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যাবে (চিত্র ২৮)। এ ফলাফলগুলোকে আলাদা আলাদা মনে হলেও এরা একই অন্তরকীয় সমীকরণ মেনে কাজ করে।

আবার একইভাবে বস্তুটা কীভাবে চলছে তা জানলেই অন্তরকীয় সমীকরণ আপনাকে বলে দেবে কী ধরনের বল তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুটা বল হোক আর গ্রহ হোক তাতে কোনো তফাৎ নেই। (নিউটনের সাফল্য ছিল মহাকর্ষ বলের

সমীকরণ দিয়ে গ্রহদের কক্ষদের আকৃতি বের করা। মানুষ ধারণা করেছিল এই বল  $1/r^2$  এর সমানুপাতিক হবে। পরে দেখা গেল, নিউটনের সমীকরণ থেকে উপরন্ত বেরিয়ে আসছে। এতে মানুষ নিউটনকে সঠিক বলে মেনে নিল।) ক্যালকুলাসের এত ক্ষমতা প্রদর্শনের পরেও মূল সমস্যা থেকেই গেল। নিউটনের কাজের ভিত্তিটা ছিল খুব নড়বড়ে। শূন্য দিয়ে ভাগ। একই সমস্যা ছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দীর কাজেও।

### চিত্র ২৮: একই অন্তরকীয় সমীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন গতি

১৬৭৩ সাল। এক বিখ্যাত জার্মান আইনজীবী ও দার্শনিক লন্ডন সফরে যান। তাঁর নাম গটফ্রিড উইলহেলম লিবনিজ। তিনি এবং নিউটন বিজ্ঞান জগতকে দুটি পক্ষে বিভক্ত করে ফেলেন। তবে দুজনের কেউই ক্যালকুলাসের শূন্যের সমস্যা সমাধান করতে পারেননি।

লন্ডন ভ্রমণের সময় তেত্রিশ বছর বয়সী লিবনিজ নিউটনের অপ্রকাশিত কাজ দেখেছিলেন কি না তা কেউ জানে না। ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ সালের মধ্যে লিবনিজ আবারও লন্ডন যান। এসময় তিনিও ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। তবে সেটার চেহারা-সুরত খানিক আলাদা।

একটু ভাবলে বোঝা যায়, লিবনিজ স্বতন্ত্রভাবেই ক্যালকুলাসের নিজস্ব সংস্করণ বানিয়েছিলেন। যদিও ব্যাপারটা এখনও বিতর্কের বিষয়। ১৬৭০-এর দশকে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল। ফলে কে কাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন তা বোঝা মুশকিল। দুই তত্ত্বেরই ফলাফল একই। তবে চিহ্ন ও দর্শন পুরোপুরি আলাদা।

নিউটন তাঁর ফ্লুক্সোন সমীকরণের অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র  $o$  রাশিগুলোকে অপছন্দই করতেন। যারা কখনও শূন্য আবার কখনও অশূন্যের মতো আচরণ করত। এক অর্থে এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশিরা ছিল অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র। চিন্তনীয় যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়েও ছোট। তবুও কীভাবে যেন আবার শূন্যের চেয়ে বড়। সে সময়ের গণিতবিদদের কাছে এ এক অদ্ভুত ধারণা। নিউটন নিজেও তাঁর সমীকরণের এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশি নিয়ে ছিলেন বিব্রত। তিনি এ সমস্যাকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। তাঁর হিসাবের মাঝখানেই শুধু এ  $o$  গুলো আসত। হিসাবের শেষ দিকে উধাও হয়ে যেত অলৌকিকভাবে। ওদিকে লিবনিজ যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের মধ্যেই আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছেন। নিউটন যেখানে লিখেছেন  $Ox$ , লিবনিজ সেখানে লিখেছেন  $dx$ , আর অর্থ  $x$  এর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশ। লিবনিজের হিসাব-নিকাশের পুরো অংশেই এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রা অপরিবর্তিতভাবে টিকে আছে। এবং  $x$ -এর সাপেক্ষে  $y$ -এর অন্তরক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশি থেকে মুক্ত অনুপাত ফ্লুক্সোন  $y/x$  নয়। এটা বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপাত  $dy/dx$ ।

লিবনিজের ক্যালকুলাসের সাহায্যে এ  $dy$  ও  $dx$  নিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করা যেত অন্য সাধারণ সংখ্যার মতোই। এ কারণেই আধুনিক গণিতবিদ ও পদার্থবিদরা নিউটনের চিহ্নের বদলে লিবনিজের প্রতীক ব্যবহার করেন। লিবনিজের ক্যালকুলাসের ক্ষমতাও নিউটনের ক্যালকুলাসের মতোই। তবে প্রতীকের সুবিধার কারণে বলা চলে—একটুখানি বেশি। এত কিছুর পরেও, গণিতের অভ্যন্তরে সমস্যা থেকেই গেল। লিবনিজের অন্তরকেও  $o/o$  দিয়ে ভাগের মতো নিষিদ্ধ কাজ আছে। যে কাজ বিতর্কিত করেছিল নিউটনের ফ্লুক্সোনকে। এ সমস্যা না দূর করা পর্যন্ত ক্যালকুলাস যুক্তির ভিত্তির বদলে দাঁড়িয়ে থাকবে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। (আসলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা আবিষ্কারের সময়ও লিবনিজের মনে বিশ্বাস দৃঢ়ই ছিল। যেকোনো সংখ্যাকে এক গুচ্ছ  $0$  ও  $1$  দিয়ে লেখা যায়। তাঁর কাছে এটাই ছিল *creation ex nihilo* (ক্রিয়েশিও এক্স নিহিলো) বা শূন্য থেকে সৃষ্টি। তাঁর মতে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে  $1$  (ঈশ্বর) ও  $0$  (ভয়েড বা শূন্যতা) থেকে। লিবনিজ এমনকি এ চেষ্টা করেছিলেন যেন জেসুইটরা এই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে চীনাাদের খৃষ্টান বানায়।)

ক্যালকুলাসকে এই মরমি ভিত্তি থেকে মুক্ত করতে গণিতবিদদের বহু বছর লেগে যায়। কারণ তারা ক্যালকুলাসের আবিষ্কার নিয়ে বিতর্ক করে সময় পার করছিলেন।

ভাবনাটা যে নিউটনের মাথায়ই প্রথম এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটা ১৬৬০-এর দশকের কথা। তবে তিনি সে কাজ প্রকাশ করেননি ২০ বছর পর্যন্ত। নিউটন ছিলেন জাদুকর, ধর্মতাত্ত্বিক, আলকেমিস্ট ও বিজ্ঞানী (বাইবেলের লেখা থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমন হবে ১৯৪৮ সালে)। তবে তাঁর অনেক কথাই ছিল প্রচলিত ধর্মবিরোধী। এ কারণে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অনিচ্ছুক ছিলেন গবেষণা প্রকাশের ব্যাপারে। ওদিকে নিউটনের চুপচাপ বসে থাকার মধ্যেই লিবনিজ নিজের মতো করে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। কদিন না যেতেই একে অপরের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনেন। ইংরেজ গণিত সম্প্রদায় নিউটনকে সমর্থন দিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহাদেশের লিবনিজপন্থী অন্য গণিতবিদদের থেকে। এর ফলে ইংরেজরা নিউটনের ফ্লুয়েন্সে ডুবে রইলেন। গ্রহণ করলেন না লিবনিজের উন্নত প্রতীক। ফলে তারা আবেগের বশে মহাদেশের অন্য গণিতবিদদের চেয়ে পিছিয়ে গেলেন ক্যালকুলাসের চর্চা ও অগ্রগতিতে।

ক্যালকুলাসকে আচ্ছন্ন করে রাখা শূন্য ও অসীমের সমস্যার মোকাবেলায় ইংরেজ কেউ এগিয়ে এলেন না। এলেন এক ফরাসী। প্রথম ক্যালকুলাস পড়তে গেলেই গণিতবিদরা লোপিটালের নাম জানতে পারেন। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যে নামে লোপিটালের নাম জড়িয়ে আছে, তা কিন্তু তাঁর আবিষ্কার নয়।

লোপিটালের জন্ম ১৬৬১ সালে। পুরো নাম গিয়ম ফ্রাসোয়া আতৌয়া ডে লোপিটাল। অভিজাত ঘরের সন্তান লোপিটাল ছিলেন খুব ধনী। জীবনের শুরুতেই গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাটিয়েছেন। ছিলেন অশ্বদলের ক্যাপ্টেন। তবে শীঘ্রই ফিরে আসেন তাঁর মূল ভালবাসা গণিতের কাছে। টাকা দিয়ে সবচেয়ে ভাল যে শিক্ষক পাওয়া যায় তাই বেছে নিয়েছেন লোপিটাল। নাম জোহান বার্নুলি। সুইশ গণিতবিদ ও লিবনিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্যালকুলাসের প্রাথমিক যুগের একজন বিশেষজ্ঞ। ১৬৯২ সালে বার্নুলি লোপিটালকে ক্যালকুলাস শেখান। নতুন এ গণিত লোপিটালকে মুগ্ধ করে। বার্নুলির নতুন গণিতের সব আবিষ্কার তাকে দেওয়ার ও ব্যবহার করার জন্য লোপিটাল বার্নুলিকে রাজি করান। বিনিময়ে দেন অর্থ। এর ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় একটি টেক্সট বই। ১৬৯৬ সালে লোপিটাল ক্যালকুলাস নিয়ে প্রথম টেক্সট বই লেখেন। নাম *Analyse des Infiniment Petits*, যার বাংলা অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের বিশ্লেষণ। এর মাধ্যমেই ইউরোপের বড় অংশ লিবনিজীয় ক্যালকুলাসের সাথে পরিচিত হয়। এ বইয়ে লোপিটাল ক্যালকুলাসের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেননি, উল্লেখ করেছেন নতুন দারুণ ফলাফলও। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসটার নাম লোপিটালের নিয়ম (l'Hôpital's rule)।

এ নিয়ম প্রথমেই আঘাত করে ক্যালকুলাসের সর্বত্র উদয় হওয়া ঝামেলায় রাশি ০/০-কে। একটি গাণিতিক ফাংশনের মান কোনো বিন্দুতে ০/০-এর দিকে যেতে থাকলে তার প্রকৃত মান বের করার একটি উপায় বলে দেয় নিয়মটি। নিয়মটি বলে, এরকম ভগ্নাংশের মান পেতে হলে লবের অন্তরককে হরের অন্তরক দিয়ে ভাগ দিতে হবে।<sup>৪</sup> যেমন ধরুন  $x/\sin x$  রাশিটি। মান  $x = 0$  হলে লব শূন্য। আবার হরও শূন্য ( $\sin 0 = 0$ )। ফলে রাশিটির মান হয় ০/০। তবে হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায়  $1/\cos x$ । কারণ  $x$  এর অন্তরক ১ এবং  $\sin x$  এর অন্তরক  $\cos x$ ।  $x = 0$  হলে  $\cos x$  এর মান হয় ১। অতএব, রাশিটি হয়  $1/1 = 1$ । একটু বুদ্ধি খাটালেই হোপিটালের নিয়ম অন্য অদ্ভুত রাশিগুলোর মানও দিয়ে দেয়। এই যেমন  $\infty/\infty$ ,  $0^0$ ,  $0^\infty$  এবং  $\infty^0$ । এ সবগুলো রাশি থেকেই (বিশেষভাবে ০/০) আপনার ইচ্ছামতো মান পেতে পারবেন। এটা নির্ভর করবে লব ও হরের ফাংশনের ওপর। এ কারণেই ০/০-কে অনির্ণেয় বলে। এটা আর পুরোপুরি রহস্যের চাদরে ঢাকা থাকল না। খুব সাবধানে ০/০-এর দিকে এগোলে গণিতবিদরা এর কিছু তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছেন। শূন্য আর এমন কোনো শত্রু নয়, যাকে এড়িয়ে চলতে হবে। এটা চর্চা করার মতোই একটা ধাঁধা।

১৭০৪ হোপিটাল মারা যান। বার্নুলি এবার বলতে শুরু করলেন, হোপিটাল তাঁর কাজ চুরি করেছেন। সে সময় গণিত সমাজ এ দাবি উড়িয়ে দেন। হোপিটাল নিজেকে সক্ষম গণিতবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ওদিকে বার্নুলির আবার তক্ষণ ভাবমূর্তি খুব খারাপ। এর আগে তিনি আরেক গণিতবিদের প্রমাণ নিজের বলে দাবি করেছিলেন (অন্য গণিতবিদ আর কেউ নন, ছিলেন তাঁরই ভাই জ্যাকব বার্নুলি।) তবে এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর দাবির সত্যতা মেলে। হোপিটালের সাথে তাঁর যোগাযোগের ধরন থেকে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয়। তবে দূর্ভাগ্য তাঁর। ততদিনে হোপিটালের নাম নিয়মটার সাথে জড়িয়ে গেছে।

০/০ বিষয়ক বেশ কিছু সমস্যার সমাধানে হোপিটালের নিয়ম দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল সমস্যা থেকে গেল। নিউটন ও লিবনিজের ক্যালকুলাস শূন্য দিয়ে ভাগের ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল এমন সংখ্যারও ওপর, যাদেরকে বর্গ করলে উধাও হয়ে যায়। লোপিটালের নিয়ম ০/০ -এর সমস্যা নিয়ে কাজ করে এমন হাতিয়ার দিয়ে যা নিজেই ০/০ কে দিয়ে তৈরি। এটা একটি বৃত্তাকার যুক্তি। একদিকে পুরো পৃথিবীর গণিত ও পদার্থবিদরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে ক্যালকুলাসের ব্যবহার শুরু করেছেন। অপরদিকে প্রতিবাদের ধ্বনি ধেয়ে আসল গির্জা থেকে।

১৭৩৪ সাল। নিউটনের মৃত্যুর বহু বছর পরের কথা। আইরিশ বিশপ জর্জ বার্কলি *দ্য অ্যানালিস্ট* নামে একটি বই লেখেন। বইটির অপর নাম *অ্যা ডিসকোর্স অ্যাড্রেসড টু অ্যান ইনফিডেল ম্যাথেম্যাটিশিয়ান*। (ইনফিডেল বা অবিশ্বাসী বলতে খুব সম্ভব এডমন্ড হ্যালিকে বোঝানো হয়েছিল, যিনি সবসময় ছিলেন নিউটনপন্থী।) *দ্য অ্যানালিস্ট* বইয়ে তিনি নিউটনের (ও লিবনিজের) শূন্য নিয়ে কুটকৌশলের তীব্র সমালোচনা করেন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে তিনি আখ্যা দেন 'মৃত রাশির ভূত'। এছাড়া দেখান, এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশিগুলোকে এত সহজে মুক্তি দিলে অসঙ্গতি তৈরি হয়। এরপর কথার ইতি টানেন এভাবে, "আমি মনে করি, যে বা যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফ্লুক্সোন বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবধান মেনে নিতে পারে, তার ঈশ্বরের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই।"

সমসাময়িক গণিতবিদরা বার্কলির যুক্তির সমালোচনা করেন। তবে তাঁর যুক্তি ছিল পুরোপুরি সঠিক। ধরুন কেউ দেখাতে চান ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি। ইউক্লিডের কিছু সূত্র সাবধানে ধাপে ধাপে কাজে লাগিয়ে একজন গণিতবিদ সেটা সহজেই দেখাতে পারবেন। অন্য কোনো জ্যামিতিক সত্যও এভাবে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু ক্যালকুলাসের ব্যাপারটা উল্টো। এটা ছিল পুরোপুরি বিশ্বাস-নির্ভর।

বর্গ করলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশিগুলো নেই হয়ে যায় কেন তার ব্যাখ্যা নেই কারও কাছে। সবাই এটা মেনে নিয়েছেন। কারণ একটাই: ঠিক সময়ে এদেরকে উধাও করে দিলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়। শূন্য দিয়ে ভাগ করা নিয়ে কারও আপত্তি নেই, কারণ সুবিধাজনকভাবে গণিতের নিয়ম উপেক্ষা করে পড়ন্ত আপেল থেকে আকাশে গ্রহদের কক্ষপথ-- সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল। তবে উত্তর সঠিক হলেও ক্যালকুলাস ছিল ঈশ্বরকে মানার মতোই বিশ্বাস-নির্ভর কাজ।

## মরমিবাদের ইতি

একটি রাশি হয় অশূন্য (কিছু একটা) হবে নাহয় শূন্য হবে। অশূন্য হওয়া মানে এটা এখনও টিকে আছে। শূন্য হলে এটা নেই হয়ে যাবে। এ দুটোর মাঝে কিছু থাকার দাবি উদ্ভট এক কল্পনা।

--জঁ বাটিস্ট ড্যালামবেয়ার

ফরাসি বিপ্লবের তলে তলে ক্যালকুলাস থেকে মরমিবাদ বিদায় নিল। ভিত্তিটা নড়বড়ে হলেও আঠারো শতকের শেষ দিকে পুরো ইউরোপের গণিতবিদরা নতুন এ হাতিয়ার দিয়ে অসাধারণ সব সাফল্য পাচ্ছিলেন। মহাদেশের অন্য অংশ

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সময়ের সেরা ব্রিটিশ গণিতবিদ সম্ভবত কলিন ম্যাকলরিন ও ব্রুক টেইলর। ক্যালকুলাস ব্যবহার করে তাঁরা বিভিন্ন ফাংশনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। যেমন গণিতবিদরা বুঝলেন, ক্যালকুলাসের কিছু কৌশল খাটিয়ে  $1/(1-x)$  ফাংশনকে লেখা যায় এভাবে:  $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$

দুই রাশিকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হলেও তারা পুরোপুরি একই (কিছু শর্ত সাপেক্ষে)।

শর্তগুলোর উৎপত্তি অসীম ও শূন্য থেকে। তবে শর্তগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অসীম ও শূন্যের মাধ্যমে এত সহজ রূপান্তর সুইশ গণিতবিদ লিওনহার্ট অয়লারকে ব্যাপারটা উৎসাহী করে তোলে। টেইলর ও ম্যাকলরিনের মতো একই যুক্তি দেখিয়ে তিনি 'প্রমাণ করেন'

$$\dots 1/x^3 + 1/x^2 + 1/x + 1 + x^2 + x^3 + \dots$$

ধারাটির সমষ্টি শূন্য। (নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কিছু একটা ঝামেলা আছে। পরীক্ষা করে দেখতে  $x = 1$  বসিয়ে দেখুন কী হয়।) গণিতবিদ হিসেবে অয়লার ছিলেন অসাধারণ। গণিত চর্চায় তাঁর সমকক্ষ কম লোকই আছেন। গণিতের সেরা প্রভাবশালীদের কাতারেও আছেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে শূন্য ও অসীমকে অসাবধানে ব্যবহার করতে গিয়ে পথ হারান তিনি।

ক্যালকুলাসের শূন্য ও অসীম শেষ পর্যন্ত বশীভূত হয় বেওয়ারিশ হিসেবে বেড়ে একটা এক শিশুর কাছে। মরমিবাদ আলাদা হয় গণিত থেকে। ১৭১৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসের জঁ বাটস্ট লে রঁ গির্জার সিঁড়িতে একটি শিশুকে খুঁজে পাওয়া যায়। শিশুর নাম রাখা হয় জঁ লে রঁ। শেষ পর্যন্ত তিনি ড্যালামবেয়ার নাম গ্রহণ করেন। নিঃস্ব এক খেটে-খাওয়া দম্পতি তাঁকে লালন-পালন করেন। তারা পালক পিতা ছিলেন দরজা-জানালায় কাচের কারিগর। পরে জানা গিয়েছিল, বাবা ছিলেন জেনারেল আর মাও অভিজাত এক মহিলা।

সাধারণ জ্ঞানের বিখ্যাত একটি বিশ্বকোষ রচনার জন্য তিই সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান। সহলেখক ডেনি ডিডেরোর সাথে মিলে ২০ বছরে কাজটা করেছিলেন তিনি। তবে ড্যালামবেয়ার নিছক বিশ্বকোষ লেখক ছিলেন না। ড্যালামবেয়ারই বুঝতে পারেন, ভ্রমণ ও গন্তব্য দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই গণিতের লিমিটের ধারণার প্রবর্তক। সমাধান করেন ক্যালকুলাসের লিমিটের সমস্যা।

আবার ফিরে যাই অ্যাকিলিজ ও কচ্ছপের গল্পে। যেখানে অ্যাকিলিজকে অসীম ধাপ পার হতে হয়। প্রতিটি ধাপের দৈর্ঘ্য ক্রমেই শূন্যের কাছে যায়। অসীম যোগফল নিয়ে কাজ করতে গিয়েই অসঙ্গতিপূর্ণ ফল পাচ্ছিলেন গণিতবিদরা। অ্যাকিলিজের সমস্যা, কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা গাণিতিক ফাংশনের বিকল্প রূপ—সবগুলোতেই একই সমস্যা।

ড্যালামবেয়ার বুঝলেন, প্রতিযোগিতায় লিমিট বিবেচনা করলে অ্যাকিলিজের সমস্যা দূর হয়ে যায়। অ্যাকিলিজের সমস্যায় (১০ নং ছবি) আমরা দেখি, প্রতিটি ধাপে অ্যাকিলিজ ক্রমেই দুই ফুট লক্ষ্যের কাছাকাছি হচ্ছেন। কোনো ধাপই তাকে আগের চেয়ে পিছিয়ে দেয় না, বা রাখে না আগের জায়গায়ই। প্রতি মুহূর্তে সে যায় আরও সামনে। তার মানে প্রতিযোগিতার লিমিট বা চূড়ান্ত গন্তব্য হলো দুই ফুটের দাগ। ঠিক এখানেই অ্যাকিলিজ কচ্ছপকে পার হয়ে যায়।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার লিমিট যে আসলেই দুই ফুট তা কীভাবে প্রমাণ করবেন? আমাদের চ্যালেঞ্জ করুন তাহলে। আমাদের একটি দূরত্ব বলুন। দূরত্বটা যত ক্ষুদ্রই হোক, আমি আপনাকে বলে দেব কখন অ্যাকিলিজ এবং কচ্ছপ দুজনেই লিমিট থেকে সেই ক্ষুদ্র দূরত্ব থেকেও কম দূরে আছে।

যেমন হয়ত আপনি আমাকে দেবেন এক ফুটের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। কিছু হিসাব করে আমি বলে দেব, এগারতম ধাপ শেষে অ্যাকিলিজ থাকবে দুই ফুটের লক্ষ্যমাত্রা থেকে এক ফুটের দশ লক্ষ ভাগের ৯৯৭ অংশ দূরে। যেখানে কচ্ছপ থাকবে সে দূরত্বের অর্ধেক দূরে। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি পূরণ করেছি। এক ফুটের দশ লক্ষ ভাগের ২৩ অংশ বেশিই পার হয়েছি। আপনি আমাকে এক ফুটের এক শ কোটি ভাগের এক ভাগ দূরত্ব দিলে কী হবে? ৩১ ধাপ শেষে অ্যাকিলিজ থাকবে লক্ষ্যমাত্রা থেকে এক ফুটের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ দূরে। আর কচ্ছপ আগের মতোই সে দূরত্বের অর্ধেক দূরে। আপনি আমাকে যে চ্যালেঞ্জই দেন, সেটা আমি পূরণ করতে পারব। বলত পারব কত সময় পরে অ্যাকিলিজ দরকারের চেয়েও লক্ষ্যমাত্রার বেশি কাছে থাকবে। এতে বোঝা যায়, প্রতিযোগিতা এগোতে থাকলে অ্যাকিলিজ দুই ফুটের লক্ষ্যমাত্রার ইচ্ছামতো কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রতিযোগিতার লিমিট হলো দুই ফুট।

এখন এ প্রতিযোগিতাকে অসীম অংশের যোগফল না ভেবে সসীম অংশের লিমিট হিসেবে চিন্তা করুন। যেমন প্রথম প্রতিযোগিতায় অ্যাকিলিজ গেল এক ফুটের দাগ পর্যন্ত। তাহলে পথ শেষ হলো

$$১$$

পরের প্রতিযোগিতায় অ্যাকিলিজ গেল প্রথম দুই অংশ। প্রথমে এক ফুট ও পরে অর্ধেক ফুট। তাহলে পথ শেষ হলো

$$১ + ১/২$$

মোট ১.৫ ফুট। তৃতীয় প্রতিযোগিতায় যাবে  $১ + ১/২ + ১/৪$  মোট ১.৭৫ ফুট। প্রতিযোগিতার এ সবগুলো অংশই সসীম ও সুসংজ্ঞায়িত। অসীমের সাথে কখনও দেখা হয় না।

ড্যালামবেয়ার

$$1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + 1/2^n + \dots$$

ধারাটাকে লিখলেন এভাবে:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + 1/2^n)$$

চিহ্নের খুব সামান্য পরিবর্তন। কিন্তু এতেই রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

কোনো রাশিতে অসীম থাকলে বা শূন্য দিয়ে ভাগ থাকলে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মতো সরল গাণিতিক কাজসহ সবকিছু অকার্যকর হয়ে যায়। সবকিছু হয়ে পড়ে অর্থহীন। ফলে কোনো ধারায় অসীম পদ থাকলে যোগ চিহ্নটা (+) পর্যন্ত আর সরল-সোজা থাকে না। ঠিক এ কারণেই অধ্যায়ের শুরুতে দেখা  $১ - ১ + ১ - ১ + \dots$  এর যোগফল একইসাথে ০ ও ১।

তবে ধারার শুরুতে লিমিট চিহ্ন দিয়ে প্রক্রিয়াটাকে লক্ষ্য থেকে আলাদা করা হয়। এভাবে এড়ানো যায় অসীম ও শূন্য। অ্যাকিলিজের প্রতিযোগিতার অংশগুলো যেমন সসীম, এখানেও প্রত্যেকটি আংশিক যোগফল সসীম। আপনি যোগ করতে পারেন, ভাগ করতে পারেন, বর্গ করতে পারেন। যা ইচ্ছা। গণিতের নিয়ম তখনও খাটে। কারণ সবকিছু সসীম।

এ কাজগুলো শেষ হলে নেবেন লিমিট। বের করতে পারবেন রাশিটির গন্তব্য। কখনও আবার লিমিটের অস্তিত্ব থাকে না।  $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$  ধারার লিমিট নেই। আংশিক যোগফলগুলো ১ ও ০-এর মাঝে দোল খেতে থাকে। নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছে না। তবে অ্যাকিলিজের প্রতিযোগিতায় যোগফল এমন: ১ থেকে ১.৫, ১.৭৫, ১.৮৭৫, ১.৯৩৭৫ ইত্যাদি। ক্রমেই কাছাকাছি হচ্ছে ২-এর। যোগফলগুলোর আছে একটি লিমিট, একটি গন্তব্য।

অন্তরকের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। নিউটন ও লিবনিজ ভাগ করেছিলেন শূন্য দিয়ে। কিন্তু আধুনিক গণিতবিদরা ভাগ করেন শূন্যের খুব কাছাকাছি একটি সংখ্যা দিয়ে। ফলে তাঁদের ভাগ সম্পূর্ণ বৈধ। কারণ এত নেই কোনো শূন্য। তারা লিমিট নেন। অন্তরক পেতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের বর্গকে শূন্য ধরে নেই করে ফেলা ও শূন্য দিয়ে ভাগ করার কূটকৌশলের আর দরকার নেই (দেখুন পরিশিষ্ট গ)। এ যুক্তিকেও নিউটনের যুক্তির মতোই মনে হতে পারে। তবে বাস্তবে তা নয়। গাণিতিক যুক্তির কঠোর নীতি এটা মেনে চলে। লিমিটের ধারণার পেছনে আছে দৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ ভিত্তি। লিমিটকে সংজ্ঞায়িত করার অন্য উপায়ও আছে। যেমন একে দুটি সংখ্যার অভিসার ধর্ম হিসেবে দেখানো যায়।  $\lim sup$  ও  $\lim inf$ । (এর দারুণ একটি প্রমাণ আছে। তবে এ বইয়ের ছোট পরিসের সেটা উল্লেখ করলাম না।) অতএব অন্তরকের মাধ্যমে লিমিটকে প্রকাশ করতে কোনো অসুবিধা নেই। এর মাধ্যমে ক্যালকুলাস শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়ার প্রয়োজন ফুরোল। গণিতের জগৎ থেকে বিদায় নিল মরমিবাদ। আবারও জয় হলো গণিত ও যুক্তির। শান্তি টিকল ফরাসি বিপ্লবের রেইন অব টেরর বা ভয়কালীন শাসনামল পর্যন্ত।

### তথ্যনির্দেশ

- ১। স্ববিরোধী বক্তব্য বা দেখতে এক আসলে আরেক এমন জিনিসকে প্যারাডক্স বলে। যেমন, কেউ বলল, "আমি মিথ্যাবাদী।" তাহলে কি লোকটি আসলে মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখকের বই: অসীম সমীকরণ, তাম্রলিপি, ২০১৯।
- ২। নিউটনের বয়স তিন বছর হলে তার মা আবার বিয়ে করে আলাদা হয়ে যান। এরপরে তাদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। না, না, হয়েছে। যেদিন নিউটন তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে ঘরের ভেতরে রেখেই পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে আসেন।
- ৩। দুটি সংখ্যার গুণফল শূন্য হলে তাদের একটি বা দুটিই শূন্য হবে। গাণিতিক ভাষায় বললে,  $ab = 0$  হলে হয়  $a = 0$  বা  $b = 0$  হবে। এর মানে হলো  $a^2 = 0$  হলে  $a = 0$  হবে।
- ৪। এ নিয়ম বুঝতে দেখুন নিচের উদাহরণ।

### চিত্র ২৮.১

এমনিতে এ লিমিটের মান  $0/0$  আসে, যা অনির্ণেয় ও অর্থহীন। হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায়। লিমিটের অর্থ হলো ফাংশনের মান আসলে কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা। এ ফাংশনে  $x$ -এর মান  $(-২)$  এর দিকে যেতে থাকে ফাংশনটা যেতে থাকবে  $(-১)$  এর দিকে। হোপিটালের নিয়ম মান পাওয়া সহজ করে দিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায় অসীমের যমজ [শূন্যের অসীম বৈশিষ্ট্য]

ঈশ্বর পূর্ণসংখ্যা সৃষ্টি করেছেন। বাকি সব মানুষের কর্ম।

-- লিওপোল্ড ক্রোনেকা

শূন্য আর অসীমকে সবসময় সমজাতীয় জিনিস বলে সন্দেহ হত। কোনোকিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ দিন। পাবেন শূন্য। অসীমকে কোনোকিছু দিয়ে গুণ দিলেও শূন্য। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে আসবে অসীম। আর অসীম দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য। কোনো সংখ্যার সাথে শূন্য যোগ করলে তাতে কোনো পরিবর্তন আসে না। অসীমের সাথেও কাউকে যোগ করলে কোনো পরিবর্তন নেই।

রেনেসাঁর সময় থেকেই এ মিলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তবে শূন্যের বড় রহস্য উন্মোচন করতে গণিতবিদদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ফরাসি বিপ্লব শেষ হওয়া পর্যন্ত।

শূন্য আর অসীম একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমান ও বিপরীত। ইন ও ইয়াং<sup>১</sup>। সংখ্যারেখার দুই মাথায় সমশক্তিমান দুই প্রতিপক্ষ। শূন্যের ঝামেলাময় বৈশিষ্ট্য তাল মিলিয়ে চলে অসীমের অদ্ভুত ক্ষমতার সাথে। শূন্যকে বুঝতে পারলেই অসীমকেও বোঝা সম্ভব হয়ে যায়। এটা বুঝতে গিয়ে গণিতবিদদের পা দিতে হয় কাল্পনিক এক অদ্ভুত জগতে। যেখানে বৃত্তরা রেখা, রেখারা বৃত্ত। আর অসীমের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

### কাল্পনিক সংখ্যা

স্বপ্নীয় চেতনার এক দারুণ ও বিস্ময়কর আশ্রয়স্থল। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রায় মিলন যেখানে।

-- গটফ্রিড উইলহেলম লিবনিজ

বহু শতক ধরে গণিতবিদদের অবহেলার পাত্র শূন্য একা হয়নি। শূন্য যেভাবে গ্রিকদের কুসংস্কারের আগুনে পুড়েছে, অন্য সংখ্যাও হয়েছে অবহেলার শিকার। যে সংখ্যাদের ছিল না জ্যামিতিক অর্থ (গ্রিকরা সংখ্যার জ্যামিতিক দিকটাই বুঝত শুধু)। এমন একটি সংখ্যা i। শূন্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের মূলে এ সংখ্যাটারও ভূমিকা আছে।

বীজগণিতের মাধ্যমে সংখ্যাকে বোঝার আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেল। যা গ্রিকদের জ্যামিতিক ধারণা থেকে পুরোপুরি আলাদা। গ্রিকদের মতো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপের বদলে বীজগণিতবিদরা বিভিন্ন সংখ্যার সম্পর্কের সমীকরণের সমাধান খোঁজার পথে হাঁটলেন। যেমন  $4x - 12 = 0$  সরল সমীকরণটির কথা ভাবুন। এ সমীকরণ বলছে ০, ৪ ও ১২-এর সাথে অজানা সংখ্যা x-এর সম্পর্কের কথা। বীজগণিতের ছাত্রের কাজ হলো x-এর মান বের করা। এ সমীকরণে x-এর মান ৩। সমীকরণে x-এর বদলে ৩ বসিয়ে দেখুন সমীকরণ শুদ্ধ হচ্ছে।  $4x - 12 = 0$  সমীকরণের সমাধান বা মূল তাই ৩।

বিভিন্ন চিহ্নকে জোড়া দিয়ে সমীকরণ বানাতে থাকলে অপ্রত্যাশিত জিনিসের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ওপরের সমীকরণে বিয়োগ চিহ্ন (-) উঠিয়ে যোগ চিহ্ন (+) বসিয়ে দিন। পাওয়া যাবে সরল-দর্শন এক সমীকরণ:  $4x + 12 = 0$ । তবে এ সমীকরণের সমাধান (-৩), যা ঋণাত্মক সংখ্যা।



ভারতীয় গণিতবিদরা যখন শূন্যকে গ্রহণ করলেও ইউরোপীয়রা বহু শতক ধরে একে অবজ্ঞা করে গেছেন। একইভাবে প্রাচ্য যখন ঋণাত্মক সংখ্যাকে বুকে টেনে নিল, পশ্চিম তাকেও অবহেলা করতে চাইল। এমনকি সতের শতকে এসেও ডেকার্ট সমীকরণের সমাধান হিসেবে ঋণাত্মক সংখ্যাকে মেনে নিতে রাজি হননি। তিনি এদেরকে নাম দেন নকল সমাধান বা মূল। আর ঠিক এ কারণেই স্থানান্তর ব্যবস্থাকে ঋণাত্মক সংখ্যা পর্যন্ত বর্ধিত করেননি। তবে ডেকার্ট সংকীর্ণ ধারণার পতন যুগের মানুষ। বীজগণিত ও জ্যামিতির মিলনের সফলতার শিকার তিনি। বীজগণিতবিদদের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা অনেক আগেই থেকেই কাজের জিনিস। পশ্চিমের গণিতবিদরাও কাজে লাগিয়েছেন সংখ্যাগুলোকে। সমীকরণ সমাধান করতে গেলে হরদম দেখা মিলছিল ঋণাত্মক সংখ্যার। এমন এক ধরনের সমীকরণ হলো দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণ।

$4x - 12 = 0$  ধরনের সরলরৈখিক সমীকরণ সমাধান করা খুব সহজ। তবে এ ধরনের সমস্যা বীজগণিতবিদদের বেশিদিন ব্যস্ত রাখতে পারল না। তাদের চাই আরও কঠিন সমস্যা। কাজ শুরু করলেন দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে। এ সমীকরণ শুরু হয়  $x^2$  দিয়ে। যেমন  $x^2 - 1 = 0$ । সাধারণ সমীকরণের চেয়ে এরা জটিল। প্রথমত, এদের মূল থাকে দুটি। যেমন  $x^2 - 1 = 0$  এর মূল দুটি হলো ১ ও (-১)। সমীকরণে ১ বা (-১) বসিয়ে দেখুন কী হয়। ফলে সমীকরণে ১ বা (-১) দুটোই কাজ করে।  $x^2 - 1$  থেকে আমরা পাই  $(x + 1)(x - 1)$ , যা থেকে বোঝা যায় ১ বা (-১) বসালে রাশিটা শূন্য হয়।

দ্বিঘাত সমীকরণ সরলরৈখিক সমীকরণের চেয়ে জটিল হলেও এদের মূল বের করার একটি সহজ উপায় আছে। একে বলে দ্বিঘাত সূত্র, যা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা যেকোনো শিক্ষার্থী গুরুত্বসহকারে পড়ে।  $ax^2 + bx + c$  দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হবে  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ । ধনাত্মক চিহ্ন (+) থেকে একটি ও ঋণাত্মক চিহ্ন (-) থেকে পাই আরেকটি মূল। বহু বছর ধরে মানুষ দ্বিঘাত সমীকরণের কথা জানে। নবম শতকের গণিতবিদ আল-খোয়ারিজমি প্রায় সব দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে পারতেন। তবে সম্ভবত তিনি ঋণাত্মক সংখ্যাকে মূল হিসেবে মানতেন না। অবশ্য তাঁর সময়ের পর দ্রুতই ঋণাত্মক সংখ্যাকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে নেন বীজগণিতবিদরা। তবে কাল্পনিক সংখ্যার কথা একটু আলাদা।

সরলরৈখিক সমীকরণে কাল্পনিক সংখ্যা আসে না। তবে দ্বিঘাত সমীকরণে এদের দেখা যেতে থাকল।  $x^2 + 1 = 0$  সমীকরণটার কথা ভাবুন। দেখে মনে হয় কোনো সংখ্যা বসিয়েই এর সমাধান পাওয়া যাবে না। -1, 3, 500 বা 30.24 যাই বসান সমীকরণ সিদ্ধ হবে না<sup>২</sup>। আপনার ইচ্ছামতো যেকোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাই বসান না কেন, এ সমীকরণের মূল পাবেন না। এর চেয়ে করণ কথা হলো, দ্বিঘাত সমীকরণ প্রয়োগ করতে গেলে দুটি অদ্ভুত উত্তর মেলে।  $+\sqrt{-1}$  ও  $-\sqrt{-1}$ ।

দেখে এদের কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। বারো শতকে ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর বলেছিলেন, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নেই। কারণ ঋণাত্মক সংখ্যা বর্গসংখ্যা নয়। ভাস্কর এবং অন্যরা বুঝতে পেরেছিলেন, ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ ধনাত্মক। ২-কে ২ দিয়ে গুণ করলে ৪ হয়। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গও ধনাত্মক। (-২)-কে (-২) দিয়ে গুণ করলেও ৪ হয়। শূন্যের বর্গ শূন্য। ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা ও শূন্য সবাই অঋণাত্মক বর্গ দেয় ফল হিসেবে। পুরো সংখ্যারেখা এই তিনটি সম্ভাবনা দিয়েই পূর্ণ। তার মানে, সংখ্যারেখায় এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে বর্গ করলে ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গকে মনে হচ্ছিল হাস্যকর এক ভাবনা।

ডেকার্ট এ সংখ্যাদের ঋণাত্মক সংখ্যার চেয়েও খারাপ মনে করতেন। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলের একটি তুচ্ছ নামও দেন তিনি: কাল্পনিক সংখ্যা (imaginary number)। এ নামটিই পরে থেকে যায়<sup>৩</sup>। (-১) এর বর্গমূলের প্রতীক এখন  $i$ ।

বীজগণিতবিদরা  $i$ -কে ভালবাসলেন। বাকি প্রায় সবাই একে ঘৃণা করলেন।  $x^3 + 3x + 1$  রাশিটির মতো বহুপদীর সমাধানে কাল্পনিক সংখ্যা দারুণ কাজে লাগল। আসলে  $i$ -কে সংখ্যা হিসেবে মেনে নিলে সব বহুপদী সমাধান করা যায়।  $x^2 + 1$  ভাগ হয়ে হয়  $(x + i)(x - i)$ । সমীকরণের মূল হয়  $i$  ও  $(-i)$ ।  $x^3 - x^2 + x - 1$  এর মতো ত্রিঘাত সমীকরণ ভাগ হয় তিনভাগে।  $(x - 1)(x + i)(x - i)$ ।  $x^4$  দিয়ে শুরু চতুর্ঘাতী রাশি ভাগ হয় চারভাগে।  $x^5$  দিয়ে শুরু পঞ্চঘাতীরা পাঁচ ভাগে।  $n$  ঘাতের বহুপদীরা শুরু হয়  $x^n$  দিয়ে, আর এরা বিভক্ত হয়  $n$  টি আলাদা (অনেকসময় দুই মূল একই হতে পারে। যেমন  $x^2 - 2x + 1 = 0$  বা  $(x-1)^2 = 0$  সমীকরণের দুটি মূলই ১। তবে মূলের সংখ্যা কিন্তু ২-ই।) রাশিতে। একে বলে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য।

ষোলো শতকের শুরু থেকেই গণিতবিদরা  $i$ -যুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করছিলেন। ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাতী সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে তথাকথিত এই জটিল<sup>৪</sup> সংখ্যাদের ব্যবহার চলে আসে। অনেক গণিতবিদ জটিল সংখ্যাকে একটি সুবিধাজনক কল্পনা হিসেবে মেনে নেন। তবে এর মধ্যেই বাকিরা খুঁজে পান ঈশ্বরকে।

লিবনিজ মনে করতেন,  $i$  হলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে এক অদ্ভুত মিলন। অনেকটা যেন তাঁর বাইনারি<sup>৫</sup> সংখ্যার ১ (ঈশ্বর) ও ০ (শূন্যতা) এর মিলন। লিবনিজ  $i$ -কে পবিত্র আত্মার<sup>৬</sup> সাথে তুলনা করেন। দুটোরই অস্তিত্ব অবস্তুগত ও নামে মাত্র মূর্ত। তবে এমনকি লিবনিজও বুঝতে পারেননি,  $i$  সংখ্যাটি একসময় শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক প্রকাশ করবে। অবশ্য সে সম্পর্কের জট খুলতে গণিতে আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি প্রয়োজন হয়েছিল।

## বিন্দু ও প্রতিবিন্দু

এ ধারণাগুলো কত সহজে পরিচিত বৈশিষ্ট্য ও আরও অসীমসংখ্যক জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে তা তখন সহজেই বোঝা যাবে, সাধারণ জ্যামিতি সহজে সহজে যার ঠাঁই খুঁজে পায় না।

-- জঁ ভিক্টর পঁসলে

প্রথম অগ্রগতি ছিল প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি (projective geometry)। শাখাটার জন্ম যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে। ১৭০০ সালের প্রথম দশকের কথা। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, নেদারল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। একের পর এক জোট গড়ছে ও ভাঙছে। বিভিন্ন উপনিবেশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে আঞ্চলিক বিবাদ। দেশগুলো নিউ ওয়ার্ল্ডের (নতুন আবিষ্কৃত অ্যামেরিকা মহাদেশ) সাথে বাণিজ্যিক আধিপত্য ধরে রাখতে লড়ছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধজুড়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে। নিউটন মারা যাওয়ার প্রায় সিকিশতক পরে যুদ্ধ পুরোদমে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন ও রাশিয়া ইংল্যান্ড ও প্রুশিয়ার সাথে লড়ে নয় বছর।

১৭৬৩ সালে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করে। অবসান হয় সাত বছরের যুদ্ধের (যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই দুই বছর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল)। যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ড গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে তার জন্য মূল্যও দিতে হয়। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দুই দেশই নিঃস্ব হয়ে যায়। জর্জরিত হয় ঋণের ভারে। দুটি দেশই তার পরিণতিও ভোগ করে। ঘটে বিপ্লব। সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের এক দশকের কিছু পরে শুরু হয় মার্কিন বিপ্লব। ইংল্যান্ড হারায় তার সবচেয়ে বড় উপনিবেশ। ১৭৮৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন নতুন জন্ম নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের শাসন শুরু করেন। আর ওদিকে শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। চার বছর পরে বিপ্লবীরা ফরাসি রাজার গর্দান কেটে ফেলে।

গ্যাসপা মঞ্জ নামে এক গণিতবিদ রাজার মৃত্যদণ্ড কার্যকরের নথিতে স্বাক্ষর করেন। গ্যাসপা ছিলেন পূর্ণাঙ্গ এক জ্যামিতিক। বিশেষ দক্ষতা ছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে। স্থপতি ও প্রকৌশলীদের ভবন ও যন্ত্র নির্মাণপদ্ধতির পেছনে

অবদান ছিল মঞ্জের। তারা নকশাকে উলম্ব ও অনুভূমিক তলে প্রক্ষেপণ (project) করে। বস্তুটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে সে প্রক্ষেপণে। সামরিক বাহিনীর কাছে মঞ্জের কাজের ছিল বিশেষ গুরুত্ব। তাই কাজের বড় অংশই বিপ্লবী সরকার রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নথি হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী ন্যাপোলিয়নের সরকারও সে ধারা বজায় রাখে।

জঁ ভিক্টর পঁসলে ছিলেন মঞ্জের ছাত্র। ন্যাপোলিয়নের বাহিনীতে প্রকৌশলী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। পঁসলের দূর্ভাগ্য: তিনি বাহিনীতেও ঢুকলেন, আর ন্যাপোলিয়নও যাত্রা করলেন রাশিয়ার দিকে। এটা ১৮১২ সালের কথা।

মস্কো থেকে ফেরার পথে ন্যাপোলিয়নের বাহিনী দুটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। একটি হলো কনকনে শীত। আরেকটি একইরকম ভয়ানক রুশ বাহিনী। এতে বাহিনী অনেক ছোট হয়ে যায়। ক্রাসনয়ের যুদ্ধে পঁসলেকে মৃত ভেবে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যায়। তবে মারা না গেলেও পরে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তিনি। রুশ কারাগারে পঁচতে পঁচতে পঁসলে জ্ঞানের নতুন একটি শাখার সন্ধান পান: প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি।

পঁসলের কাজের মাধ্যমে পনের শতকের শিল্পী ও স্থপতিদের কাজ পূর্ণতা পায়। এই শিল্পীদের মধ্যে আছে ফিলিপো ব্রনেনেলস্কি। আছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যিনি আনুপাতিক আকার (perspective) ধরে রেখে বাস্তব চিত্র আঁকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোনো চিত্রে "সমান্তরাল" রেখারা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে, রেখারা কখনোই মিলিত হবে না। মেঝের বর্গ চিত্রে পরিণত হয় ট্রাপিজয়ডে। সবকিছু মৃদুভাবে বিকৃত হয়। তবে দর্শকের কাছে তা পুরোপুরি নিখুঁত লাগে। অসীম দূরের বিন্দুর বৈশিষ্ট্যই এটা। অসীমে অবস্থিত এক শূন্য।

জোহানেস কেপলার এই ধারণাটা কাজে লাগালেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে চলে। অসীম দূরের ভাবনাকে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলেন। উপবৃত্তের (ellipse) আছে দুটি কেন্দ্র। যাদের নাম ফোকাস বা উপকেন্দ্র (focus)। উপবৃত্ত যত লম্বা হবে, উপকেন্দ্ররা থাকবে তত দূরে। সব উপবৃত্তেরই আছে এ বৈশিষ্ট্য। ধরুন আপনার কাছে উপবৃত্তাকার একটি দর্পণ (আয়না) আছে। এর একটি উপকেন্দ্রে একটি বাতি বসিয়ে তার আলোগুলো আরেক উপকেন্দ্রে মিলিত হবে। উপবৃত্ত যত লম্বাই হোক এ ব্যাপারটা ঘটবেই (চিত্র ২৯)।

মনে মনে কেপলার উপবৃত্তকে অনেক লম্বা করলেন। উপকেন্দ্রদুটিকে নিয়ে গেলেন অনেক অনেক দূরে। এরপর কল্পনা করলেন, একটি অপরটি থেকে অসীম দূরে। দ্বিতীয় উপকেন্দ্র অসীমের এক বিন্দু। হঠাৎ উপবৃত্ত হয়ে গেল পরাবৃত্ত (parabola)। আগের যে রেখারা একটি বিন্দুতে মিলিত হলো তারা এখন হয়ে গেল সমান্তরাল। পরাবৃত্তও তাই এমন এক উপবৃত্ত, যার একটি উপকেন্দ্র আছে অসীমে (চিত্র ৩০)।

### চিত্র ২৯: উপবৃত্তের ভেতরে আলোকরশ্মি

একটি ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে আপনি এটা সহজেই দেখতে পারবেন। একটি অন্ধকার কক্ষে যান। দেয়ালের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে সোজা আলো ফেলুন তাতে। সুন্দর একটি গোল বৃত্ত দেখতে পাবেন। দেয়ালে প্রক্ষেপিত আলো তৈরি করেছে এ বৃত্ত। এবার লাইটের মাথা একটু করে ওপরে উঠাতে থাকুন (চিত্র ৩১)। দেখবেন, বৃত্ত লম্বা হয়ে ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় উপবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। এরপর হঠাৎ দেখবেন, উপবৃত্ত নেই আর। হয়ে গেছে পরাবৃত্ত। ফলে কেপলারের অসীমের বিন্দু থেকে দেখা গেল, পরাবৃত্ত এবং উপবৃত্ত আসলে একই। এর মাধ্যমে সূচনা হয় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির। গণিতবিদরা এখানে দেখেন জ্যামিতিক আকৃতির ছায়া ও প্রক্ষেপণ। এর মাধ্যমে জানা যায় বহু গুপ্ত সত্য। যে সত্য উপবৃত্ত আর পরাবৃত্তের সমতুল্যতার চেয়ে শক্তিশালী। তবে সবকিছুই নির্ভর করে অসীমে অবস্থিত বিন্দুকে মেনে নেওয়ার মধ্যে।

চিত্র ৩০: উপবৃত্তকে বড় করলেই পাওয়া যায় পরাবৃত্ত

চিত্র ৩১: আলো জ্বলে উপবৃত্ত ও পরাবৃত্ত দেখা যায়

জিরার ডেজার্স ছিলেন সতের শতকের ফরাসি স্থপতি। প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির প্রাথমিক এক অগ্রনায়ক তিনি। অসীমের বিন্দু কাজে লাগিয়ে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপপাদ্য প্রমাণ করেন। তবে ডেজার্সের সহকর্মীরা তাঁর লেখার অনেক শব্দ বুঝতে পারেননি। ফলে ধরে নিয়েছিলেন, লোকটা সম্ভবত পাগল হয়ে গেছে। ব্যতিক্রমও আছে। ব্লেজ প্যাসকেলসহ কিছু গণিতবিদ ডেজার্সের কাজ এগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে মানুষ তা ভুলে যায়।

জঁ ভিক্টর পঁসলের কাছে এসবের কোনো গুরুত্ব ছিল না। মঞ্জের ছাত্র হিসেবে পঁসলে কোনো চিত্রকে দুটি তলে প্রক্ষিপ্ত করার কৌশল শিখেছিলেন। আর যুদ্ধবন্দী হিসেবে হাতে ছিল প্রচুর অবসর সময়। কারাগারে বন্দী থাকার সময় তিনি অসীমের বিন্দু পুনরায় আবিষ্কার করেন। একে জোড়া দেন মঞ্জের কাজের সাথে। এর মাধ্যমে হয়ে যান প্রথম প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিক। রাশিয়া থেকে ফেরার সময় সে দেশের একটি অ্যাবাকাস সঙ্গে নিয়ে আসেন। সময়ের তুলনায় যদিও সেটা পুরনো এক অদ্ভুত যন্ত্র। যাই হোক, এর মাধ্যমেই তিনি প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিকে উঁচু শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান<sup>৭</sup>। তবে পঁসলের ধারণাই করতে পারেননি, প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি শূন্যের রহস্যময় বৈশিষ্ট্য বের করে আনবে। কারণ এর জন্য দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি তখনও প্রয়োজন। সেটি হলো জটিল<sup>৮</sup> (সংখ্যার) তল। ধাঁধার এ অংশের জন্য আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে জার্মানিতে।

কার্ল ফ্রিডরিচ গাউসের জন্ম ১৭৭৭ সালে। অল্প বয়সেই মেধার স্বাক্ষর রাখা শুরু করেন তিনি। গণিতের পথচলা শুরু হয় কাল্পনিক সংখ্যার কাজ দিয়ে। তাঁর পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যের প্রমাণ।  $n$  ঘাতের বহুপদীর  $n$  সংখ্যক মূল (সমাধান) আছে। যেমন দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি, ত্রিঘাত সমীকরণের তিনটি, চতুর্ঘাত সমীকরণের চারটি ইত্যাদি। এটা সত্য হবে বাস্তব মূলের পাশাপাশি কাল্পনিক সংখ্যাকেও মূল হিসেবে মেনে নিলে।

জীবনজুড়ে গাউস নানান বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন। বক্রতা নিয়ে তাঁর কাজ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে জটিল সংখ্যাকে লেখচিত্রে উপস্থাপনের মাধ্যমেই গাউস গণিতের নতুন একটি কাঠামো বের করে আনেন।

১৮৩০-এর দশক তখন। প্রতিটি জটিল সংখ্যাকে (যেমন  $-3 + 2i$ ) কার্ভেসীয় ছকে প্রদর্শন করা যায়। জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশকে  $(-3)$  অনুভূমিক ও কাল্পনিক অংশকে উল্লম্ব অক্ষে (২) বসানো যায় (চিত্র ৩২)। এ কাঠামোর নাম জটিল তল। সরল এ কাঠামোই সংখ্যাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কথা বলে দিল। যেমন ধরুন  $i$  সংখ্যাটি।  $i$  ও  $x$ -অক্ষের মধ্যে কোণ ৯০ ডিগ্রি (চিত্র ৩৩)।  $i$ -কে বর্গ করলে কী হবে? সংজ্ঞা অনুসারে,  $i^2 = -1$ , যার সাথে  $x$ -অক্ষের কোণ ১৮০ ডিগ্রি (সরল রেখা)। মানে কোণ দ্বিগুণ হয়েছে।  $i^3$ -এর মান  $-i$ ।  $x$ -অক্ষের সাথে কোণ ২৭০ ডিগ্রি। কোণ হয়েছে তিনগুণ।  $i^4$ -এর মান ১। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরেছি। মূল কোণের চারগুণ (চিত্র ৩৪)। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। যেকোনো জটিল সংখ্যা নিয়ে এর কোণ মাপুন। কোনো সংখ্যার ঘাত  $n$  পর্যন্ত বাড়ানো আর এর কোণকে  $n$  দিয়ে গুণ দেওয়া একই কথা। সংখ্যাটার ঘাত বাড়াতে থাকলে এটি পেঁচিয়ে ভেতরে বা বাইরের দিকে যেতে থাকবে। সেটা নির্ভর করবে সংখ্যাটা একক বৃত্তের (মূলবিন্দুতে ব্যাসার্ধ এক একক বিশিষ্ট বৃত্ত) ভেতরে নাকি বাইরে তার ওপর (চিত্র ৩৫)। জটিল তলে গুণ ও সূচক পেল জ্যামিতিক ধারণা। ব্যাপারগুলো ঘটতে দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। এটাই ছিল দ্বিতীয় বড় অগ্রগতি।

চিত্র ৩২: জটিল তল

চিত্র ৩৩: ৯০ ডিগ্রিতে i-এর অবস্থান

চিত্র ৩৪: i-এর বিভিন্ন ঘাত

এ ভাবনাগুলোকে জোড়া দেন গাউসের ছাত্র জর্ক ফ্রিডরিচ বার্নার্ট রিমান। রিমান প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিকে জটিল সংখ্যার সাথে একীভূত করেন। আর এতেই হঠাৎ রেখারা হয়ে গেল বৃত্ত। আর বৃত্তরা রেখা। আর শূন্য ও অসীম হয়ে গেল সংখ্যা দিয়ে ভর্তি গোলকের দুই বিপরীত মেরু।

চিত্র ৩৫: একক বৃত্তের ভেতরে ও বাইরে প্যাঁচ

রিমান জটিল তলের ওপর একটি আলোক-ভেদ্য গোলক কল্পনা করলেন। দক্ষিণ মেরু শূন্যকে স্পর্শ করে আছে। ধরুন উল্টো পাশের উত্তর মেরুতে একটি ক্ষুদ্র আলো রাখা হলো। এতে করে গোলকে আঁকা যেকোনো চিত্রের ছায়া পড়বে নিচের তলে। দুই মেরুর মাঝে আছে বিষুবরেখা। এর রেখার দাগের ছায়া হবে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে একটি বৃত্ত। দক্ষিণ গোলাধের যে-কোনো ছবির ছায়া পড়বে বৃত্তের ভেতরে। আর উত্তর গোলাধের ছায়াগুলো হবে বৃত্তের বাইরে (চিত্র ৩৬)। মূলবিন্দু (০) আছে দক্ষিণ মেরুতে। জটিল তলে গোলকের প্রতিটি বিন্দুরই ছায়া পড়বে। ফলে গোলকের প্রতিটি বিন্দুই তলের ছায়ার সমতুল্য। আবার তলের প্রতিটি বৃত্তই গোলকের বৃত্তের কোনো বৃত্তের ছায়া। গোলকের বৃত্তের বিপরীতে আছে তলের বৃত্ত। তবে ব্যতিক্রম আছে একটি।

ধরুন একটি বৃত্ত গোলকের উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে। এর ছায়া কিন্তু বৃত্ত নয়। একটি রেখা। উত্তর মেরু যেন কেপলার ও পঁসলের কল্পিত অসীমের বিন্দু। তলে অবস্থিত রেখা গোলকের উত্তর মেরু দিয়ে যাওয়া বৃত্ত ছাড়া কিছুই নয়। অসীমের বিন্দু (চিত্র ৩৭)।

চিত্র ৩৬: ত্রিমাত্রিক গোলকের ছায়া দ্বিমাত্রিক তলে প্রক্ষেপণ (স্টেরিওগ্রাফিক প্রোজেকশন)

রিমান বুঝে ফেললেন, (অসীমের বিন্দুসহ) জটিল তল আর গোলক আসলে একই। এবার গণিতবিদরা দেখলেন গোলকের ঘূর্ণন ও বিকৃতির মধ্যই লুকিয়ে আছে গুণ, ভাগসহ অন্যান্য জটিল গাণিতিক অপারেশন। যেমন i দিয়ে গুণ করা আর গোলককে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া একই কথা। একটি সংখ্যা x নিল। একে পালেট লিখুন  $(x - 1)/(x + 1)$ । এটা করা আর সম্পূর্ণ গোলককে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া একই কথা। যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকবে বিষুব রেখায় (চিত্র ৩৮, ৩৯ ও ৪০)। তবে সবচেয়ে মজার জিনিস দেখা যায় একটি সংখ্যা x নিয়ে একে  $1/x$  দিয়ে পালেট দিলে। এর মাধ্যমে গোলকটা পুরোপুরি উল্টে যায়। উপরটা নিচে আর নিচটা উপরে। এক কথায় দর্পণচিত্র। উত্তর মেরু হয়ে গেল দক্ষিণ মেরু আর দক্ষিণ মেরু উত্তর। শূন্য হয়ে গেল অসীম আর অসীম শূন্য। গোলকের জ্যামিতিটাই এমন।  $1/\infty = 0$  এবং  $1/0 = \infty$ । অসীম আর শূন্য রিমান গোলকের বিপরীত মেরু। আর এরা একে অপরের জায়গায় যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। তাদের শক্তি সমান ও বিপরীত।

চিত্র ৩৭: রেখা ও বৃত্ত একই জিনিস

জটিল তলের সবগুলো সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ করুন। কাজটা যেন এমন: আপনার হাতটা দক্ষিণ মেরুতে রাখলেন, এরপর গোলকের ওপরের রাবারের একটি আবরণকে দক্ষিণ মেরু থেকে টেনে উত্তর মেরুর দিকে নিয়ে গেলেন। অর্ধেক ( $1/2$ ) দিয়ে গুণ করার প্রভাব এর বিপরীত। এর মানে হলো রাবারটাকে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে নিয়ে

আসা। অসীম দিয়ে গুণ করা মানে দক্ষিণ মেরুতে সুঁই ফুটিয়ে দেওয়া; সবটুকু রাবার উল্টে গিয়ে উপরের উত্তর মেরুর দিকে চলে যাবে। যেকোনো কিছুকে অসীম দিয়ে গুণ করলে অসীম আসে। শূন্য দিয়ে গুণ করা মানে উত্তর মেরুতে সুঁই ফুটিয়ে দেওয়া। সবকিছু এসে জমা হবে দক্ষিণ মেরুতে। যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই হয়। অসীম আর শূন্য সমান ও বিপরীত। আর সমানভাবে ধ্বংসাত্মক।

চিত্র ৩৮: রিমান গোলক

চিত্র ৩৯:  $i$  দিয়ে রূপান্তরিত রিমান গোলক

চিত্র ৪০:  $(x - 1)/(x + 1)$  দিয়ে রূপান্তরিত রিমান গোলক

শূন্য আর অসীম সব সংখ্যাকে গ্রাস করে নেওয়ার এক অনন্ত সংগ্রামে লিপ্ত। মানি ধর্মের দুঃস্বপ্নের মতো দুইয়ের অবস্থান সংখ্যাগোলকের দুই মেরুতে। ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলের মতো গিলছে সংখ্যাদের। সংখ্যার তল থেকে যেকোনো সংখ্যা নিন। যেমন ধরুন নিলাম  $i/2$ । একে বর্গ করুন। ঘন করুন। ঘাত চার করুন। পাঁচ, ছয়, সাত। গুণ করতে থাকুন। এটি পেঁচিয়ে ক্রমেই শূন্যের দিকে যাচ্ছে। যেভাবে পানি গড়ায় ড্রেনের দিকে। সংখ্যাটা  $2i$  হলে কী হত? ঠিক উল্টো। একে বর্গ করুন। ঘন করুন। ঘাত চার করুন। এটা পেঁচিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে (চিত্র ৪১)। তবে সংখ্যাগোলকে দুই কার্ড একে অপরের নকল। একে অপরের দর্পণ চিত্র (চিত্র ৪২)। জটিল তলের সব সংখ্যার একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। শূন্য ও অসীমের দিকে এরা এগিয়ে যায় অপ্রতিরোধ্য উপায়ে। এদের থেকে বেঁচে থাকে গুটিকয়েক সংখ্যা। যাদের দূরত্ব দুই প্রতিদ্বন্দী থেকে সমান দূরে। যে সংখ্যারা আছে বিম্ববরেখায়। এই যেমন  $1$ ,  $(-1)$  ও  $i$ । শূন্য ও অসীমের দড়ি টানা খেলায় এরা বিম্ববরেখার চারপাশে অনন্তকাল পাক খেতে থাকে। মুক্ত হতে পারে না কোনটিরই বন্ধন থেকে। (ক্যালকুলেটরেও আপনি এটা যাচাই করে দেখতে পারেন। এতে যেকোনো একটি সংখ্যা বসান। একে বর্গ করুন। আবার করুন। আবার। এটি ক্রমেই অসীম বা শূন্যের দিকে চলে যাবে। ব্যতিক্রম হলো  $1$  ও  $(-1)$ । এখানে শুরু করলে নেই কোনো গতি।

## অসীম শূন্য

আমার তত্ত্ব পাথরের মতো দৃঢ়। এর প্রতি ছোঁড়া প্রতিটি তীর উল্টো দিকে ঘুরে ফিরে যাবে তীরন্দাজের দিকে। আমি কীভাবে তা জানি? আমি এটা নিয়ে পড়েছি। খুঁজেছি এর শিকড়ের সন্ধান। সত্যই বলতে, স্ট্রট জিনিসের মধ্যে প্রথম অব্যর্থ জিনিস এটা।

-- জর্ক ক্যান্টর

অসীম থাকল না আর অতীন্দ্রিয়। এটা হয়ে গেল সাধারণ এক সংখ্যা<sup>৮</sup>। প্রস্তুত বিশ্লেষণের জন্য। গণিতবিদরাও দ্রুতই একে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তবে অসীমের গভীর থেকে সংখ্যার বিশাল রাজ্য থেকে শূন্যকে বারবার উদয় হতে দেখা গেল। আরও ভয়ানক কথা হলো, অসীম নিজেই শূন্য হতে পারে।

চিত্র ৪১: তলের মধ্যে প্যাঁচ খেয়ে ভেতরে ও বাইরে যাওয়া

চিত্র ৪২: গোলকের মধ্যে অসীম ও শূন্য একে অপরের দর্পণ-চিত্র।

রিমান দেখলেন, জটিল তল আসলে একটি গোলক। তার আগের পুরনো দিনে  $1/x$ -এর মতো ফাংশনগুলো ভাবনায় ফেলেছিল গণিতবিদদের।  $x$  শূন্যের দিকে গেলে  $1/x$  বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অসীমে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। অসীম

পর্যন্ত যাওয়াকে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য করে তোলেন রিমান। কারণ, গোলকের ওপরের আর দশটা বিন্দুর মতোই অসীমও একটি বিন্দু। অসীমকে ভয় পাওয়ার দিন শেষ। সত্যি বলতে, গণিতবিদরা বিশ্লেষণ করে করে ফাংশনের বিস্তারিত হয়ে যাওয়া বিন্দুগুলোকে আলাদা করতে শুরু করলেন। এ বিন্দুগুলোর নাম সিংগুলারিটি বা অনন্যতা (singularity)।

$1/x$  কার্ভের সিংগুলারিটি পাওয়া যাবে  $x = 0$  বিন্দুতে। খুবই সরল এক সিংগুলারিটি, যাকে গণিতবিদরা নাম দেন মেরু (pole)। অন্য ধরনের সিংগুলারিটিও আছে। যেমন  $\sin(1/x)$  কার্ভের অপরিহার্য সিংগুলারিটি আছে  $x = 0$  বিন্দুতে। অপরিহার্য সিংগুলারিটির এক অদ্ভুত দানব। এ ধরনের সিংগুলারিটির কাছাকাছি জায়গায় কার্ভ পাগলের মতো আচরণ করে। সিংগুলারিটির কাছাকাছি গেলে কার্ভটা ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর স্পন্দিত হতে থাকে। একবার ধনাত্মক তো আবার ঋণাত্মক—চলতে থাকে এভাবে। সিংগুলারিটির সবচেয়ে ক্ষুদ্র দূরত্বে কার্ভ কল্পনাযোগ্য সব মানই গ্রহণ করতে থাকে। সিংগুলারিটির আচরণ এতটা অদ্ভুত মনে হলেও গণিতবিদদের কাছে তা আর রহস্য থাকল না। তাঁরা অসীমকে ব্যবচ্ছেদ করার উপায় জেনে ফেলেছেন।

সে কাজটির নায়ক জর্ক ক্যান্টর। জন্ম ১৮৪৫ সালে রাশিয়ায়। তবে জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে জার্মানিতে। যে ভূমি গাউস ও রিমানের স্মৃতিবিজড়িত। আর এ জার্মানিতেই অসীমের রহস্য উন্মোচিত হয়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এই জার্মানিতেই বাস করতেন লিওপোল্ড ক্রোনেকা। যার হেনস্থার শিকার হয়ে ক্যান্টরের স্থান হয় মানসিক চিকিৎসালয়ে।

ক্যান্টর ও ক্রোনেকার দ্বন্দ্বের মূল কারণ অসীম নিয়ে একটি ধারণা। একটি ধাঁধার মাধ্যমে ধারণাটি বোঝা যায়। ধরুন একটি স্টেডিয়ামে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছে। আপনি জানতে চান, স্টেডিয়ামে সিট বেশি নাকি আসন বেশি, নাকি দুটোই সমান। এটা জানার একটি উপায় হলো মানুষ ও আসনের সংখ্যা গুণে ফেলা। এরপর দুই সংখ্যা তুলনা করলেই হলো। তবে তাতে সময় লাগবে অনেক। অনেক ভাল আরেকটি উপায় আছে। সবাইকে আসনে বসে যেতে বলুন। খালি আসন দেখা গেলে মানুষের সংখ্যা আসনের চেয়ে কম হবে। আর মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলে বুঝতে হবে, আসনের চেয়ে মানুষ বেশি। কোনো আসন খালি থাকলে এবং কেউ দাঁড়িয়ে না থাকলে মানুষ আর আসনের সংখ্যা সমান।

ক্যান্টর কৌশলটাকে আরও সার্বিক রূপ দেন। সংখ্যার দুটি সেটের আকার একই হবে যদি একটি সেটকে আরেকটি সেটের ওপর বসিয়ে দেওয়া যায় এবং কেউ বাকি না থাকে। যেমন  $\{1, 2, 3\}$  ও  $\{2, 4, 6\}$  সেট দুটির আকার একই। কারণ একটিকে আরেকটির ওপর নিখুঁতভাবে বসিয়ে দেওয়া যাবে। কোনো আসন বাকি থাকবে না। বাকি থাকবে না কোনো সংখ্যাও।

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ | & | & | \\ 2 & 4 & 6 \end{array}$$

কিন্তু  $\{2, 4, 6, 8\}$  সেটটির আকার আলাদা। কারণ এখানে ৮ সিটটি ফাঁকা পড়ে আছে।

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ | & | & | \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{array}$$

তবে অসীম সেট নিয়ে কাজ করতে গেলে ব্যাপারটা মজার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক সংখ্যার সেটটিই ধরুন:  $\{1, 2, 3, \dots\}$ । নিঃসন্দেহে সেটটা নিজের সমান। সবাইকে নিজের ওপর বসিয়ে দিলে হলো।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ...  
 | | | | | ...  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ...

এখানে কোনো লুকোচুরি নেই। সব সেটই নিজের সমান। কিন্তু সেট থেকে কিছু সংখ্যা সরিয়ে দিলে কী হবে? এই যেমন সরিয়ে দিলাম ১-কে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ১-কে সরিয়ে দিলেও সেটের আকার পরিবর্তন হয় না। আসনবিন্যাস একটু পাল্টে নিলেই সব সংখ্যার জন্য একটা করে আসন পাওয়া যায়। আর সব আসনেই সংখ্যা দেওয়া যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ...  
 | | | | | ...  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ...

সেটের আকার একই। যদিও আমরা একটি সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। আসলে আমরা অসীমসংখ্যক সংখ্যাকে সরিয়ে দিতে পারি। আমরা সবগুলো বেজোড় সংখ্যাকে সরিয়ে দিতে পারি। সেটের আকার তাও অপরিবর্তিত থাকবে। এখনও সব সংখ্যার জন্য আসন থাকবে, আর সব আসনে সংখ্যা থাকবে।

০ ২ ৪ ৬ ৮ ১০ ...  
 | | | | | | ...  
 ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ...

এটাই আসলে অসীমের সংজ্ঞা। এটা থেকে কাউকে বিয়োগ করলে আকার একই থাকে। বেজোড় সংখ্যা, জোড় সংখ্যা, পূর্ণসংখ্যা সবাই আকার সমান। ক্যান্টর এদেরকে প্রকাশ করেছিলেন  $\aleph_0$  দিয়ে।  $\aleph_0$  (আলেফ) হলো হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর (আরবি ভাষায় যা আলিফ)। এদের আকার গণনাবাচক সংখ্যার সমান বলে  $\aleph_0$  এর সমান আকারের সেটকে গণনাযোগ্য (countable) বলা হয় (অবশ্য বাস্তবে এদেরকে গুনে শেষ করা যাবে না। সেটা করতে হলে চাই অসীম সময়।) মূলদ (rational) সংখ্যারা (যাদেরকে  $a/b$  ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায়, যেখানে  $a$  ও  $b$  পূর্ণসংখ্যা) ছিল গণনাযোগ্য। এটা করতেও ক্যান্টরকে বুদ্ধি বের করতে হয়েছিল। মূলদ সংখ্যাগুলোর তাদের প্রকৃত আসনে বসিয়ে ক্যান্টর দেখান, এরাও  $\aleph_0$  আকারের সেট (দেখুন পরিশিষ্ট ঘ)।

তবে পিথাগোরাস আগেই দেখিয়েছেন, মূলদ সংখ্যারাই সব নয়। তথাকথিত বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আছে মূলদ ও অমূলদ দুই ধরনের সংখ্যাই। ক্যান্টর আবিষ্কার করেন, বাস্তব সংখ্যার সেট মূলদ সংখ্যার সেট থেকে অনেক অনেক বড়। যেমন আমাদের আসনবিন্যাস এমন হতে পারে:

আসন	বাস্তব সংখ্যা
১	০.৩১২৫১২৩
২	০.৭৮৪৩১২২
৩	০.৯৯৯৯৯৯৯
৪	০.৬২৬১০০০
৫	০.২৬৭১১২৩



ক্যান্টর কৌশলটা পেলেন এ তালিকার বাইরের একটি বাস্তব সংখ্যা তৈরি করতে গিয়ে। প্রথম সংখ্যার প্রথম অঙ্কের দিকে খেয়াল করুন (দশমিকের আগের শূন্যকে বাদ দিয়ে। ০ সবার আগেই আছে, না দিলেও সংখ্যা একই থাকে।)। আমাদের উদাহরণে অঙ্কটা ৩। আমাদের নতুন সংখ্যা প্রথম সংখ্যার সমান হলে ৩ দিয়ে শুরু হত। আমরা সেটা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারি। ধরুন আমাদের নতুন সংখ্যার প্রথম অঙ্ক হবে ২। আগের সংখ্যা ৩ দিয়ে শুরু আর আমাদের নতুন সংখ্যা ২ দিয়ে শুরু বলে আমরা জানি সংখ্যা দুটি আলাদা হবেই। (এ কথায়ও ফাঁক আছে। যেমন  $0.3000... = 0.2999...$ । অনেক মূলদ সংখ্যাকেই দুইভাবে লেখা যায়। তবে এটা গৌণ ব্যাপার। আপাতত আমরা এ ব্যতিক্রম উপেক্ষা করব।<sup>৯)</sup>

দ্বিতীয় সংখ্যায় আসি। আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে নতুন সংখ্যাটা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেও আলাদা হবে? আমরা নতুন সংখ্যার প্রথম অঙ্ক নিয়ে নিয়েছি। এখন আর সে কাজ করা যাবে না। তবে একইরকম বুদ্ধি করা যাবে। দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক ৮। আমরা ৮-এর বদলে নতুন সংখ্যা ৭ নিলেই নতুন সংখ্যা ভিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে তালিকার নিচের দিকে যেতে থাকি। তৃতীয় সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক পাল্টে নেব। চতুর্থ সংখ্যার চতুর্থ অঙ্ক। এভাবেই চলবে।

আসন	বাস্তব সংখ্যা	নতুন সংখ্যার জন্য অঙ্ক
১	০.৩১২৫১২৩	২
২	০.৭৮৪৩১২২	৭
৩	০.৯৯৯৯৯৯৯	৮
৪	০.৬২৬১০০০	০
৫	০.২৬৭১১২৩	০

ফলে আমাদের নতুন সংখ্যা হবে  $0.29800...$ ।

এটা প্রথম সংখ্যা থেকে আলাদা (প্রথম অঙ্কে অমিল)।  
এটা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আলাদা (দ্বিতীয় অঙ্কে অমিল)।  
এটা তৃতীয় সংখ্যা থেকে আলাদা (তৃতীয় অঙ্কে অমিল)।  
এটা চতুর্থ সংখ্যা থেকে আলাদা (চতুর্থ অঙ্কে অমিল)।  
এটা পঞ্চম সংখ্যা থেকে আলাদা (পঞ্চম অঙ্কে অমিল)।

এভাবে কর্তব্য বরাবর গিয়ে আমরা নতুন একটি সংখ্যা বানালাম। এভাবে বানানোয় নিশ্চিত হলো সংখ্যাটা তালিকার সব সংখ্যা থেকে আলাদা। তালিকার সব সংখ্যা থেকে আলাদা হলে এটা তালিকায় থাকতে পারে না। তবে আমরা ইতোমধ্যে ধরে নিয়েছি, আমাদের তালিকায় সব বাস্তব সংখ্যা আছে। কারণ আসনবিন্যাস ছিল নিখুঁত। কিন্তু এখন তৈরি হলো অসঙ্গতি। নিখুঁত আসনবিন্যাসের অস্তিত্বই নেই।

বাস্তব সংখ্যার মূলদ সংখ্যার চেয়ে বড় অসীম। এ ধরনের অসীমের জন্য প্রতীক বরাদ্দ হলো  $\aleph_1$ । প্রথম অগণনাযোগ্য (uncountable) অসীম। (পারিভাষিকভাবে বাস্তব রেখার অসীমের প্রতীক ছিল  $C$  (continuum infinity বা অসীম পরম্পরা)। আসলেই  $C$ -ই  $\aleph_1$  কিনা তা জানার জন্য গণিতবিদরা বহু বছর সাধনা করেন। এ ধাঁধার নাম তথাকথিত পরম্পরা অনুকল্প (continuum hypothesis)। ১৯৬৩ সালে গণিতবিদ পল কোহেন প্রমাণ করেন, অনুকল্পটিকে ভুল

বা সঠিক কোনোটাই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটা প্রমাণ করতে কাজে লাগানো গোদেলের অসম্পূর্ণতা উপপাদ্য (Gödel's incompleteness theorem)। বর্তমানে বেশিরভাগ গণিতবিদ পরস্পরা অনুকল্পে সত্য মনে করেন। তবে কেউ আবার অ-ক্যান্টরীয় অসীম সংখ্যার আলোচনায় পরস্পরা অনুকল্পকে ভুল মনে করেন।) ক্যান্টরের মনে ছিল অসীমসংখ্যক অসীম। এদেরকে বলা হয় ট্রান্সফাইনাইট নাম্বার। এক অসীম সেটের ভেতর আরেক অসীম সেট।  $\aleph_1$  বড়  $\aleph_0$ -এর চেয়ে।  $\aleph_2$  আবার বড়  $\aleph_1$ -এর চেয়ে।  $\aleph_2$ -এর চেয়ে বড়  $\aleph_3$  ইত্যাদি। সবার ওপরে আছে চূড়ান্ত অসীম। যা গ্রাস করে আছে অন্য সব অসীমকে। ঈশ্বর, যিনি সকল উপলব্ধির উর্ধ্বে।

তবে ক্যান্টরের দূর্ভাগ্য। ঈশ্বরের ধারণা সবার কাছে এক ছিল না। লিওপোল্ড ক্রোনেকা ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক। একইসাথে ক্যান্টরের শিক্ষক। ক্রোনেকা মনে করতেন, ঈশ্বর কখনোই বিশ্রী অমূলদ সংখ্যাকে অস্তিত্ব দেবেন না। আর ক্রমেই বড় হওয়া একের ভেতর অন্য অসীমের তো সুযোগই নেই। তাঁর মতে, পূর্ণসংখ্যাই ঈশ্বরের বিশুদ্ধতার প্রতীক। আর অমূলদ ও অদ্ভুত সেটেরা ঘৃণিত বস্তু। যা মানুষের ক্রটিপূর্ণ চিন্তার ফসল। আর ক্যান্টরের ট্রান্সফাইনাইট নাম্বার এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বস্তু।

ক্রোনেকা ক্যান্টরের প্রতি চরম বিরক্ত হন। শুরু করেন তীব্র আক্রমণ। ক্যান্টরের গবেষণা প্রকাশ করাকে করে তোলেন কঠিন। ১৮৮৩ সালে ক্যান্টর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পদের জন্য আবেদন করেন। তাঁকে সেখানে নেওয়া হয়নি। পরে তিনি অধ্যাপনার চাকরি নেন তুলনামূলক নিম্নমানের হ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনে করা হয়, বার্লিনের প্রভাবশালী ব্যক্তি ক্রোনেকা-ই এ জন্য দায়ী। একই বছর তিনি ক্রোনেকার আক্রমণের জবাব দেন। এরপর আসে ১৮৮৪ সাল। ক্যান্টর মানসিক বিপর্যয়ের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছে যান।

তবে ক্যান্টরের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যাপার হলো, তাঁরই কাজ সেট থিওরি নামে গণিতের নতুন একটি শাখার ভিত্তি রচনা করে দেয়। সেট তত্ত্ব দিয়ে গণিতবিদরা একদম শূন্য থেকে আমাদের জানা সব সংখ্যা তৈরি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তৈরি করা যায় আগে শোনা যায়নি এমনসব সংখ্যাও। অসীমসংখ্যক অসীম। যাদেরকে সাধারণ সংখ্যার মতোই অন্য অসীমের সাথে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়। ক্যান্টর সংখ্যার নতুন এক মহাবিশ্ব উন্মুক্ত করে দিলেন। জার্মান গণিতবিদ ডাভিট হিলবার্ট বলেছিলেন, "আমাদেরকে ক্যান্টরের তৈরি করা স্বর্গ থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না।" কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ক্যান্টরের বাকি জীবন কাটে মানসিক কেন্দ্রে যাওয়া-আসা করতে করতে। ১৯১৮ সালে হ্যালির মানসিক হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্যান্টর ও ক্রোনেকার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ক্যান্টরই জয়ী হন। ক্যান্টরের তত্ত্ব থেকে দেখা যায়, ক্রোনেকার মূল্যবান পূর্ণসংখ্যা এবং এমনকি মূলদ সংখ্যারাও কিছুই নয়। এরা অসীম শূন্য।

মূলদ সংখ্যারা সংখ্যায় অসীম। যেকোনো দুটি সংখ্যার মাঝেও আছে অসীমসংখ্যক সংখ্যা। সংখ্যা দুটি যত কাছাকাছিই হোক না তাতে কিছু আসে যায় না। এরা আছে সর্বত্র। তবে ক্যান্টরের অসীমের স্তর বলে ভিন্ন কথা। এটা থেকে দেখা যায়, মূলদ সংখ্যারা সংখ্যারেখায় কত কম জায়গা দখল করে।

এত সূক্ষ্ম হিসাব করতে একটু চালাকি করতে হয়েছে। বিষম বা এবড়োখেবড়ো আকৃতির বস্তুর পরিমাপ খুব জটিল। যেমন ধরুন আপনার ঘরের মেঝেতে একটা নোংরা দাগ পড়ল। এ দাগের ক্ষেত্রফল কত? এটা বোঝা সহজ কাজ নয়। আকৃতি বৃত্ত, বর্গ বা ত্রিভুজের মতো হলে সহজেই বলা যেত। একটি মাপকাঠি নিয়ে ব্যাসার্ধ বা ভূমি ও উচ্চতা মেপে ফেললেই হলো। কিন্তু অ্যামিবা প্রাণীর মতো আকৃতির ক্ষেত্রফল মাপার কোনো সূত্র নেই। তবে উপায় একটা আছে।

একটা আয়তাকার কার্পেট দিয়ে দাগটি ঢেকে দিন। দাগ পুরোপুরি ঢাকা পড়লে বুঝব দাগের ক্ষেত্রফল কার্পেটের ক্ষেত্রফলের চেয়ে কম। কার্পেটের ক্ষেত্রফল এক বর্গফুট হলে দাগের ক্ষেত্রফল হবে এক বর্গফুটের কম। আরও ছোট কার্পেট ব্যবহার করলে আমাদের অনুমান ভাল ফল দিতে থাকবে। হয়তোবা এক বর্গফুটের এক-অষ্টমাংশ আকারের পাঁচটি কার্পেট দিয়ে দাগটি ঢেকে যাবে। তখন বলা যাবে, কার্পেটের ক্ষেত্রফল এক ফুটের অন্তত পাঁচ-অষ্টমাংশ। যে ক্ষেত্রফল আগের এক বর্গফুটের অনুমানের চেয়ে কম। কার্পেটকে ক্রমেই ছোট করতে থাকলে দাগ আরও ভালভাবে ঢাকা যাবে। আর কার্পেটের ক্ষেত্রফলও দাগের সত্যিকার ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি হবে। এবং আসলে দাগের আকারকে কার্পেটের আকারের শূন্যগামী লিমিট হিসেবে প্রকাশ করা যাবে (চিত্র ৪৩)।

এবার একই কাজ করি মূলদ সংখ্যা নিয়ে। তবে এখন আমাদের কার্পেট হলো সংখ্যার সেট। যেমন ধরুন ২.৫ সংখ্যাটিকে ঢাকা হবে এমন কার্পেট দিয়ে, যাতে থাকবে, ধরুন ২ ও ৩-এর মধ্যবর্তী সব সংখ্যা। মানে কার্পেটের আকার ১। এ ধরনের কার্পেট দিয়ে মূলদ সংখ্যাদের ঢাকতে গেলে অদ্ভুত সব ফলাফল দেখা যায়। যেমনটা ক্যান্টর দেখিয়েছেন আসনবিন্যাসের ছকের মাধ্যমে। এ ছকে আছে সব মূলদ সংখ্যা। প্রতিটি মূলদ সংখ্যা পায় একটি করে আসন। অতএব আমরা এদেরকে আসন নং অনুসারে একটি একটি করে ক্রমানুসারে গুণতে পারব। প্রথম মূলদ সংখ্যাটি নিয়ে একে সংখ্যারেখায় কল্পনা করুন। একে এক (১) সাইজের একটি কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিন। ঐ একই কার্পেট দিয়ে আরও বহু সংখ্যা ঢেকে যাবে। তবে সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না। প্রথম সংখ্যাটা ঢাকা হলেই আমরা খুশি।

#### চিত্র ৪৩: দাগ ঢাকার প্রক্রিয়া

এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটি নিন। একে  $1/2$  আকারের কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিন। তৃতীয় সংখ্যাকে ঢাকুন  $1/8$  আকারের কার্পেট দিয়ে। এভাবে করে যান। প্রতিটি মূলদ সংখ্যাই আসনবিন্যাসের ছকে আছে। ফলে প্রতিটি মূলদ সংখ্যাই একটি কার্পেট দিয়ে ঢাকা পড়বে। কার্পেটের মোট আকার কত হবে? সংখ্যাটা আমাদের পরিচিত। অ্যাকিলিজের যোগফল। কার্পেটের আকার যোগ করে আমরা পাব  $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + 1/2^n$ ।  $n$  অসীমের দিকে এ যোগফল যাবে ২-এর দিকে। ফলে এক সেট কার্পেট দিয়ে আমরা অসীম অসীমসংখ্যক মূলদ সংখ্যা ঢেকে দিতে পারি। আর কার্পেটের আকারের যোগফল হবে ২। তার মানে মূলদ সংখ্যারা ২ এককের চেয়ে কম জায়গা দখল করে।

দাগের ক্ষেত্রে যেমন করেছি, মূলদ সংখ্যার আকারের আরও ভাল অনুমান পেতে কার্পেটের আকার আরও ছোট করতে পারি।  $1$  আকারের কার্পেটের বদলে আমরা  $1/2$  আকারের কার্পেট দিয়েই শুরু করতে পারি। এতে করে কার্পেটের আকারের যোগফল হবে  $1$ । মূলদ সংখ্যারা জায়গা দখল করবে  $1$  এককের কম।  $1/1000$  আকারের কার্পেট দিয়ে শুরু করলে জায়গা দখল হবে  $1/500$  এককের কম। সব মূলদ সংখ্যা নিয়েও একটা রুমের  $1/500$  এককের কম দখল করা যাবে। একটি পরমাণুর অর্ধেক আকারের কার্পেট নিয়ে ঢাকা শুরু করলেও সংখ্যারেখায় সব মূলদ সংখ্যাদের ঢেকে দেওয়া যাবে। ফলে এদের মোট আকার হবে একটা পরমাণুর চেয়ে ছোট। তবুও একটা পরমাণুর মধ্যে এঁটে যাওয়া এ ক্ষুদ্র কার্পেটই সব মূলদ সংখ্যাদের ঢেকে দিতে পারে (চিত্র ৪৪)।

আমরা চাইলে আরও আরও ছোট হতে পারব। কার্পেটগুলোর আকার যোগ করলে পরমাণু, নিউট্রন বা কোয়ার্কের অর্ধেক হবে এমন কার্পেট দিয়েও সব মূলদ সংখ্যাকে ঢেকে দেওয়া যাবে। আমরা যত ছোট কল্পনা করতে পারি সে আকারের কার্পেট দিয়েই করা যাবে কাজটা।

তাহলে মূলদ সংখ্যারা ঠিক কত বড়? আমরা আকারকে একটি লিমিট আকারে প্রকাশ করেছি। এটা হলো কার্পেটের আকারের যোগফল, যেখানে প্রতিটি আলাদা কার্পেটের আকার শূন্যের দিকে অগ্রসরমান। এরপরেও আমরা দেখেছি, কার্পেটের আকার ছোট করতে থাকলে ঢাকা পড়া অংশের ক্ষেত্রফল ছোট থেকে আরও ছোট হতে থাকে। পরমাণু,

কোয়ার্ক বা কোয়ার্কের লক্ষ বা কোটিগুণের এক ভাগের চেয়েও ছোট। তবুও আমরা মূলদ সংখ্যাদের ঢেকে দিতে পারি। যে জিনিস না থেমে কেবলই ছোট হতেই থাকে তার লিমিট কত?

#### চিত্র ৪৪: মূলদ সংখ্যার ঢাকা পড়া

শূন্য। মূলদ সংখ্যারা কত বড়? এরা আসলে কোনো জায়গাই দখল করে না। কথাটা হজম করা কঠিন। কিন্তু এটাই সত্য।

সংখ্যারেখার সর্বত্র মূলদ সংখ্যা থাকলেও এরা জায়গা দখল করে না। সংখ্যারেখায় ডার্ট ছুঁড়ে মারলে সে ডার্ট কখনোই মূলদ সংখ্যাকে আঘাত করবে না। কখনোই না। মূলদ সংখ্যারা অল্প হলেও অমূলদরা সংখ্যায় বিশাল। তাদের জন্য কোনো আসনবিন্যাসের ছক বানিয়ে সবাইকে এক এক করে ঢেকে দেওয়া সম্ভব নয়। সবসময় কেউ না কেউ উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। ক্রোনেকা অমূলদদের ঘৃণা করতেন। কিন্তু সংখ্যারেখার সবটুকু স্থান তাদেরই দখলে।

মূলদের অসীম শূন্যের থেকে বেশি কিছু নয়।

#### তথ্যনির্দেশ

১। চীনা দর্শনে ইন ও ইয়াং হলো দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য। ইন মানে খারাপ, অন্ধকার। আর ইয়াং ভাল, উজ্জ্বল।

২। এ সমীকরণকে সাজিয়ে পাই  $x^2 + 1 = 0$ । বা  $x^2 = -1$ , যার অর্থ হলো কোন সংখ্যাকে বর্গ করলে  $(-1)$  পাওয়া যাবে।  $1$ -কে বর্গ করলে  $1$  পাওয়া যায়।  $(-1)$ -কে বর্গ করলেও তাই। তাহলে  $(-1)$  কীভাবে পাব? আসলে এমন কোনো বাস্তব সংখ্যা নেই। তবে হ্যাঁ, সংখ্যা আছে। তার নাম কাল্পনিক সংখ্যা। নামটা 'কাল্পনিক' হলেও এ সংখ্যারাও আছে বাস্তব জগতেই।

আরও পড়ুন: আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, "কাল্পনিক সংখ্যা কি আসলেই কাল্পনিক?", স্ট্যাট ম্যানিয়া, <https://www.statmania.info/2019/07/imaginary-number.html>, ২০১৯

৩। যেভাবে বিন্দু থেকে 'বিস্ফোরণের' মাধ্যমে সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারণাকে ফ্রেড হয়েল ব্যঙ্গ করে নাম দেন 'বিগ ব্যাং'। এ নামটিই পরে টিকে যায়।

৪। বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার মিশ্রণকে জটিল সংখ্যা বলে। এই যেমন  $3 + 4i$  সংখ্যায়  $3$  হলো বাস্তব আর  $4$  কাল্পনিক অংশ।

৫। লিবনিজই প্রথম দেখান, আমাদের চেনাজানা দশভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যাকে দুটি অঙ্ক ( $0$  ও  $1$ ) দিয়েও লেখা যায়। এভাবে  $0 = 0$ ,  $1 = 1$ ,  $2 = 10$ ,  $3 = 11$ ,  $4 = 100$  ইত্যাদি। এদেরকেই বলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা। তিনি আরও দেখান, দশমিক সংখ্যার মতোই দ্বিমিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ সব গাণিতিক অপারেশন করা যায়।

৬। ইহুদি ধর্মে হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মাকে স্বর্গীয় শক্তি, গুণ বা প্রভাব মনে করা হয়। খৃষ্টান ধর্মের একটা বড় অংশে একে তাদের ত্রিত্ববাদ মতবাদের তৃতীয় ব্যক্তি মনে করা হয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা মনে করা হয় হযরত জিবরাইলকে (আ)।

৭। পঁসলের প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি গণিতের পুরনো এক অদ্ভুত ধারণা ফিরিয়ে আনে। এর নাম দ্বৈত নীতি। স্কুলে আমরা শিখি, দুটি বিন্দু যোগ করে রেখা পাওয়া যায়। তবে অসীমের বিন্দু মেনে নিলে দুটি রেখা একটি বিন্দু তৈরি করে। বিন্দু ও রেখা একে অপরের দ্বৈত রূপ। ইউক্লিডীয় দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির প্রতিটি উপপাদ্যকে দ্বৈত উপায়ে প্রমাণ করা যায় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিতে। ফলে প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির সমান্তরাল মহাবিশ্বে এক গুচ্ছ নতুন উপপাদ্যের জন্ম হলো।

৮। অসীমকে অনেকসময় সংখ্যা ধরা হয়। তবে বাস্তব সংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় না।

৯। এ বিষয়ে আরও জানতে পড়ুন: আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, স্ট্যাট ম্যানিয়া, ০.৯৯৯... = ১ কীভাবে?, <https://www.statmania.info/2017/05/0.999...equals-one.html>, ২০১৭

সপ্তম অধ্যায়  
পরম শূন্য  
[পদার্থবিদ্যায় শূন্য]

গণিতে কোনো রাশি অতিশয় বড় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলে নয়, বরং রাশি ছোট হলে তাকে উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ।  
— পল ডিরাক

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অসীম আর শূন্য অবিচ্ছেদ্য। গণিতের অপরিহার্য অংশ। গণিতবিদরা বুঝলেন, এদেরকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। তবে পদার্থবিদদের কাছে মনে হচ্ছিল, মহাবিশ্বের কাজকর্মে শূন্যের কোনো ভূমিকা নেই। অসীমকে যোগ করা ও শূন্য দিয়ে ভাগ করা গণিতের কাজ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিজ্ঞানীরা অন্তত এমনটাই আশা করেছিলেন। একদিকে গণিতবিদরা শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন। ওদিকে শূন্য গণিতের চৌহদ্দি পেরিয়ে চলে এল পদার্থবিদ্যায়। তাপগতিবিদ্যায় (thermodynamics) শূন্য হয়ে গেল অনতিক্রম্য এক বাধা। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় (relativity) শূন্য হয়ে গেল কৃষ্ণগহ্বর (black hole)। দানবীয় যে তারা গিলে খায় বহু নক্ষত্র। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় (quantum mechanics) শূন্য শক্তির এক অদ্ভুত উৎস। গভীরতম ভ্যাকুয়ামেও (শূন্যস্থান) আছে যার উপস্থিতি। তৈরি করে এক ভূতুড়ে বল, যার নেই কোনো উৎস।

## শূন্য তাপ

পরিমাপের বিষয়কে সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে এটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কিন্তু একে পরিমাপ করা না গেলে ও সংখ্যায় প্রকাশ করা না গেলে জ্ঞান থাকে নগণ্য ও অতৃপ্তিদায়ক। হয়তোবা এটা জ্ঞানের সূচনা। তবে এসব চিন্তা আপানকে বিজ্ঞানের পথে বেশিদূর এগিয়ে নেবে না।

— উইলিয়াম থমসন, লর্ড কেলভিন

পদার্থবিদ্যায় শূন্যের প্রথম অনিবার্য উপস্থিতি দেখা যায় অর্ধশতক ধরে ব্যবহৃত একটি সূত্রে। ১৭৮৭ সালে ফরাসি পদার্থ ক্যাক আলেকজান্ডার চার্লস সূত্রটা আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন বেলুনে উড়ে তিনি ততদিনে এমনিতেই বিখ্যাত। তবে উড্ডয়ন তেলেসমাতির জন্য নয়, তিনি ইতিহাসে অমর হন তাঁর নামে নাম দেওয়া সূত্রটার (চার্লসের সূত্র) কারণে।

গ্যাসের নানান ধরনের বৈশিষ্ট্য সমকালীন অনেক পদার্থবিদের মতো চার্লসকেও অভিভূত করে। অক্সিজেন কয়লাকে শিখায় পরিণত করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আবার তাকে নিভিয়ে দেয়। প্রাণঘাতী ক্লোরিনের রং সবুজ। নাইট্রাস অক্সাইডের রং না থাকলেও মানুষ হাসাতে ওস্তাদ। তবে আলাদা আলাদা এ গ্যাসগুলোর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য একইরকম। তাপ দিলে এরা প্রসারিত হয়। আর ঠাণ্ডা করলে হয় সঙ্কুচিত।

চার্লস আবিষ্কার করেন, এ আচরণ অত্যন্ত নিয়মিত ও অনুমানযোগ্য। যেকোনো দুটি আলাদা গ্যাস সমান পরিমাণে নিন। রাখুন একই ধরনের বেলুনের ভেতরে। তাদেরকে একই পরিমাণ তাপ দিন। দেখবেন, তারা সমানভাবে প্রসারিত হচ্ছে। ঠাণ্ডা করলেও একইসমান সঙ্কুচিত হচ্ছে। এছাড়াও তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি বাড়়া বা কমার জন্য আয়তনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাড়বে বা কমবে। চার্লসের সূত্র থেকে গ্যাসের তাপমাত্রা ও আয়তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

তবে ১৮৫০-এর দশকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন চার্লসের সূত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। সমস্যাটা শূন্য নিয়ে। তাপমাত্রা কমাতে বেলুনের আয়তন ক্রমেই কমতে থাকে। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হারে কমাতে থাকলে বেলুনও নির্দিষ্ট হারে চুপসে যেতে থাকবে। তবে সেটা চিরকাল সম্ভব নয়। তাত্ত্বিকভাবে এমন একটি বিন্দু আছে, যেখানে গ্যাস কোনো জায়গায়ই দখল করে না। চার্লসের সূত্র বলে, একটি গ্যাস বেলুন চুপসে গিয়ে অবশ্যই শূন্য পরিমাণ স্থান দখল করবে। নিঃসন্দেহে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য আয়তন শূন্য। এ বিন্দুতে পৌঁছে গ্যাস আর কোনো জায়গা দখল করে না। (গ্যাসের আয়তন স্বাভাবিক তো আর হতে পারে না।) গ্যাসের আয়তন এর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত বিধায় সর্বনিম্ন আয়তন থাকলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও থাকবে। একটি গ্যাস অনন্তকাল ধরে শীতল হতে থাকবে—সেটা সম্ভব নয়। একটা সময় বেলুনকে আর ছোট করা না গেলে তাপমাত্রাও আর কমানো যাবে না। এটাই পরম শূন্য (absolute zero)। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। যার মান পানির হিমাক্ষের নিচে ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটু বেশি। অন্য কথায় (-২৭৩) ডিগ্রি সেলসিয়াস।

থমসন লর্ড কেলভিন নামেই বেশি পরিচিত। আর কেলভিনের নামেই তাপমাত্রার সার্বজনীন স্কেলের নাম দেওয়া হয়েছে। সেলসিয়াস স্কেলে শূন্য ডিগ্রি হলো পানির হিমাক্ষ। যে তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয়। কেলভিন স্কেলে শূন্য হলো পরম শূন্য।

পরম শূন্য অবস্থায় এক পাত্র গ্যাসের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বাস্তবে এটা কখনোই করা যাবে না। একটা বস্তুর তাপমাত্রা কমিয়ে কখনোই পরম শূন্য করা যাবে না। তবে খুব কাছাকাছি যাওয়া যাবে। একটি উপায়ের নাম লেজার কুলিং। এক ডিগ্রিকে কয়েক লক্ষ ভাগ করলে যা হবে, এ পদ্ধতিতে পরম শূন্যের ততটা কাছাকাছি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তবে ঐ বিশেষ বিন্দুটিতে পৌঁছতে চাইলে মহাবিশ্বের সবকিছু একজোট হয়ে বাধা দেবে। কারণ শক্তি আছে এমন যেকোনো কিছু এদিক-সেদিক লাফাবে। আলো বিকিরণ করবে। যেমন মানুষের দেহের উপাদান নিয়ে ভাবুন। কিছু পানির অণু ও কিছু জৈব মিশ্রণ দিয়ে আমরা গঠিত। এই সবগুলো পরমাণু স্থানের মধ্যে এদিক-সেদিক লাফাচ্ছে। তাপমাত্রা যত বেশি হবে, লাফাবে তত দ্রুত গতিতে। লাফিয়ে বেড়ানো এ অণুগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। লাফাতে বাধ্য করে পার্শ্ববর্তী অণুকেও।

ধরুন আমরা একটি কলার তাপমাত্রা পরম শূন্য করতে চাই। কলা থেকে সব শক্তি বের করে নিতে হলে এর পরমাণুগুলোর নড়াচড়া থামাতে হবে। একটি বক্সে রেখে কমাতে হবে এর তাপমাত্রা। তবে বক্সটাও তো পরমাণু দিয়েই তৈরি। সে পরমাণুও লাফাচ্ছে। তারা কলার পরমাণুকেও ধাক্কা দেবে। নড়িয়ে দেবে তাদেরকে। বাধ্য করবে লাফাতে। বক্সের কেন্দ্রে একটি নিখুঁত ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সেখানে কলাকে ভাসিয়ে রাখলেও কলার কণারা নড়াচড়া করবে। কারণ চলনশীল কণা আলো বিকিরণ করে। বক্স থেকে প্রতি মুহূর্তে আলো বের হচ্ছে। যা ধাক্কা দেবে কলার অণুকে। বাধ্য করবে চলাচলে।

রেফ্রিজারেটরের কয়েলের টুইজারের সবগুলো পরমাণু নড়ছে আর বিকিরণ দিচ্ছে। একই কাজ করছে এক পাত্র তরল নাইট্রোজেনের পরমাণুরা। ফলে বক্সের কম্পন ও বিকিরণ থেকে কলা প্রতিনিয়ত শক্তি শোষণ করছে। শক্তি নিচ্ছে টুইজার ও রেফ্রিজারেটরের কয়েল থেকে। বক্স থেকে কলাকে বর্ম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয়। নয় টুইজার বা কয়েল থেকে। সেই বর্মও নড়ছে ও বিকিরণ দিচ্ছে। প্রতিটি বস্তু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। অতএব, মহাবিশ্বের যেকোনো কিছুর তাপমাত্রা পরম শূন্যে নিয়ে আসা অসম্ভব। চাই সেটা কলা, বরফখণ্ড কিংবা খাবারের টুকরো হোক। এ এক অনতিক্রম্য বাধা।

পরম শূন্যের আবিষ্কারের প্রভাব নিউটনের সূত্রের চেয়ে একদম ভিন্ন। নিউটনের সূত্রগুলো পদার্থবিদদের দেয় ক্ষমতা। এদের মাধ্যমে গ্রহের কক্ষপথ ও বস্তুর গতির পূর্বাভাস দেওয়া যায় খুব নির্ভুলভাবে। ওদিকে কেলভিনের পরম শূন্যের

আবিষ্কার পদার্থবিদদের বলল, কী তারা করতে পারবে না। পরম শূন্যে কখনও পৌঁছা সম্ভব নয়। পদার্থবিদদের কাছে এ বাধা ছিল এক হতাশাজনক বাধা। তবে এর মাধ্যমে শুরু হয় তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) নামে পদার্থবিদ্যার নতুন এক শাখা।

তাপগতিবিদ্যায় তাপ ও শক্তির আচরণ নিয়ে কাজ করা হয়। কেলভিনের পরম শূন্যের আবিষ্কারের মতো তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো একটি অনতিক্রম্য দেয়াল খাড়া করল, যা অতিক্রম করা শতচেষ্টার পরেও কোনো পদার্থবিদের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই যেমন তাপগতিবিদ্যা বলে, অবিরাম-গতি যন্ত্র (perpetual-motion machine) বানানো অসম্ভব। উৎসাহী আবিষ্কারকরা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ও বিজ্ঞান ম্যাগাজিনে অসাধারণ এ যন্ত্রের নকশা পাঠাতে লাগলেন। যে যন্ত্র কোনো শক্তি ছাড়াই চিরকাল চলতে পারে। তবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র বলে এমন যন্ত্র বানানো অসম্ভব। এটা আরেকটি অসম্ভব কাজ। এমন যন্ত্রও বানানো সম্ভব নয়, যা কোনো শক্তি অপচয় না করেই চলতে পারে। তাপ আকারে কিছু শক্তি অপচয় হিসেবে মহাবিশ্বে যোগ হয়ে যাবেই। (তাপগতিবিদ্যা ক্যাসিনোর চেয়ে খারাপ। যত চেষ্টাই করুন, আপনি জিততে পারবে না। আপনি পাবেন না নিজের পুঁজিটাও।)

তাপগতিবিদ্যা থেকে এল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা (statistical mechanics) নামক শাখা। এক গুচ্ছ পরমাণুর সামষ্টিক গতি দেখে পদার্থবিদরা পদার্থের আচরণের পূর্বানুমান করতে পারেন। যেমন গ্যাসের পরিসংখ্যানিক বিবরণই চার্লসের সূত্রের ব্যাখ্যা দেয়। গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে অণুরা গড়ে দ্রুত থেকে আরও দ্রুত চলাচল করে। পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দেয় জোরে জোরে। ফেল গ্যাস দেয়ালে জোরে ধাক্কা দেয়। চাপ বাড়তে থাকে। কণার নড়াচড়ার তত্ত্ব পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করল। এমনকি মনে হচ্ছিল, এটি আলোর প্রকৃতিরও ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।

আলোর প্রকৃতির সমস্যা বিজ্ঞানীদের বহু শতাব্দী পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। আইজ্যাক নিউটন মনে করতেন, আলো তৈরি কণা দিয়ে। যে কণা নির্গত হয় সব উজ্জ্বল বস্তু থেকে। তবে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, আলো কণা নয় বরং তরঙ্গ। ১৮০১ সালে একজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ আবিষ্কার করেন, আলো নিজের সাথে ব্যতিচার করে। দেখে মনে হয়েছিল, আলোর কণাধর্ম বুঝি চিরতরে বাতিল হয়ে গেল।

সব ধরনের তরঙ্গেই ব্যতিচার হয়। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে বৃত্তাকার ঢেউ বা তরঙ্গ তৈরি হয়। পানি ওপরে-নিচে দোল খায়। আর বৃত্তাকার ভঙ্গিতে তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজ বাইরের দিকে চলতে থাকে। একইসাথে দুটি ঢিল ছুঁড়লে একে অপরের সাথে ব্যতিচার করে। একটি পাত্রে দুটি স্পন্দনশীল পিস্টন ডোবালেও এটা দেখা যাবে। এক পিস্টনের চূড়া আরেক পিস্টনের খাঁজের সাথে মিলিত হলে একে অপরকে বাতিল করে দেয়। ঢেউয়ের নকশায় ভাল করে চোখ রাখলে নিশ্চল তরঙ্গহীন পানি দেখা যাবে (চিত্র ৪৫)।

আলোর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। দুটি ছিদ্র আলো প্রবেশ করলে অন্ধকার ও তরঙ্গহীন অঞ্চল তৈরি হয় (চিত্র ৪৬)। (বাসায় বসেই অনেকটা একইরকম একটি চিত্র আপনি দেখতে পারেন। দুই আঙ্গুলকে এক করে ধরুন। মাঝে থাকবে সামান্য ফাঁক, যেখান দিয়ে আলো চলাচল করতে পারবে। সে ফাঁক দিয়ে আলোর দিকে তাকান। দেখবেন কিছু অন্ধকার রেখার উপস্থিতি। বিশেষ করে ফাঁকের উপর ও নিচের দিকে। এসব রেখাও আলোর তরঙ্গবৈশিষ্ট্যের ফল।) তরঙ্গ এভাবেই ব্যতিচার (interference) ঘটায়। কণারা তা করে না। ফলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ব্যতিচারের ঘটনা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে সব বিভ্রান্তির সমাধান করে ফেলল। পদার্থবিদরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আলো কোনো কণা নয়। বরং তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের তরঙ্গ।



১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটাই ছিল সবচেয়ে আধুনিক ধারণা। পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার সাথে এটি পুরিপূর্ণরূপে মিলে যাচ্ছিল বলেই মনে হচ্ছিল। পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা বলে দেয় বস্তুর অণুরা কীভাবে লাফায়। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব বলল, এই আণবিক কম্পন কোনোভাবে বিকিরণের ঢেউ বা আলোকতরঙ্গ তৈরি করে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলে: একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর অণুরা তত দ্রুত লাফায়। একইসাথে একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর আলোর ঢেউয়ের শক্তি তত বেশি হয়। একদম নিখুঁত ভাবনা। আলোর তরঙ্গ যত দ্রুত উঠা-নামা করবে, এর কম্পাঙ্ক তত বেশি। (আবার কম্পাঙ্ক যত বেশি, তরঙ্গের দুই চূড়ার মাঝের দূরত্ব বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম।) তাপগতিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র স্টেফান-বোলজম্যান সমীকরণ। এ সমীকরণ আলোর কম্পনকে অণুর কম্পনের সাথে জোড়া দেয়। এটা থেকে বস্তুর তাপমাত্রার সাথে এর বিকিরিত মোট শক্তির পরিমাণের সম্পর্ক পাওয়া যায়। এটাই ছিল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা ও আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের সবচেয়ে বড় বিজয়। (এ সমীকরণ বলে, বিকিরিত শক্তি তাপমাত্রা চতুর্থ ঘাতের সমানুপাতিক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি প্রদান করলে একটি বস্তু কী পরিমাণ বিকিরণ নির্গত করবে। পাশাপাশি এও বলে দেয়, বস্তুটি কতটা উত্তপ্ত হবে। পদার্থবিদ্যার এ সূত্র ও বাইবেলের যিশাইয় পুস্তকের (Book of Isaiah) একটি অনুচ্ছেদ কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদরা হিসাব করেছিলেন, স্বর্গের তাপমাত্রা ৫০০ ডিগ্রি কেলভিনের বেশি।

#### চিত্র ৪৫: পানিতে ব্যতিচারের দৃশ্য

চিত্র ৪৬: আলোর ব্যতিচার। বইটাকে পাশে ঘুরিয়ে পৃষ্ঠা বরাবর তাকালে ব্যতিচার নকশা দেখা যাবে।

তবে এ বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হলো না। শতাব্দী পার হলে দুজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ তরঙ্গ তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে একটি সরল সমস্যা সমাধান করতে চাইলেন। হিসাবটা মোটামুটি সোজাসাপ্টাই ছিল। তাঁরা বের করতে চাইলেন, একটি ফাঁকা গর্ত কতটুকু আলো বিকিরণ করে। ব্যবহার করলেন পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার মৌলিক সমীকরণ। যা বলে দেয়, অণুরা কতটুকু লাফালাফি করে। পাশাপাশি ব্যবহার করলেন তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ার সমীকরণ, যা বলে দেয়, আলো কীভাবে লাফায়। এর মাধ্যমে তাঁরা পেলেন আরেকটি সমীকরণ। যা বলে দিল, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গর্তের আলো কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণ দেবে।

দুই পদার্থবিদ লর্ড রেলি ও জেমস জিন্সের নামে এ সমীকরণের নাম রেলি-জিন্স সূত্র। বেশ ভাল কাজ করছিল সূত্রটা। উত্তপ্ত বস্তু থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম শক্তির আলোর পরিমাণ বের করতে সূত্রটা ভালোভাবে কাজ করছিল। কিন্তু উচ্চশক্তিতে সমীকরণটা ভুল ফল দিয়ে ফেলে। রেলি-জিন্স সূত্র বলে, একটি বস্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ক্রমেই বেশি করে আলো নির্গত করতে থাকে। ফলে শক্তিও বেশি বেশি নির্গত করে। ফলে শূন্যের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বস্তুটি অসীম পরিমাণ উচ্চশক্তির আলো প্রদান করে। রেলি-জিন্স সমীকরণ অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরিত করছে। এটা বস্তুর তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না। এমনকি একটি বরফখণ্ডও প্রচুর পরিমাণ অতিবেগুনি, এক্স ও গামা রশ্মি বিকিরিত করে। যা দিয়ে চারপাশে সবকিছুকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এ সমস্যার নাম ছিল অতিবেগুনি বিপর্যয় (ultraviolet catastrophe)। শূন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অসীম শক্তির সমান। এক গুচ্ছ সুন্দর সূত্রকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছিল শূন্য ও অসীম। এ সমস্যাটাই অল্পদিনের মধ্যে পদার্থবিদ্যার প্রধান ধাঁধা হয়ে গেল।

রেলি ও জিন্স ভুল কিছু করেননি। তারা যে সমীকরণ ব্যবহার করেছেন, পদার্থবিদরা তাকে সঠিক বলেই জানতেন। তারা সমীকরণ নিয়ে কাজ করেছেন নিয়ম মেনেই। কিন্তু যে উত্তর পেলেন তা বাস্তব বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরফখণ্ড গামা রশ্মি দিয়ে সভ্যতা ধ্বংস করে না। যদিও সেসময়ের পদার্থবিদ্যার সূত্র এমন ফলাফলের দিকে ঠেলে দেয়। পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকে তো তাহলে ভুল হতেই হবে। সেটি কোনটি?

#### কোয়ান্টাম শূন্য: অসীম শক্তি

পদার্থবিদরা মনে করেন ভ্যাকুয়ামের মধ্যে সব কণা ও বল সুপ্ত আছে। দর্শনের শূন্যের চেয়ে এটা অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

— স্যার মার্টিন রিজ

অতিবেগুনি বিপর্যয় থেকে জন্ম কোয়ান্টাম বিপ্লবের। আলোর চিরায়ত তত্ত্ব থেকে শূন্যকে বিদায় করল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুখণ্ড থেকে বের হওয়া অসীম শক্তি দূর হলো। তবে এটা তেমন বড় কোনো বিজয় ছিল না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় শূন্যের অর্থ হলো পুরো মহাবিশ্ব—এমনকি ভ্যাকুয়ামেও আছে অসীম পরিমাণ শক্তি। এর নাম শূন্য-বিন্দু শক্তি। আর এ থেকেই মহাবিশ্বের সবচেয়ে অদ্ভুত শূন্যের উৎপত্তি। শূন্যতার ভূতুড়ে শক্তি।

১৯০০ সালে জার্মান পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীরা অতিবেগুনি বিপর্যয় নিয়ে জানার চেষ্টা করেন। তারা নিবিড়ভাবে পরিমাপ করলেন, বিভিন্ন তাপমাত্রায় একটি বস্তু থেকে কী পরিমাণ বিকিরণ বের হয়। দেখা গেল, রেজি-জিন্স সূত্র দিয়ে আসলে বস্তু থেকে আসা আলোর সঠিক পরিমাণ বের করা যায় না। তরুণ পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নতুন উপাত্ত খতিয়ে দেখলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি করলেন নতুন একটি সমীকরণ। রেলি-জিন্স সূত্রকে হটিয়ে জায়গা দখল করল এ সমীকরণ। প্ল্যাঙ্কের সূত্র নতুন পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলো। তারচেয়ে বড় কথা হলো, সমাধান করল অতিবেগুনি বিপর্যয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে প্ল্যাঙ্কের সূত্র লাফ মেরে অসীমে চলে গেল না। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে শক্তি বড় থেকে আরও বড় হওয়ার বদলে কমতে থাকল (চিত্র ৪৭)। তবে দূর্ভাগ্য পিছু লেগেই রইল। প্ল্যাঙ্কের সূত্র ঠিকই ছিল। তবে এর নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে আছে অতিবেগুনি বিপর্যয়ের চেয়েও বড় ঝামেলা।

চিত্র ৪৭: রেলি-জিন্স সূত্র অসীমের দিকে নিয়ে যায়। তবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র সসীম থাকে।

সমস্যা সৃষ্টির কারণ, প্ল্যাঙ্কের সূত্র পদার্থবিদ্যার পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার সাধারণ অনুমান (assumption) থেকে আসেনি। প্ল্যাঙ্কের সূত্র তৈরি করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার সূত্রে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। প্ল্যাঙ্ক পরে বলেছিলেন, কাজটি তিনি করেছেন মরিয়া ও বেপরোয়া হয়ে। কারণ বেপরোয়া না হলে একজন পদার্থবিদ পদার্থবিদ্যার সূত্রে এমন দৃশ্যত খামখেয়ালী কাজ করবেন না। প্ল্যাঙ্কের মতে, অণুদের জন্য বেশিরভাগ পথে চলাচল নিষিদ্ধ। কোয়ান্টা নামে শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্বীকৃত শক্তিতে তারা কম্পিত হতে পারে। এই স্বীকৃত মানের মাঝামাঝি অন্য কোনো মান থাকা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটাকে অদ্ভুত কোনো অনুমান মনে নাও হতে পারে। তবে বিশ্বকে দেখে এভাবে কাজ করে বলে মনে হয় না। প্রকৃতি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না। পাঁচ ফুট আর ছয় ফুটের মাঝামাঝি উচ্চতার কোনো মানুষ থাকবে না—এমনটা ভাবা বোকামি। একটা গাড়ি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলবে, অথবা ৪০ মাইল, কিন্তু ৩৩ বা ৩৮ মাইলে চলবে না—এটা অদ্ভুত কথা। তবে কোয়ান্টাম গাড়ি ঠিক এভাবেই চলে। হয়তো আপনি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলছেন। কিন্তু অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেই বুম! পৌঁছে যাবেন ৪০ মাইল বেগে। এর মাঝে অন্য কোনো বেগ নেই। ফলে ৩০ থেকে ৪০-এ যেতে হলে আপনাকে দিতে হবে *কোয়ান্টাম লাফ*। একইভাবে কোয়ান্টাম মানুষ এত সহজে বড় হতে পারে না। কয়েকবছর তারা থাকবে চার ফুট লম্বা। এরপর হঠাৎ করে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে বুম! উচ্চতা হয়ে যাবে পাঁচ ফুট<sup>১</sup>। কোয়ান্টাম অনুকল্প আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব অভিজ্ঞার বিপরীত।

প্রকৃতির কাজের সাথে বিপরীতধর্মী মনে হলেও প্ল্যাঙ্ক বললেন, আণবিক কম্পন কোয়ান্টায়িত। তবে এ অদ্ভুত অনুকল্পের মাধ্যমেই পাওয়া গেল বস্তু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্কের সঠিক সূত্র। সূত্রটা যে সঠিক তা বুঝতে পদার্থবিদদেরও সময় লাগেনি। কিন্তু তবু তারা কোয়ান্টাম অনুকল্প মেনে নেননি। কথাটা যে বড় বেশি অদ্ভুত!

কোয়ান্টাম অনুকল্পকে অদ্ভুত ধারণা থেকে স্বীকৃত সত্যে রূপ দেন এমন একজন মানুষ যার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি তখন প্যাটেন্ট অফিসের ২৬ বছর বয়স্ক এক কেরানি। তিনিই পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বকে দেখালেন, প্রকৃতি মসৃণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, কাজ করে কোয়ান্টায়। পববর্তীতে নিজের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ তত্ত্বের প্রধান বিরোধীও হন তিনি নিজেই।

আইনস্টাইনকে দেখে মোটেও বৈপ্লবিক মানুষ মনে হয়নি। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যখন পদার্থবিজ্ঞান জগতে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আইনস্টাইন তখন চাকরি খুঁজতে খুঁজতে জুতার তলা ক্ষয় করছিলেন। অর্থের অভাবে পড়ে সুইশ প্যাটেন্ট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরি নেন। কাজিষ্ঠত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির চেয়ে যা অনেক নিম্নমানের। ১৯০৪ সালের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ও পুত্রসন্তানের বাবা হন। প্যাটেন্ট অফিসে খেটে মরছেন। মহান কিছু করার পথ কালেভদ্রেই এমন হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের মার্চে তিনি এমন একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। এ গবেষণাপত্রে তিনি আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার (photoelectric effect) ব্যাখ্যা দেন। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও সবার নজর কাড়ে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বীকৃতি পেল শূন্যের রহস্যময় শক্তিও।

১৮৮৭ সালে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারটা করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইনরিচ হার্সস। তিনি দেখলেন, অতিবেগুনি আলোর একটি রশ্মি প্লেটে স্ফুলিঙ্গ (spark) তৈরি করতে পারে। ধাতব প্লেটে আলো পড়লে সেখান থেকে ইলেকট্রন সহজেই ছিটকে বেরিয়ে আসে। আলোকরশ্মি দিয়ে স্ফুলিঙ্গ তৈরির এ ব্যাপারটা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। অতিবেগুনি আলোয় থাকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি। ফলে বিজ্ঞানীরা স্বভাবিকভাবেই ধরে নিলেন, পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে বেশ ভালো পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। তবে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে, উচ্চশক্তির আলো তৈরির আরেকটা উপায় আছে। আলোকে করতে হবে উজ্জ্বল। এই যেমন অনেক উজ্জ্বল নীল রংয়ের আলো। এর শক্তিও অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোর শক্তির সমান হতে পারে। অতএব, একটি উজ্জ্বল নীল আলোও ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে বের করতে পারা উচিত। ঠিক যেমন পারে অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলো।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা জানতে সময় লাগেনি। (উচ্চ কম্পাঙ্কের) অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোও ধাতব প্লেট থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে পারে। কিন্তু কম্পাঙ্ক কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তি মানের নিচে আনলে—আলোকে কিছুটা বেশিই লালের দিকে নিয়ে আসলে—হঠাৎ করে স্ফুলিঙ্গ তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। আলো যতই উজ্জ্বল হোক, আলোর রং সঠিক না হলে ইলেকট্রন আটকেই থাকে। কেউ বের হয় না। আলোর তরঙ্গ এমন কাজ করার কথা নয়।

আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার এ ধাঁধার সমাধান করলেন আইনস্টাইন। তবে তাঁর সমাধান প্ল্যাঙ্কের অনুকল্পের চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক ছিল। প্ল্যাঙ্ক প্রস্তাব করেছিলেন, অণুর কম্পন কোয়ান্টায়িত। আইনস্টাইন বললেন, আলো নির্গত হয় ফোটন নামের ছোট ছোট প্যাকেট অব গুচ্ছ আকারে। এ ধারণা আলোর স্বীকৃত ধর্মের বিপরীত। কারণ আইনস্টাইনের কথা মানলে মানতে হয়, আলো তরঙ্গ নয়।

কিন্তু অন্যদিকে আলোকশক্তিকে ক্ষুদ্র প্যাকেটের গুচ্ছ ধরে নিলে আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সহজ হয়ে যায়। আলো কাজ করে ছোট্ট বুলেটের মতো। আঘাত হানে ধাতুতে। বুলেট গিয়ে ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়। বুলেটের যথেষ্ট শক্তি থাকলে—কম্পাঙ্ক যথেষ্ট বড় হলে—এটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে আনে। অন্যদিকে আলোককণার শক্তি যথেষ্ট না হলে এর ধাক্কাই ইলেকট্রন মুক্ত হয় না। আলোককণা বরং ধাক্কা খেয়ে সরে যায়।

আইনস্টাইনের এ চিন্তার মাধ্যমে আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দারুণ ব্যাখ্যা মিলল। আলো ফোটন কণায় কোয়ান্টায়িত। যা তরঙ্গতত্ত্বের সরাসরি বিরোধী। অথচ আগের এক শ বছরের বেশি সময় ধরে তত্ত্বটার রাজত্ব। আসলে দেখা যাচ্ছে, আলোর কণা ও তরঙ্গ দুই রকম ধর্মই আছে। আলো কখনও কণার মতো আচরণ করলেও অন্যসময় আবার তরঙ্গের মতো আচরণ করে। সত্যি বলতে আলো না কণা, না তরঙ্গ। দুইয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এ ধারণাটা বোঝা সহজ কাজ নয়। তবে কোয়ান্টাম তত্ত্বের একদম কেন্দ্রীয় অংশই এটা।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে, আলো, ইলেকট্রন, প্রোটন, কুইক—সবারই কণা ও তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বস্তু একইসাথে কণা ও তরঙ্গ হলে আসলে সেটি কী জিনিস? গণিতবিদরা এদের সমীকরণ জানেন। এদের নাম তরঙ্গ ফাংশন। শ্রোডিংগার সমীকরণের অন্তরক সমাধান। তবে দূর্ভাগ্যের কথা হলো, এ গাণিতিক বর্ণনার কোনো সহজাত ব্যাখ্যা নেই। এ তরঙ্গ ফাংশনগুলোকে বাস্তবে দেখা অসম্ভব<sup>১</sup>। এর চেয়ে খারাপ কথা হলো, পদার্থবিদরা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার ভেতরে যেতে যেতে অদ্ভুত থেকে অদ্ভুততর জিনিসের দেখা পেতে লাগলেন। তবে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় শূন্যই সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারের জন্ম দিয়েছে। ব্যাপারটার নাম জিরো-পয়েন্ট এনার্জি।

অদ্ভুত এ বল কোয়ান্টাম বিশ্বের গাণিতিক সমীকরণের মধ্যেই গাঁথে আছে। ১৯২০-এর দশকে জার্মান পদার্থবিদ ভার্নার হাইজেনবার্ক দেখেন, এ সমীকরণগুলো অবাক করা এক ফল দেয়। এগুলোয় মিশে আছে অনিশ্চয়তা। শূন্যের শক্তির জন্ম দেয় হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি। বিজ্ঞানীদের কণার বৈশিষ্ট্য জানার সক্ষমতার সীমা বেঁধে দেয় অনিশ্চয়তা নীতি। যেমন ধরুন, একটি নির্দিষ্ট কণা সম্পর্কে জানতে হলে এর অবস্থান ও বেগ জানা প্রয়োজন। জানতে হবে কণাটা কোথায় আছে। এর বেগ কত। হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি বলে, এ সোজা কাজটাও আমরা করতে পারব না। আমরা শতচেষ্টা করেও একইসাথে একটি কণার বেগ ও অবস্থান শতভাগ নির্ভুলভাবে জানতে পারব না। কারণ পরিমাপ করার চেষ্টাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্যকে নষ্ট করে দেয়।

কোনোকিছু মাপতে গেলে একে স্পর্শ করতে হয়। ধরুন, আপনি একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মাপছেন। পেন্সিল বরাবর আঙ্গুলটা রেখে এর দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে। তবে সেটা করতে গিয়ে পেন্সিলে একটু ধাক্কা লাগতে পারে। ফলে পেন্সিলের বেগ হালকা বদলে যাবে। আরেকটু ভাল কৌশল হবে পেন্সিলের পাশে আলতো করে একটি রুলার রাখা। তবে আসলে কিন্তু দুটি বস্তুর দৈর্ঘ্য তুলনা করতে গেলেই পেন্সিলের বেগ কিছুটা পাল্টে যাবে। আপনি পেন্সিলকে দেখবেন এটা থেকে আসা আলো দেখে। পেন্সিল থেকে আসা আলোও পেন্সিলকে উত্তেজিত করে। এ উত্তেজনা খুব মৃদু হলেও তা পেন্সিলকে খানিকটা সরিয়ে দেয়। কিঞ্চিৎ পাল্টে যায় পেন্সিলের বেগ। যে উপায়েই আপনি পেন্সিলের বেগ মাপুন না কেন, এতে হালকা ধাক্কা লাগবেই। হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি বলে, পেন্সিল বা ইলেকট্রনের দৈর্ঘ্য ও বেগ একইসাথে শতভাগ নির্ভুল করে জানার কোনো উপায় নেই। অবস্থান যত ভাল জানবেন, বেগ সম্পর্কে তত কম জানবেন। আবার বেগ ভালভাবে জানলে, অবস্থানের তথ্য লেগে যাবে গড়বড়। একটি ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ভুলভাবে (শূন্য ভুল) জানলে জানা যাবে এটি নির্দিষ্ট একটি সময়ে ঠিক কোথায় আছে। সেক্ষেত্রে এটি কী বেগে চলছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানা যাবে না (শূন্য তথ্য)। আর এর বেগ অসীম নির্ভুলভাবে জানলে (শূন্য ভুল) এর অবস্থানের পরিমাপে হবে অসীম ভুল। এটা ঠিক কোথায় আছে তা একটুও জানা যাবে না<sup>২,৪</sup>। আপনি কখনোই দুটো একসঙ্গে জানতে পারবেন না। একটা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানলেই আরেকটি অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এটা আরেকটি অলঙ্ঘনীয় (unbreakable) সূত্র।

হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি যে শুধু মানুষের পরিমাপেই বাগড়া দেয় তা নয়। তাপগতিবিদ্যার সূত্রের মতোই এ সূত্রটাও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। অনিশ্চয়তার কারণে মহাবিশ্ব শক্তিতে ভরপুর থাকে। স্থানের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশের কথা কল্পনা করুন। ধরুন, অনেক অনেক ছোট একটি বক্স। বক্সের মধ্যে কী চলছে সেটা নিয়ে কাজ করলে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। যেমন আমরা অনেকটা নির্ভুলভাবে কণাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে জানি। আর যাই হোক, এরা তো বক্সের ভেতরেই আছে। আমরা জানি, এরা নির্দিষ্ট একটি আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ আছে। বাইরে থাকলে তো আর আমরা

এদের দিকে তাকাতাম না। এর অর্থ দাঁড়াল, আমরা কণাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানি। তাই হাইজেনবার্কে অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, কণাগুলোর বেগ ও শক্তি সম্পর্কে আমরা অনিশ্চিত হয়ে যাব। বস্তুকে আরও ছোট করতে থাকলে আমরা কণার শক্তি সম্পর্কে জানব আরও আরও কম।

এই যুক্তি মহাবিশ্বের সর্বত্রই সত্য। চাই তা পৃথিবীর কেন্দ্রে, কিংবা স্থানের গভীরতম ভ্যাকুয়ামে। এর অর্থ দাঁড়ায়, যথেষ্ট ক্ষুদ্র স্থানের, এমনকি ভ্যাকুয়ামেরও শক্তি সম্পর্কে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু ভ্যাকুয়ামের শক্তির অনিশ্চয়তার ব্যাপারটা হাস্যকর শোনায। সংজ্ঞা অনুসারেই ভ্যাকুয়ামে কিছু নেই। নেই কোনো কণা, আলো বা অন্য কিছু। অতএব, ভ্যাকুয়ামের তো কোনো শক্তিই থাকার কথা নয়। এরপরেও হাইজেনবার্কে অনিশ্চয়তা নীতি বলছে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভ্যাকুয়ামের একটি আয়তনে কতটুকু শক্তি আছে তা আমরা বলতে পারব না। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি ভ্যাকুয়ামের শক্তিও প্রতি মুহূর্তে ওঠানামা (fluctuation) করতে থাকবে।

ভ্যাকুয়ামে নেই কোনো কিছু। সেখানে আবার শক্তি থাকতে পারে কীভাবে? উত্তরটা আসে আরেকটি সমীকরণ থেকে। আইনস্টানের বিখ্যাত ভর-শক্তি সমীকরণ:  $E = mc^2$ । সরল এ সূত্র ভর ও শক্তিকে জোড়া দেয়। বস্তুর ভর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির সমতুল্য। (কণাপদার্থবিদরা ইলেকট্রনের মতো কণার ভর পাউন্ড বা কেজিতে মাপেন না। ভর বা ওজনের প্রচলিত অন্য কোনো এককও ব্যবহার করেন না। তাঁরা বলেন, ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর হলো  $0.511$  মেগাইলেকট্রন ভোল্ট—MeV)। ভ্যাকুয়ামের শক্তির ওঠানামা আর ভরের ওঠানামা একই কথা। কণারা প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্ব পাচ্ছে ও হারাচ্ছে। লুই ক্যারোলের *অ্যালিস ইন দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড* উপন্যাসের চেমায়ার বিড়ালের মতো। ভ্যাকুয়াম কখনোই সত্যিকারের শূন্য নয়। বরং ভার্চুয়াল কণায় ভর্তি। স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে অসীম কণা প্রতি মুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। এটাই জিরো-পয়েন্ট এনার্জি বা শূন্য-বিন্দুর শক্তি। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসীম। সুস্পষ্ট করে বললে শূন্য-বিন্দুর শক্তির পরিমাণ সীমাহীন। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সমীকরণ অনুসারে, কয়লা খনি, তেলক্ষেত্র বা নিউক্লীয় অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তি আছে একটি কাঠির ভেতরে।

সাধারণত সমীকরণে অসীম থাকলে পদার্থবিদরা ধরে নেন, কোথাও ভুল হয়েছে। অসীমের নেই কোনো ভৌত বা বাস্তব অর্থ। শূন্য-বিন্দুর শক্তিও ব্যতিক্রম নয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী একে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। তারা ধরেই নেন, শূন্য-বিন্দুর শক্তির মান শূন্য। যদিও তাঁরা জানেন এটা আসলে অসীম। এটা একটি সুবিধাজনক কল্পনা। সাধারণত এর কোনো গুরুত্বই নেই। তবে কখনও আবার আছে। ১৯৪৮ সালে দুজন ডাচ পদার্থবিদ সেটা বুঝতে পারেন। হেনড্রিক কাজিমির ও ডার্ক পোল্ডার বুঝতে পারেন, শূন্য-বিন্দুর শক্তিকে সবসময় উপেক্ষা করা যাবে না। তাঁরা পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল নিয়ে কাজ করছিলেন। দেখলেন, পরিমাপকৃত বল মিলছে না সূত্রের অনুমানের সাথে। ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে কাজিমির টের পান, তিনি শূন্যের শক্তি অনুভব করেছেন।

কাজিমির বলের (casimir force) রহস্য তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরাস তার টেনে উপরে-নিচে ওঠানামা করা তরঙ্গের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক জেনেছিলেন। দেখেছিলেন, কিছু সুর ওঠে, কিছু আবার নিষিদ্ধ। একটি তারকে বাজালে পরিষ্কার সুর শোনা যায়। এর নাম মৌলিক সুর। আঙ্গুলকে আলতো করে তারের মাঝে রেখে টান দিলে আরেকটি সুন্দর ও পরিষ্কার সুর শোনা যাচ্ছে। এবারের সুরটা মৌলিক সুরের ওপরে অষ্টক। একতৃতীয়াংশ নিচে আছে আরেকটি সুন্দর সুর। কিন্তু পিথাগোরাস বুঝতে পারেন, সবখানে সুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। তারের মধ্যে ইচ্ছামতো কোথাও আঙ্গুল রাখলে খুব কমই পরিষ্কার সুর পাওয়া যায়। তারে শুধু নির্দিষ্ট কিছু সুরই সম্ভব। বেশিরভাগ জায়গায়ই সুর নেই (চিত্র ৪৮)।

বেশিরভাগ তরঙ্গই তারের তরঙ্গের মতো করেই কাজ করে। নির্দিষ্ট আকারের গিটারের তার সম্ভাব্য সব রকম সুর তুলতে পারে না। কিছু কিছু তরঙ্গ "নিষিদ্ধ"। একইভাবে কণার কিছু তরঙ্গের জন্য বস্তুর ভেতরে থাকা নিষিদ্ধ। এই যেমন, দুটি

ধাতব প্লেটকে কাছাকাছি রাখলে সব ধরনের কণাকে এদের মাঝখানে জায়গা দেওয়া যাবে না। বক্সের আকারের সাথে তরঙ্গের আকার মিলে গেলেই শুধু সে তরঙ্গ বক্সের ভেতরে থাকার সুযোগ পাবে (চিত্র ৪৯)।

চিত্র ৪৮: গিটারের তারে নিষিদ্ধ সুর।

কাজিমির বুঝতে পারেন, নিষিদ্ধ কণাতরঙ্গ ভ্যাকুয়ামের শূন্য-বিন্দুর শক্তিকে প্রভাবিত করবে। কারণ কণারা সর্বত্র আবির্ভূত ও উধাও হচ্ছে। দুটি ধাতব প্লেটকে কাছাকাছি রাখলে কিছু কিছু কণা দুই প্লেটের মাঝখানে থাকার অনুমতি পাবে না। ফলে প্লেটের ভেতরের চেয়ে বাইরে কণার সংখ্যা বেশি। প্লেটের বাইরের কণার ঝাঁক প্লেটকে বাইরে থেকে ধাক্কা দেবে। ভেতরে থেকে সে ধাক্কার জবাব দেওয়ার মতো কণার অভাব থাকায় প্লেট দুটো একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। কাজটা ঘটবে গভীরতম ভ্যাকুয়ামেও। এটাই ভ্যাকুয়ামের শক্তি। যে শক্তির উৎস শূন্যতা। এটাই কাজিমির প্রভাব।

চিত্র ৪৯: কাজিমির প্রভাব

কাজিমির প্রভাবের কথা শুনতে কল্পকাহিনী মনে হয়। কিন্তু শূন্যতা থেকে সৃষ্ট এ রহস্যময়র ভূতুড়ে বলের অস্তিত্ব বাস্তব। এ বলের পরিমাণ খুব ক্ষুদ্র। পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ১৯৯৫ সালে স্টিভেন ল্যামোর সরাসরি এটা পরিমাপ করেন। তিনি স্বর্ণ দিয়ে আবৃত দুটি প্লেটকে সংবেদনশীল মোচড়-পরিমাপকের মধ্যে স্থাপন করেন। পরিমাপ করে দেখেন, কাজিমির বলকে প্রতিহত করতে কতটুকু বল প্রয়োজন হয়। প্রাপ্ত উত্তর মিলে যায় কাজিমির তত্ত্বের সাথে। একটি পিপড়াকে ত্রিশ হাজার ভাগ করলে এর যতটা ওজন হবে তার প্রায় সমান এ বল<sup>৫</sup>। ল্যামোর শূন্যস্থানের তৈরি বল পরিমাপ করলেন।

## আপেক্ষিকীয় শূন্য: ব্ল্যাকহোল

[নক্ষত্রটা] চেশায়ার বিড়ালের মতো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। একটি পেছনে রেখে গেল এর দেঁতো হাসি। আরেকটি রেখে গেল শুধু মহাকর্ষীয় আকর্ষণ।

—জন হুইলার

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় শূন্য ভ্যাকুয়ামে অসীম শক্তি সরবরাহ করে। আরেক আধুনিক তত্ত্ব আপেক্ষিকতায় শূন্য অন্য একটি প্যারাডক্সের জন্ম দেয়। ব্ল্যাকহোলের অসীম শূন্যতা। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মতোই আপেক্ষিকতার জন্ম আলোর মধ্যে। এক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে আলোর গতি। মহাবিশ্বের বেশিরভাগ বস্তুর গতি সম্পর্কেই সব পর্যবেক্ষক একমত হবেন না। ধরুন, একটি ছেলে বিভিন্ন দিকে পাথর ছুঁড়ছে। ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসা পর্যবেক্ষকের কাছে দূরে সরা পর্যবেক্ষকের চেয়ে পাথরের গতি বেশি মনে হবে। পাথরের বেগ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের গতি ও দিকের ওপর। একইভাবে আলোর বেগও পর্যবেক্ষকের বেগের সাথে সাথে বদলে যাওয়া উচিত। ১৮৮৭ সালে মার্কিন পদার্থবিদ অ্যালবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি এ প্রভাব পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। আলোর বেগে কোনো পার্থক্য না পেয়ে তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যান। সকল দিকেই আলোর গতি একই। এটা কীভাবে সম্ভব?

সেই ১৯০৫ সালেই সেই তরুণ আইনস্টাইনই উত্তরটা দিলেন। আবারও দেখা গেল, সরল কিছু অনুমান বড় ফলাফল প্রদান করে। আইনস্টাইনের প্রথম অনুমানটা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যায়। আইনস্টাইন বললেন, কিছুসংখ্যক মানুষ একটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে সে ঘটনায় পদার্থবিদ্যার সূত্র সবার জন্য একই হবে। যেমন ধরুন, একটু কাক মাটি থেকে উড়ে গাছে চলে গেল। আপনি এ ঘটনা সম্পর্কে দুজন মানুষের বর্ণনা নিলেন। একজন মানুষ আছেন ভূমিতে। আরেকজন চলন্ত ট্রেনে। দুজনের জন্য পদার্থবিদ্যার সূত্র একই হবে। তবে তারা কাকের ও গাছের গতি সম্পর্কে ভিন্ন মত দেবে।

যদিও কাকের উড্ডয়নের শেষ পরিণতি দুজনের কাছে একই। কয়েক সেকেন্ড পরে কাক পৌঁছে যাবে গাছে। শেষ ফলের ব্যাপারে দুই পর্যবেক্ষক একমত। যদিও কিছু ব্যাপারে দুজনের মতের পার্থক্য থাকবে। এটাই আপেক্ষিকতার নীতি। (আপাতত আমরা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (special theory of relativity) নিয়ে কথা বলছি। এ তত্ত্বে গতির ধরনে কিছু বিধিনিষেধ আছে। প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে সরল রেখায় নির্দিষ্ট বেগে চলতে হবে। অন্য কথায়, তাদের বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া চলবে না। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে এ বিধিনিষেধ দূর করা হয়।)

দ্বিতীয় অনুমানটিকে আরেকটু বেশি গোলমেলে মনে হয়। তার ওপর দেখে মনে হবে, এটি আপেক্ষিকতার নিয়মেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আইনস্টাইন বললেন, বেগ যাই হোক না কেন, ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানে আলোর বেগের ব্যাপারে সবাই একমত হবে। এ বেগের মান সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। গ্রন্থ এ মানকে  $c$  দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কেউ আপনার দিকে আলো ফেললে সে আলো আপনার দিকে ছুটে আসবে  $c$  বেগে। আলো ফেলা মানুষটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে, নাকি আপনার দিকে বা বিপরীত দিকে ছুটছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আলোকরশ্মি সবসময় আপনার বা যেকারো দৃষ্টিতে  $c$  বেগে চলে।

বস্তুর গতি সম্পর্কে পদার্থবিদদের জানা সবকিছুকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল এ অনুমান। কাক আলোর মতো আচরণ করলে ট্রেনে ও বাইরে দাঁড়ানো দর্শক কাকের গতি সম্পর্কে একমত হতে হবে। এর অর্থ হবে, কাকের গাছে পৌঁছানোর সময় সম্পর্কে দুই পর্যবেক্ষক ভিন্ন কথা বলবেন (চিত্র ৫০)। আইনস্টাইন বুঝলেন, এ সমস্যা দূর করার একটি উপায় আছে। ধরে নিত হবে, পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভর করে সময়ের প্রবাহ পাল্টে যায়। স্থির ঘড়ির তুলনায় ট্রেনের ঘড়ির কাঁটা ধীরে চলবে। ভূমিতে অতিবাহিত দশ সেকেন্ড ট্রেনে থাকা কারও কাছে মাত্র পাঁচ মিনিট মনে হতে পারে। দ্রুত বেগে ছুটে চলা কারও কাছেও একই ব্যাপার মনে হবে। তার হাতে থাকা স্টপওয়াচের প্রতিটি টিক স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে এক সেকেন্ডের বেশি সময় পরে হবে বলে মনে হবে। ধরুন, একজন মহাকাশচারী আলোর বেগের ৯০ ভাগ বেগে ২০ বছর (তার নিজের ঘড়ি অনুসারে) ভ্রমণ করে এলেন। ২০ বছর বয়স বাড়িয়ে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু পৃথিবীতে থাকা বাকি সবার বয়স বাড়বে ৪৬ বছর।

চিত্র ৫০: কাকের গতিবেগ গ্রন্থ থাকার অর্থ, সময় অবশ্যই আপেক্ষিক হবে।

গতির সাথে সাথে শুধু সময়ই বদলায় না, বদলে যায় দৈর্ঘ্য এবং ভরও। গতি বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর দৈর্ঘ্য কমে এবং ভর বাড়ে। আলোর ৯০ ভাগ গতিতে স্থির দর্শকের কাছে এক গজের কাঠির দৈর্ঘ্য হবে মাত্র ০.৪৪ গজ। এক কেজি ভরের এক ব্যাগ চিনি হবে ২.৩ কেজি। (তবে এর মানে এ নয়, আপনি একই ব্যাগ দিয়ে বেশি বিস্কুট বানাতে পারবেন। ব্যাগের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাণ ও ভর একই থাকবে।)

সময়প্রবাহের এ পরিবর্তন অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। অতিপারমাণবিক কণারা দ্রুত চললে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার আগে এটি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় টিকে থাকে। কারণ এর সময় ধীরে চলে। দ্রুতবেগে চলা বিমানের মধ্যে সূক্ষ্ম ঘড়িকে ধীরে চলতে বাস্তবে দেখা গেছে<sup>৬</sup>। আইনস্টাইনের তত্ত্ব কাজ করে। কিন্তু তাও একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সেটা আর কিছুই নয়, শূন্য।

যানের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হলে সময় অনেক অনেক বেশি ধীর হয়ে যায়। যান আলোর বেগে চললে যানের ভেতরের ঘড়ির একটি টিক হতে হতে বাইরে অসীম সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। এক সেকেন্ডেরও অনেক ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে লক্ষ-কোটি বছর পার হয়ে যাবে। ততদিনে মহাবিশ্ব এর অন্তিম ভাগ্য বরণ করে ফেলবে। হয়ে যাবে ধ্বংস। যানের ভেতরের মহাকাশচারীর জন্য সময় থেমে যাবে। সময়ের প্রবাহ গুন হবে শূন্য দিয়ে।

তবে সময়কে থামিয়ে অত সহজ কথা নয়। যানের বেগ বাড়তে থাকলে সময় ক্রমেই ধীর হতে থাকে। তবে একইসাথে যানের ভরও বাড়তে থাকে। ব্যাপারটা যেন এমন: আপনি একটি বেবি ক্যারিয়েজকে ঠেলছেন। আর বাচ্চাটা ক্রমেই বড় হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তো আপনি যাকে ঠেলছেন, সে কোনো বাচ্চা নয়, এক সুমো কুস্তিবিদ। এখন আর তাকে ঠেলে নেওয়া সহজ নয়। এরপরেও তার বেগ বাড়ানো গেলে বাচ্চার ভর বেড়ে হবে গাড়ির সমান। তারপর জাহাজ ও তারপর পুরো এক গ্রহের সমান। আর তারপর...নক্ষত্র, ছায়াপথ। বাচ্চার ভর বড় হওয়ার সাথে সাথে ঠেলার প্রভাব কমতে থাকবে। একইভাবে মহাকাশযানেরও বেগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্রমেই আলোর বেগের কাছাকাছি নিতে পারবেন। কিন্তু এক সময় এর ভর হবে বিশাল। ফলে আর বেগ বাড়ানো সম্ভবই হবে না। মহাকাশযান বা ভরবিশিষ্ট যেকোনো বস্তুই আসলে কখনও আলোর বেগকে ধরতে পারবে না। আলোর বেগ হলো বেগের চূড়ান্ত সীমা। আপনি কখনোই এর সমান বেগ অর্জন করতে পারবেন না। ছাড়িয়ে যাওয়া তো আরও পরের কথা। প্রকৃতি নিজেকে দুষ্ট শূন্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

তবে প্রকৃতি কি আসলেই শূন্যের সাথে পেরে ওঠেছে? আইনস্টাইন নিজেই আপেক্ষিকতাকে বর্ধিত করে মহাকর্ষকে যুক্ত করেন<sup>৭</sup>। তিনি ভুলেও ভাবেননি, আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের এ নতুন সমীকরণগুলো চূড়ান্ত শূন্যকে ডেকে নিয়ে আসবে। আরও আনবে সবচেয়ে খারাপ অসীমকে। বলছি ব্ল্যাকহোলের কথা।

আইনস্টাইনের সমীকরণ স্থান ও কালকে একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন দিক হিসেবে দেখে। এমনতেই আমরা জানি, বেগ বাড়ালে (ত্বরণ অর্জন করলে) স্থান মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ধরনে পরিবর্তন আসে। বেগ বাড়তে বা কমতে পারে। আইনস্টাইনের সমীকরণ দেখাল, ত্বরণ স্থানের পাশাপাশি সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন আনে। ত্বরণের কারণে সময় দ্রুত বা ধীরে প্রবাহিত হতে পারে। ফলে কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগ করে ত্বরণ দিলে (সেটা হোক মহাকর্ষ কিংবা অন্য কোনো ত্বরণ বা পরিবর্তনশীল বেগ) স্থান ও সময়ের মধ্যে এর গতি বদলে যাবে। মানে বদলে যাবে স্থান-কাল।

ধারণাটা বোঝা সহজ নয়। তবে স্থান-কাল বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো একটি উপমা। স্থান-কাল বিশাল এক খণ্ড রাবারের চাদরের সাথে তুলনীয়। গ্রহ, নক্ষত্র ও বাকি সবকিছু সে চাদরে অবস্থিত। ফলে চাদর একটু বিকৃত হয়। চাদরে অবস্থিত বস্তুর সৃষ্ট বিকৃতি বা বক্রতাই মহাকর্ষ। চাদরে যত ভারী বস্তু থাকবে, চাদরের বিকৃতিও তত বেশি হবে। বস্তুর চারপাশেও তত বড় টোল পড়বে।

রাবারের চাদরের বক্রতা শুধু স্থানের নয়, সময়েরও বক্রতা। ভারী বস্তু শুধু স্থানকে বাঁকায় না, সময়কেও বাঁকায়। বক্রতা বাড়ার সাথে সাথে বক্রতা বড় থেকে আরও বড় হতেই থাকে। ভরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। স্থানের বেশি বাঁকানো অঞ্চলে প্রবেশ করলে ভরও বাস্তবিক অর্থেই বেড়ে যায়। এ ঘটনার নাম ভর স্ফীতি (mass inflation)।

এ উপমার মাধ্যমে গ্রহের কক্ষপথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। চাদরের মধ্যে সূর্যের সৃষ্ট টোলের মধ্যে পৃথিবী ভেসে চলছে। নক্ষত্রের চারপাশে আলো সরলপথে চলে নয়, চলে বাঁকা পথে। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন এক অভিযানে এটা বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সূর্যগ্রহণের সময় একটি নক্ষত্রের অবস্থান পরিমাপ করেন। দেখতে পান আইনস্টাইনের পূর্বানুমিত বক্রতার নিদর্শন (চিত্র ৫১)।

আইনস্টাইনের সমীকরণ আরও ভয়ঙ্কর জিনিসেরও পূর্বাভাস দেয়। এ জিনিসের নাম ব্ল্যাকহোল। এমন এক নক্ষত্র, যার ঘনত্ব এত বেশি যে এর হাত থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। কাজটি পারে না এমনকি আলোও।

চিত্র ৫১: মহাকর্ষ সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া আলোকে বাঁকিয়ে দেয়।



অন্যসব নক্ষত্রের মতোই ব্ল্যাকহোলের<sup>৮</sup> জীবন শুরু হয় উত্তপ্ত গ্যাসের বিশাল গোলক হিসেবে। গ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে হাইড্রোজেন। স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে গ্যাসের যথেষ্ট বড় একটি গোলক নিজের মহাকর্ষীয় ওজনে চুপসে যাবে। গুটিয়ে গিয়ে ছোট একটি খণ্ডে রূপ নেবে। আমাদের ভাগ্য ভাল, নক্ষত্র গুটিয়ে যায় না। কারণ এতে কাজ করে আরও একটি বল। নিউক্লীয় ফিউশন। গ্যাসীয় মেঘ গুটিয়ে যেতে থাকলে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুরা একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় দ্রুত থেকে দ্রুততর বলে। একসময় নক্ষত্র এত বেশি উত্তপ্ত ও ঘন হয় যে হাইড্রোজেন পরমাণুরা একে অপরের সাথে মিশে যায়। তৈরি হয় হিলিয়াম। এ সময় নির্গত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। এ শক্তির উৎস নক্ষত্রের কেন্দ্র। এর ফলে নক্ষত্র আবার কিছুটা প্রসারিত হয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় নক্ষত্র এ অস্থিতিশীল সাম্যাবস্থায় (equilibrium) থাকে। মহাকর্ষের মাধ্যমে তৈরি গুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিপরীতে কাজ করে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন ফিউশন থেকে সৃষ্ট শক্তি।

এ সাম্যাবস্থা চিরকাল থাকে না। নিজেকে জ্বালানোর জন্য নক্ষত্রের কাছে থাকা হাইড্রোজেনের পরিমাণ তো সীমিত। কিছু সময় পরে ফিউশন প্রক্রিয়া থেমে আসে। নষ্ট হয় সাম্যাবস্থা। (এ প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে নক্ষত্রের আকারের ওপর। নির্মম পরিহাস! বড় নক্ষত্রে বেশি হাইড্রোজেন থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে জীবনকাল হয় ছোট। কারণ এ নক্ষত্র জ্বলেও দ্রুত। সূর্যের হাতে আরও ৫০০ কোটি বছর জ্বলার মতো জ্বালানি আছে। তবে এত দীর্ঘ সময় দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই। তার আগেই সূর্যের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। যাতে উড়ে যাবে সমুদ্রের পানি। পৃথিবী হয়ে যাবে শুক্র গ্রহের মতো বাসের অযোগ্য এক মরুভূমি। পৃথিবীতে আরও ১০০ কোটি বছর প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকলেই আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবতে পারি।) একের পর এক মরণযন্ত্রনা শেষে চূড়ান্ত পরিণতি আবারও নির্ভর করবে ভরের ওপর। নক্ষত্রের ফিউশন যন্ত্র বন্ধ হবে। মহাকর্ষের চাপে নক্ষত্র আবারও চুপসাতে থাকবে।

তবে নক্ষত্রকে চুপসে গিয়ে বিন্দুর সমান হয়ে যাওয়া ঠেকায় কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার একটি সূত্র। নাম পাউলির বর্জন নীতি (Pauli exclusion principle)। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝিতে জার্মান পদার্থবিদ ভলফগ্যাং পাউলি সূত্রটা আবিষ্কার করেন। নীতিটার বক্তব্য অনেকটা এরকম: দুটি জিনিস একইসাথে একই জায়গায় থাকতে পারে না। বিশেষ করে, একই কোয়ান্টাম অবস্থার দুটি ইলেকট্রনকে জোর করেও একই জায়গায় রাখা যাবে না। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় পদার্থবিদ সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর বুঝতে পারেন, মহাকর্ষের চাপের বিপরীতে পাউলির বর্জন নীতির ক্ষমতাও তুচ্ছ।

নক্ষত্রের ভেতরে চাপ বাড়তে থাকলে পাউলির বর্জন নীতি বলে, ইলেকট্রনরা একে অপরকে এড়ানোর জন্য দ্রুত থেকে দ্রুততর চলাচল করতে থাকে। কিন্তু চলাচলের গতির তো একটি সীমা আছে। ইলেকট্রন আলোর চেয়ে বেশি জোরে চলতে পারে না। ফলে একটি বস্তুখণ্ডে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করা হলে একে চুপসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হলে ইলেকট্রনদের যত জোরে ছোটা দরকার তারা সেটা পারে না। চন্দ্রশেখর দেখান, চুপসে যেতে থাকা নক্ষত্রের ভর সূর্যের ১.৪ গুন হলে মহাকর্ষ পাউলির বর্জন নীতিকে পরাজিত করবে। চন্দ্রশেখর সীমার ওপরে মহাকর্ষ হবে ভয়ানক শক্তিশালী। ইলেকট্রনের কিছুই করার থাকবে না। হয়ে যাবে পুরোপুরি অসহায়। ইলেকট্রন গিয়ে ধাক্কা খাবে পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটনের সাথে। তৈরি হবে নিউট্রন। ভারী নক্ষত্রটা শেষ পর্যন্ত নিউট্রন দিয়ে গড়া এক দৈত্যাকার গোলকে পরিণত হবে। এরই নাম নিউট্রন নক্ষত্র।

হিসাব এখানেই থেমে থাকেনি। দেখা যায়, গুটাতে থাকা নক্ষত্রের ভর চন্দ্রশেখর সীমার কিছুটা বেশি হলে ইলেকট্রনদের মতোই নিউট্রনদের চাপ নক্ষত্রকে আরও বেশি গুটিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। নিউট্রন নক্ষত্রে এটাই ঘটে। এ সময় নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্ব এত বেশি হয় যে এক চামচ পরিমাণ পদার্থের ভর হয় কয়েক কোটি টন। তবে নিউট্রন নক্ষত্রেরও চাপ সামলানোর একটি সীমা আছে। কোনো কোনো জ্যোতির্পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, আরেকটু বেশি চাপে নিউট্রন আলাদা হয়ে এর উপদান কোয়ার্ক তৈরি হয়। তৈরি হয় কোয়ার্ক নক্ষত্র। কিন্তু এটাই প্রতিরোধের শেষ বিন্দু। এরপর ঘটে যায় নরক গুলজার।

মাত্রাতিরিক্ত ভারী নক্ষত্র চুপসে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। মহাকর্ষীয় বল হয়ে যায় চরম। পদার্থবিদরা মহাবিশ্বে এমন কোনো বলের কথা জানেন না, যা কিনা নক্ষত্রের সঙ্কোচন ঠেকাতে পারে। ইলেকট্রনের বিকর্ষণ বা নিউট্রন বা কোয়ার্কদের একে অপরের দিকে চাপ কোনো কিছুই কাজটা করতে পারবে না। মুমূর্ষু নক্ষত্র ছোট থেকে আরও ছোট হতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত ... শূন্য। নক্ষত্রটা নিজেকে ঠেসে ঠেসে শূন্য আয়তনের জায়গায় বসিয়ে দেয়। এটাই ব্ল্যাকহোল। যেখানে ঘটে অদ্ভুত সব ঘটনা। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর তো বিশ্বাস, ব্ল্যাকহোল কাজে আগিয়ে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে চলাচল করা যাবে। যাওয়া যাবে অতীতের দিকে।

ব্ল্যাকহোলের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণ এর স্থান-কালের বক্রতার ধরন। ব্ল্যাকহোল একেবারেই কোনো স্থান দখল করে না। কিন্তু এর ভর আছে। ভর থাকায় এটি স্থান-কালকে বাঁকায়। এমনিতে এতে কোনো সমস্যা নেই। ভারী নক্ষত্রের কাছে গেলে বক্রতা বাড়তে থাকবে। কিন্তু নক্ষত্রের বাইরের প্রান্ত অতিক্রম করলে বক্রতা আবার কমবে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে বক্রতা হবে সবচেয়ে কম। বিপরীতভাবে ব্ল্যাকহোল হলো একটি বিন্দুমাত্র। এটি দখল করে শূন্য পরিমাণ জায়গা। নেই কোনো বহিঃস্থ প্রান্ত। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে বক্রতা আবার কমতে থাকবে। ব্ল্যাকহোলের কাছে যেতে থাকলে স্থানের বক্রতা কেবলই বাড়তে থাকে। কখনোই কমে না। ব্ল্যাকহোলের কোনো জায়গা নেই বলে বক্রতা হয় অসীম। স্থান-কালের মধ্যে নক্ষত্রটি একটি ছিদ্র তৈরি করে (চিত্র ৫২)। ব্ল্যাকহোলের শূন্য একটি সিংগুলারিটি। মহাবিশ্বের কাঠামোয় এক উন্মুক্ত ক্ষত।

ধারণাটা খুব অসুবিধাজনক। স্থান-কালের মসৃণ ও অবিচ্ছিন্ন কাঠামোয় আছে ক্ষত। আর কেউ জানে না এসব ক্ষতের অঞ্চলে ঠিক কী ঘটে। আইনস্টাইন নিজেও সিংগুলারিটির ধারণার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। অস্বীকার করেছিলেন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বই। কিন্তু তিনি ছিলেন ভুল। ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আছে। তবে ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটি খুব বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি একে আলাদা করে রাখে। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের শূন্যটিকে সে কাউকে দেখতে দেয় না। ওখানে একবার কেউ গেলে তাকে ফিরে আসতেও দেয় না। প্রকৃতির আছে নিজস্ব এক মহাজাগতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

চিত্র ৫২: ব্ল্যাকহোল অন্য নক্ষত্র থেকে আলাদা। স্থান-কালের মধ্যে তৈরি করে ছিদ্র।

এ প্রতিরক্ষা প্রদান করে মহাকর্ষ নিজেই। উপরের দিকে একটি পাথর ছুঁড়লে পৃথিবীর অভিকর্ষ একে আবার টেনে মাটিতে নিয়ে আসবে। তবে যথেষ্ট জোরে ছুঁড়লে এটি আর ফেরত আসবে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে এটি মুক্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে। মঙ্গলে যান পাঠানোর সময় নাসা মোটামুটি এ কাজটাই করে। ন্যূনতম যে বেগে ছুঁড়লে কোনো বস্তু দূরে চলে যায় তার নাম মুক্তিবৈগ (escape velocity)। ব্ল্যাকহোল এত ঘন যে এর কাছাকাছি গেলে মুক্তিবৈগ হবে আলোর গতির চেয়ে বেশি। এ বিশেষ সীমানার নাম ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। ঘটনা দিগন্তের ওপারে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী, স্থান এত বক্র যে আলোসহ কোনো কিছুই এর ভেতর থেকে বের হতে পারে না।

হ্যাঁ, ব্ল্যাকহোলও একটা নক্ষত্র। তবে এর কোনো আলোই ঘটনার দিগন্তের এপারে আসতে পারে না। এজন্যই এটা ব্ল্যাক বা কালো। ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটি দেখার একমাত্র উপায় হলো ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা। সেটা করতে গেলেও অসুবিধা আছে। তীব্র মহাকর্ষ মহাকাশচারী টেনে লম্বা করে বিশাল আকারের সেমাইয়ের মতো বানিয়ে ফেলবে। তাও ধরা যাক, এমন একটা স্পেসসুইট বানানো হলো যা দিয়ে লম্বা হওয়া ঠেকানো সম্ভব হলো। তবুও আপনার দেখা দৃশ্য কাউকে এসে বলার সুযোগ পাবেন না। ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে ওপাশে যাওয়ার পর আপনার পাঠানো কোনো সংকেত এপাশে পৌঁছবে না কোনোদিন। পার হয়ে আসতে পারবেন না আপনি নিজেও। ঘটনা দিগন্ত পার হওয়া যেন মহাবিশ্বের সীমানা পার হয়ে চলে যাওয়া। ফেরত আসার আর কোনো সুযোগ নেই। মহাজাগতিক এ প্রতিরক্ষা এতটাই শক্তিশালী।

প্রকৃতি ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটিকে গোপন রাখার চেষ্টা করলেও বিজ্ঞানীরা জানেন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব বাস্তবে আছে। স্যাজিটেরিয়াস তারামণ্ডলের দিকে আছে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র। আর ছায়াপথের ঠিক কেন্দ্রে আছে একটি অতিভারী (supermassive) ব্ল্যাকহোল। এর ভর ২০ থেকে ২৫ লক্ষ সূর্যের সমান। জ্যোতির্বিদরা কিছু কিছু নক্ষত্রকে অদৃশ্য এক সঙ্গীর সাথে নাচতে দেখেছেন। সঙ্গী তারার গতি দেখে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি বোঝা যায়। যদিও ব্ল্যাকহোল নিজে অদৃশ্য। তবে বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোল দেখলেও এখন পর্যন্ত দেখেননি কেন্দ্রের শূন্য। কারণ বিশ্রী এ সিংগুলারিটিকে গোপন করে রেখেছে ঘটনা দিগন্ত।

এটা একটা ভাল দিক। ঘটনা দিগন্ত না থাকলে সিংগুলারিটি থাকত মহাবিশ্বের দিকে উন্মুক্ত। এতে করে ঘটত অদ্ভুত সব ঘটনা। তাত্ত্বিকভাবে ঘটনা দিগন্তবিহীন একটি উন্মুক্ত সিংগুলারিটি আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করবে। চলতে দেবে অতীতের দিকে। এটা করা যাবে ওয়ার্মহোল নামে একটি জিনিসের মাধ্যমে।

রাবারের চাদরের উপমায় ফিরে আসি। সিংগুলারিটি হলও অসীম বক্রতার বিন্দু। স্থান-কালের কাঠামোয় একটি গর্ত অবস্থিত। কিছু কিছু নির্দিষ্ট অবস্থায় একে টেনে বিস্তৃত করা যাবে। গাণিতিকভাবে দেখা গেছে, ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন বা বৈদ্যুতিক চার্জ থাকলে সিংগুলারিটি কোনো বিন্দু হবে না। হবে স্থান-কালের মধ্যে একটি বলয় (ring)। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এমন দুটি প্রলম্বিত সিংগুলারিটিকে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে যুক্ত করা যেতে পারে। এ সুড়ঙ্গের নাম ওয়ার্মহোল (চিত্র ৫৩)। ওয়ার্মহোলের অভিযাত্রী স্থান ও সম্ভবত কালের অন্য বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবেন। তাত্ত্বিকভাবে ওয়ার্মহোল আপনাকে চোখের পলকে মহাবিশ্বের অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। পারে পেছন বা সামনের কোনো সময়েও পৌঁছে দিতে (দেখুন পরিশিষ্ট ৬)। আপনি আপনার দাদীকে তরুণী অবস্থায়ও দেখে ফেলতে পারেন। দাদার সাথে তার বিয়ের আগে তাকে মেরে ফেলতে পারেন। তাদের বিয়ে হলো না। আপনার বাবা বা আপনারও আর জন্মই হলো না। জন্ম হলো বরং ভয়ানক এক প্যারাডক্সের।

হ্যাঁ, একটি প্যারাডক্সই। যার জন্ম দেয় সার্বিক আপেক্ষিকতার (general relativity) সমীকরণের শূন্য। ওয়ার্মহোল বাস্তবে আছে কিনা তা সত্যি করে কেউ জানে না। তবে নাসা আশা করছে ওয়ার্মহোল যেন থাকে।

চিত্র ৫৩: একটি ওয়ার্মহোল

## বিনা পুঁজিতে লাভ?

ফ্রি ল্যান্ড বলতে কিছু নেই।

—তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র

নাসা আশা করছে, দূরের নক্ষত্র ভ্রমণের চাবিকাঠি হয়তো শূন্যের হাতেই আছে। ১৯৯৮ সালে নাসা একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। বিষয় ছিল *ফিজিক্স ফর দ্য থার্ড মিলেনিয়াম*। এখানে বিজ্ঞানীরা ওয়ার্মহোলের গুনাগুণ, বক্র পথে ভ্রমণ, ভ্যাকুয়াম এনার্জি দিয়ে তৈরি যন্ত্র ও অপ্রথাগত ধারণা নিয়ে বিতর্ক করেন।

মহাশূন্য ভ্রমণের অসুবিধা হলো ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই। পূলে সাঁতার কাটার সময় আমরা পানিতে ধাক্কা দেই। পানি চলে যায় পেছনে, আর আমরা সামনে। মাটিতে হাঁটার সময় পা দিয়ে ধাক্কা দেই। সে ধাক্কা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাই সামনে। মহাশূন্যে পেছন দিকে ধাক্কা দেওয়ার মতো কিছু নেই। চাইলে বৈঠা চালানো যাবে। তবে তাতে কোনো গতি আসবে না।

রকেট তাই পেছনে ধাক্কা তৈরির জন্য নিজেই সাথে রাখে জিনিস। রকেটের জ্বালানি ইঞ্জিনের মধ্যে জ্বলে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। যানকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয় সামনে। ঠিক যেভাবে বেলুন থেকে নির্গত বাতাস একে কক্ষের এদিক-সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে ভ্রমণের জন্য জ্বালানি বের করে ধাক্কা দিয়ে এগোনো খুব ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য কাজ। কাক্সিত সময়ের মধ্যে দূরের নক্ষত্রে অভিযান পাঠানো এভাবে অসম্ভব। আধুনিককালে রাসায়নিক ইঞ্জিনের উন্নতি হয়েছে। আধুনিক ইঞ্জিন বিদ্যুতের মাধ্যমে রকেট থেকে পেছন দিকে গ্যাস বের করে দেয়। তবুও এগুলো যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয়। সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে পৌঁছতেও রকেটের জন্য সুবিশাল পরিমাণ জ্বালানি লাগবে। জ্বালানির এর চেয়ে বড় অপচয় আর হতে পারে না।

এ বই লেখার সময় মার্ক মাইলিস নাসার ব্রেকথ্রু প্রোপালসন প্রোজেক্টের প্রধান ছিলেন। তাঁর আশা ছিল, শূন্যের ভেত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যাবে। তবে দূর্ভাগ্যজনক কথা হলো, নিকট ভবিষ্যতে ব্ল্যাকহোলের শূন্য ও সিঙ্গুলারিটি নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। প্রথম কথা হলো, ওয়ার্মহোলের জন্য প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত সিংগুলারিটি তৈরি করাই সীমাহীন কঠিন কাজ। তার ওপর, এমন সিংগুলারিটি অভিযাত্রীকে শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। ১৯৯৮ সালে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিদ এ বিষয়ে একটি কাজ করেন। তাঁরা দেখান, ভর স্ফীতির কারণে সুন্দর বলয় আকৃতির সিংগুলারিটির একটি ঘূর্ণয়মান বা চার্জধারী ব্ল্যাকহোলও মহাকাশচারীকে হত্যা করবে। সিংগুলারিটির দিকে যেতে থাকলে ব্ল্যাকহোলের ভর বেড়ে অসীমের কাছাকাছি হবে বলে মনে হবে। মহাকর্ষীয় টান হবে ভয়ানক শক্তিশালী। এক সেকেন্ডের ভগাংশ সময়েই মহাকাশচারী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ওয়ার্মহোল স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস।

মহাকাশ ভ্রমণের জন্য ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের শূন্য সহজ কোনো পথ তৈরি করে না। তবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শূন্য বিকল্প একটি দরজা খুলে দিয়েছে। শূন্য-বিন্দুর শক্তিই হয়তোবা পরম জ্বালানি। এখানে এসে পদার্থবিদ্যার মূল ধারা ছেড়ে আমরা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করছি।

মাইলিসের মতে মহাকাশচারীরা যানকে ঠেলে নেওয়ার জন্য ভ্যাকুয়ামের শক্তি কাজে লাগাতে পারেন। নাবিক যেভাবে বাতাস কাজে লাগিয়ে জাহাজ চালান। তিনি বলেন, "আমি কাজিমির প্রভাবের সাথে একটু তুলনা দিচ্ছি। প্লেটকে পাশাপাশি রেখে আমরা ভ্যাকুয়াম থেকে দৃশ্যমান বিকিরণ চাপ পাচ্ছি। এখান থেকে কোনোভাবে অপ্রতিসম (দ্বিমুখী বদলে একমুখী) বল পাওয়া গেলে অগ্রসরমান বল পাওয়া যাবে।" দুঃখজনকভাবে, এখন পর্যন্ত কাজিমির প্রভাবকে প্রতিসমই মনে হচ্ছে। দুই প্লেট কাছে আসে ও একে অপরকে আকর্ষণ করে। একের ক্রিয়া অপরের প্রতি সমান ও বিপরীতমুখী। কোনো ধরনের কোয়ান্টাম পাল থাকলে কাজটা সহজ হত। যেটা হত একমুখী দর্পণের মতো। একপাশের ভার্চুয়াল কণাকে যা প্রতিফলিত করত। কিন্তু অপর পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে বিনা বাধায়। ভ্যাকুয়াম শক্তি তখন পুরো বস্তুটাকে অপ্রতিফলিত পালের দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। মাইলিস স্বীকার করছেন, এটা করার কোনো উপায় কারও মাথায় আসছে না। এমন একটি যন্ত্র তৈরি করার মতো কোনো তত্ত্ব নেই।

আসল সমস্যা হলো পদার্থবিদ্যার সূত্র আপনাকে বিনামূল্যে কিছু পেতে দেবে না। জাহাজ যেভাবে বাতাসের গতি কমিয়ে দেয়, তেমনি কোয়ান্টাম পালকেও ভ্যাকুয়ামের শক্তি কমাতে হবে। কিন্তু শূন্যতাকে কীভাবে আপনি বদলাবেন?

হারল্ড পুটহফ অবশ্য আশা ছাড়তে নারাজ। ভদ্রলোক টেক্সাসের অস্টিনে অবস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। কোয়ান্টাম পাল ভ্যাকুয়ামের বৈশিষ্ট্যকে বদলে দেবে। (১৯৭৪ সালে নেচার জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে পুটহফ বিখ্যাত হন। তাঁর গবেষণা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, যাদুকর উরি গেলার ও অন্য পদার্থবিজ্ঞান চোখের সাহায্য ছাড়াই দূর থেকে বস্তুকে দেখতে পারে। এ সিদ্ধান্ত মূল ধারার বিজ্ঞান গ্রহণ করেনি।) তিনি

বলেন, "ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে একটু নিম্ন অবস্থায় নেমে আসে।" যদি তাই হয়, তাহলে কোয়ান্টাম পাল সূচনা মাত্র। এমন ইঞ্জিনও বানানো যাবে, যা চলবে শুধু শূন্য-বিন্দুর শক্তি দিয়েই। এদের একমাত্র অসুবিধা হলো মহাবিশ্বের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। যদিও কাজটা হবে ধীরে। কাঠামোর মধ্যে কখনও গর্ত তৈরি হবে না। পুটহফের মতে, "এটা মহাসমুদ্র থেকে এক কাপ পানি নেওয়ার মতো ঘটনা।"

এটা মহাবিশ্বকে ধ্বংসও করে দিতে পারে। ভ্যাকুয়ামের শক্তি আছে—এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাজিমির বলই তার স্বাক্ষরী। কিন্তু ভ্যাকুয়ামের শক্তিই কি সত্যিকার অর্থে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য শক্তি। তা নাহলে কিন্তু ভ্যাকুয়ামের মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। ১৯৮৩ সালে দুজন বিজ্ঞানী নেচার সাময়িকীতে বলেন, ভ্যাকুয়াম নিয়ে কারসাজি করতে গেলে মহাবিশ্ব আত্মহনন করতে পারে। সে গবেষণায় বলা হয়, আমাদের ভ্যাকুয়াম হয়তোবা নকল ভ্যাকুয়াম। হয়তোবা এটা আছে অস্বাভাবিক তেজস্বী অবস্থায়। পাহাড়ের পাশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে একটি বল রেখে দেওয়ার মতো অবস্থা। ভ্যাকুয়ামকে যথেষ্ট দুলুনি দিলে হয়ত পাহাড় বেয়ে সেটা নামতে শুরু করবে। ঠাঁই নেবে আরও নিম্নশক্তির কোনো অবস্থায়। আমরা সেটা থামাতে পারব না। এতে করে অবমুক্ত হবে শক্তির এক বিশাল বুদ্ধদ। যা প্রসারিত হবে আলোর গতিতে। পেছনে রেখে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। এটা এতটাও খারাপ হতে পারে যে এমনকি আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বিপর্যয়ের সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তবে এটা ঘটনা সম্ভাবনা অনেক অনেক কম। আমাদের মহাবিশ্ব টিকে আছে বহু বিলিয়ন বছর যাবত। আমরা এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকব তার সম্ভাবনা খুব কমই। এমন একটি বিপর্যয় সম্ভব হয়ে থাকলে তা ঘটানোর জন্য মহাজাগতিক রশ্মির সাথে সঙ্ঘর্ষই যথেষ্ট ছিল। তবে এ যুক্তি বিশ্বাসীদের দমাতে পারেনি। তাদের মধ্যে আছেন পদার্থবিদও। ফার্মিল্যাবের মতো উচ্চশক্তির পরীক্ষাগারের গবেষণা প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, উচ্চশক্তির সংঘর্ষে ভ্যাকুয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন শুরু হবে। এসব ভাবনাগুলো সঠিক হলেও শূন্য-বিন্দুর শক্তি দিয়ে মহাকাশযানকে ঠেলে নিতে পারার সম্ভাবনা সামান্য। তবে পুটহফের বিশ্বাস, তাঁর কাছে শূন্যতার শক্তি সংগ্রহের উপায় আছে।

তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা কাজিমির প্রভাব থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন। এমনকি ভ্যাকুয়ামের সবচেয়ে নিম্নতম বিন্দু পরম শূন্য থেকেও। দুই প্লেটের সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। সে তাপকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা যায়। তবে দুই প্লেটকে আলাদা করতে গেলে আগের উৎপাদিত শক্তির চেয়ে বেশি শক্তি খরচ হয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, এ ঘটনাই শূন্যস্থানের শক্তি দিয়ে বানানো অবিরাম গতি যন্ত্রের ধারণাকে বাতিল করে দেয়। তবে পুটহফ মনে করেন, এ সমস্যার বেশ কিছু সমাধান আছে তাঁর কাছে। একটি উপায় হলো প্লেটের বদলে প্লাজমার ব্যবহার।

প্লাজমা হলো চার্জিত কণা দিয়ে তৈরি গ্যাস। কাজিমির প্রভাবের ক্ষেত্রে এটা আচরণ করবে ধাতব প্লেটের মতোই। সিলিন্ডার আকৃতির একটি পরিবাহী গ্যাসকে শূন্য-বিন্দুর ফ্লাকচুয়েশন বা ওঠানামা দিয়ে সঙ্কুচিত করা হবে। ঠিক যেভাবে প্লেটকে বলপ্রয়োগে একত্র করা হয়। এ সঙ্কোচন প্লাজমাকে উত্তপ্ত করবে। নির্গত হবে শক্তি। পুটহফের মতে, ধাতব প্লেটের চেয়ে প্লাজমা বানানো সহজ কাজ। বিদ্যুতের একটি বল্টু দিয়েই তা করা যায়। প্লেটকে তো পরে আলাদা করতে হয়। সেখানে প্লাজমার "ছাই"কে উপেক্ষা করলেই হলো। পুটহফ উৎসাহের সাথে দাবি করেছেন, এ প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত শক্তির ৩০ গুন ফেরত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "এটা প্রমাণিত। এটা নিয়ে আমাদের একটা প্যাটেন্টও আছে।" তবে পুটহফের যন্ত্রও বিনামূল্যে শক্তি সরবরাহ করার বহু যন্ত্রগুলোরই একটি। অতীতে এগুলোর কোনোটাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। পুটহফের শূন্য শক্তির যন্ত্র আলাদা হবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতা বলে, শূন্যের ক্ষমতা অসীম। ফলে মানুষ এর সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেই। তাতে অবাধ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, শূন্যতা থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না।

## তথ্যনির্দেশ

### ৭ম অধ্যায়

১। বাস্তবে আসলে দুই ধরনের ঘটনাই আছে। বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন দুই ধরনের চলক আছে। যে চলক নির্দিষ্ট মানের বাইরের কোনো মান গ্রহণ করতে পারে না সেটি বিচ্ছিন্ন। যেমন একটি ক্রিকেট ম্যাচে কয়টি ছক্কা হবে? ০, ১ বা ২ বা তার বেশি। ১ ও ২-এর মাঝে কিছু নেই। দৈনিক দূর্যটনা বা কল সেন্টারে আসা কলের সংখ্যাও এমন বিচ্ছিন্ন (discrete) চলক। মানুষের ওজন, উচ্চতা আবার অবিচ্ছিন্ন (continuous)। কারও ওজন ৬৫.৩ কেজি যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে ৬৫. ৩১-ও। এ দুই সংখ্যা বা যেকোনো দুই সংখ্যার মাঝের যেকোনো সংখ্যাই হতে পারে। — অনুবাদক

২। তরঙ্গ ফাংশন বুঝতে মাঝেমধ্যে একটি জিনিস কাজে আসে। (পারিভাষিক অর্থে আসলে সেটা তরঙ্গ ফাংশনের বর্গ।) এ ফাংশন হলো কণার অবস্থানের সম্ভাবনার পরিমাপ। যেমন একটি ইলেকট্রন স্থানের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত থাকে। কিন্তু অবস্থান পরিমাপ করতে গেলে তরঙ্গ ফাংশন একে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বলে দেয়। প্রকৃতির এ অনিশ্চয়তারই বিরোধিতা করেছিলেন আইনস্টাইন। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর মহাবিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন না।" এ কথার মাধ্যমে তিনি কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সম্ভাবনাভিত্তিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছিলেন। আইনস্টাইনের দুর্ভাগ্য! কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সূত্র অবিশ্বাস্যরকম ভালভাবে কাজ করে। প্রচলিত চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে কোয়ান্টাম প্রভাব সফলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৩। সঠিক করে বললে আসলে অনিশ্চয়তা নীতি বেগের বদলে কাজ করে ভরবেগ (momentum) নিয়ে। যা বস্তুর ভর ও বেগের গুণফল। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় গতির বদলে বেগ বললে চলাচলের দিকও বোঝায়। যেমন কোনো কিছু কি উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে চলছে। অথবা কাছে আসছে নাকি দূরে যাচ্ছে। ফলে ভরবেগের মধ্যে বস্তুর ভর, গতি ও পথের দিকের তথ্য থাকে। তবে এক্ষেত্রে ভরবেগ, গতি ও এমনকি শক্তিকেও একের বদলে অন্যকে ব্যবহার করা যায়।

৪। মৌলিকভাবে অনিশ্চয়তা নীতি বেশ কিছু জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্যই খাটে। এর মধ্যে একটি হলো অবস্থান ও ভরবেগ। আরেকটি জোড়া হলো বস্তুর শক্তি ও সময়কালের (স্থায়িত্ব) অনিশ্চয়তা। নীতিটি বলছে, 'শূন্য' স্থানেও প্রচুর পরিমাণ ভার্চুয়াল কণা ও প্রতিকণার জোড়া রয়েছে। যদি তা না হত, মানে 'শূন্য' স্থান যদি আসলেই সম্পূর্ণ খালি হত, তাহলে তার অর্থ হত মহাকর্ষীয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রসহ সবগুলো ক্ষেত্রের মান একেবারে শূন্য হত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের মান ও সময়ের সাথে তার পরিবর্তনের হার একটি কণার অবস্থান ও বেগের (অবস্থানের পরিবর্তন) সাথে তুলনীয়। অনিশ্চয়তা নীতি বলছে, আপনি এই দুটি রাশির একটিকে যত বেশি সঠিকভাবে পরিমাপ করতে চাইবেন, আরেকটিতে ভুলের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। অতএব, শূন্যস্থানের কোনো ক্ষেত্রের মান যদি পুরোপুরি শূন্য হয়, তার মানে একই সাথে এর মান (অর্থ্যাৎ শূন্য) এবং পরিবর্তনের হার (এটাও শূন্য) দুটোরই একটি সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যাবে। এটি অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অতএব, ক্ষেত্রের মানের মধ্যে কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকতেই হবে। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান। — অনুবাদক

\* আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, 'প্রকৃতির বলসমূহ এবং পদার্থবিদ্যার একীভবন', অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম, ঢাকা: অস্বেষা, ২০১৭, পৃ. ১।

৫. ওজন এক প্রকার বল। মহাকর্ষ কানো বস্তুকে যে বলে টানে তাই ওজন। আমরা প্রচলিত অর্থে যাকে ওজন বলি সেটা আসলে বস্তুর ভর, যার মানে হলো বস্তুতে উপস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণ। পৃথিবীতে কোনো বস্তুর ওজন বের করতে ভরকে ৯.৮১ (প্রায়) দিয়ে গুণ করতে হয়। মানটা হলো পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ। কোনো বস্তুকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে প্রতি সেকেন্ড এ পরিমাণ হারে (বাতাসের বাধা না থাকলে) বেগ বাড়তে থাকবে। — অনুবাদক

৬। ব্যাপারটা আসলে ঘড়ির যান্ত্রিক কোনো বিষয় নয়। সময় ধীরে চলার প্রভাবটাই ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে।—অনুবাদক

৭। বিশেষ আপেক্ষিকতা শুধু প্রব বা নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে কাজ করে। ত্বরণ ও মহাকর্ষ নিয়ে কাজ করে সার্বিক আপেক্ষিকতা।—অনুবাদক

৮। ব্ল্যাকহোলদের মধ্যে এখানে নাস্কট্রিক ব্ল্যাকহোলের কথা বলা হচ্ছে। যে ব্ল্যাকহোল তৈরি হয় ভারী নক্ষত্রের জীবনের শেষে। তবে সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাকহোল এভাবে তৈরি হয় না। এরা থাকে ছায়াপথের কেন্দ্রে। এছাড়াও কয়েক রকম ব্ল্যাকহোল আছে। তবে নাস্কট্রিক ব্ল্যাকহোলরাই বেশি আলোচিত।

## অষ্টম অধ্যায় গ্রাউন্ড জিরোর শূন্যতম ঘণ্টা [স্থান-কালের সীমানায় শূন্য]

দেখে মনে হয়েছিল ভিনগ্রহবাসী  
দেখতে পারবে না কোনো মর্তবাসী  
তাদের শেষের ইতিহাসের নিবিড় বিনির্মাণ

—থমাস হার্ডি, দ্য কনভারজেন্স অব দ্য টোয়েন

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেন দুই দানবের লড়াই। বিশাল বড় বড় বস্তুর জগতে আধিপত্য সার্বিক আপেক্ষিকতার। এটা কাজ করে মহাবিশ্বের সবচেয়ে ভারী বস্তুগুলো নিয়ে। এই যেমন নক্ষত্র, সৌরজগৎ ও ছায়াপথ। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার শাসন অতিশয় ক্ষুদ্র জগতে। পরমাণু, ইলেকট্রন ও অতিপারমাণবিক কণারা মেনে চলে এর নিয়ম। দেখে মনে হতে পারে, দুই তত্ত্ব মিলেমিশে কাজ করতে পারে। মহাবিশ্বের আলাদা আলাদা দিক পরিচালনার জন্য পদার্থবিদ্যার নিয়ম বেঁধে দিতে পারে।

কিন্তু এমন বস্তুও আছে যার অস্তিত্ব দুই জগতে জুড়েই আছে। ব্ল্যাকহোলের ভর সুবিশাল। অতএব, আপেক্ষিকতার আলোচ্যবস্তু এটা। একইসাথে আবার ব্ল্যাকহোল অতিশয় ক্ষুদ্র আকারের জিনিস। ফলে তা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আলোচ্যবিষয়। মিল তো দূরের কথা, দুই সূত্র ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতার মিলনবিন্দুতে শূন্যের বাস। আর শূন্যই দুই তত্ত্বকে দ্বন্দ্ব জড়ায়। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে ব্ল্যাকহোল একটি শূন্য। কোয়ান্টাম তত্ত্বের গণিতে ভ্যাকুয়ামের শক্তি শূন্য। মহাবিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনা বিগ ব্যাং (big bang)। দুই তত্ত্বেই বিগ ব্যাং শূন্য। মহাবিশ্বের জন্ম শূন্য থেকে। মহাবিশ্বের সূচনা ব্যাখ্যা করতে গেলে দুই তত্ত্বই অকার্যকর হয়ে যায়।

বিগ ব্যাংকে বুঝতে হলে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আপেক্ষিকতার সাথে জোড়া দিতে হবে। গত কয়েক বছরে সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে। তৈরি হয়েছে এক দানবীয় তত্ত্ব। যা মহাকর্ষের ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারে। ফলে পদার্থবিদরা মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তে দৃষ্টি দিতে পারছেন। এজন্য একটাই কাজ করতে হয়েছে। শূন্যের নির্বাসন। একীভূত এ তত্ত্বের নাম থিওরি অব এভরিথিং বা সার্বিক তত্ত্ব।

সত্যি বলতে, সার্বিক তত্ত্ব আসলে শূন্যের তত্ত্ব।

### শূন্যের নির্বাসন: স্ট্রিং তত্ত্ব

সমস্যা হলো আমরা হিসাব করতে করতে শূন্য দূরত্বে পৌঁছে গেলে সমীকরণ বিস্ফোরিত হয়ে যায়। দেয় অর্থহীন সব উত্তর। অসীমের মতো জিনিস। কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যার জন্মের পর এটা নিয়ে ব্যাপক ঝামেলা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা যদিকেই হিসাব করছিলেন, পাচ্ছিলেন শুধু অসীম আর অসীম।

—রিচার্ড ফাইনম্যান



সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মধ্যে বিরোধ অনিবার্য। আপেক্ষিকতার মহাবিশ্ব হলো মসৃণ এক রাবারের চাদর। মহাবিশ্ব অবিচ্ছিন্ন ও প্রবাহমান। তীক্ষ্ণ বা বিন্দুসদৃশ নয়। অন্যদিকে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বলে এবড়োথেবড়ো ও বিচ্ছিন্ন খণ্ডে বিভক্ত মহাবিশ্বের কথা। শূন্য দুই তত্ত্বেই আছে। আর সেটাই তাদের দ্বন্দের কারণ।

ব্ল্যাকহোলে আছে এক অসীম শূন্য। শূন্য পরিমাণ স্থানে জমা হয়েছে সব ভর। স্থান বেকেছে অসীম পরিমাণ। মসৃণ রাবারের চাদরে তৈরি করেছে একটি গর্ত। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণ শূন্যের তীক্ষ্ণতাকে ভয় পায়। ব্ল্যাকহোলে স্থান ও কালের নেই কোনো অর্থ।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও একই সমস্যায় আক্রান্ত। সমস্যাটা শূন্য-বিন্দুর শক্তি নিয়ে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সূত্র ইলেকট্রনের মতো কণাদেরকে বিন্দু মনে করে। তার মানে, এরা কোনো স্থান দখল করে না। ইলেকট্রন একটি শূন্যমাত্রিক বস্তু। এর শূন্যসদৃশ বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিজ্ঞানীরা এর ভর ও চার্জ জানেন না।

কথাটাকে হাস্যকর মনে হবে। প্রায় এক শ বছর আগে ইলেকট্রনের চার্জ ও ভর পরিমাপ করা হয়েছে। পরিমাপের পরেও একটা জিনিস কীভাবে বিজ্ঞানীদের অজানা থাকে? উত্তর আছে শূন্যের কাছে।

যে ইলেকট্রন বিজ্ঞানীরা দেখেন পরীক্ষাগারে, যে ইলেকট্রনকে পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও প্রকৌশলীরা যুগের পর যুগ ভালবেসে এসেছেন, সেটি আসল ইলেকট্রন নয়। সেটি এক জাল বা নকল ইলেকট্রন। আসল ইলেকট্রন ঢাকা পড়ে আছে কণার আবরণ দিয়ে। যে কণাদের জন্ম শূন্য-বিন্দুর ওঠানামার মাধ্যমে। প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় এ কণারা। ভ্যাকুয়ামে অবস্থিত ইলেকট্রন মাঝেমাঝেই একটি কণা শোষণ বা নির্গত করে। এই যেমন ফোটন কণা। এই কণার ঝাঁক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ পরিমাপের পথে বাধা। কারণ এ কণারা হিসাবে হস্তক্ষেপ করে। ঢেকে দেয় ইলেকট্রনের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য। পদার্থবিদদের দেখা ইলেকট্রনের চেয়ে আসল ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ আরেকটু বেশি।

ইলেকট্রনকে আরেকটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা গেলে সঠিক ভর ও চার্জ আরও ভালোভাবে জানা যেত। কণার মেঘের মধ্যকার অতিশয় সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কার করা গেলে ইলেকট্রনকে আরও ভালোভাবে দেখা যেত। কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে, পরিমাপ যন্ত্র মেঘের প্রথম কয়েকটি ভার্চুয়াল কণা পার হলে ইলেকট্রনের ভর একটু বাড়তে দেখা যায়। যন্ত্র ইলেকট্রনের আরও কাছে গেলে পার হবে আরও ভার্চুয়াল কণা। ফলে ইলেকট্রনের পর্যবেক্ষণকৃত ভর ও চার্জ আরও বাড়বে। যন্ত্র ইলেকট্রন থেকে শূন্য একক দূরত্বে গেলে এটি পার হয় অসীমসংখ্যক কণা। ফলে যন্ত্রের পরিমাপকৃত ভর ও চার্জও হয় অসীম। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম বলছে, শূন্যমাত্রিক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম।

শূন্য-বিন্দুর শক্তির মতোই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের অসীম ভর ও আর্জ উপেক্ষা করতে শিখেছেন। তাঁরা পুরো পথ পাড়ি দিয়ে ইলেকট্রনের শূন্য দূরত্ব পর্যন্ত যান না। ঠিক তার আগের কোনো এক জায়গায় থেমে যান। কাছাকাছি একটি সুবিধাজনক দূরত্ব বেছে নিলে ইলেকট্রনের আসল ভর ও চার্জের সব হিসাব মিলে যায়। এ প্রক্রিয়ার নাম রিনর্মালাইজেশন বা পুনঃস্থানিকীকরণ। রিচার্ড ফাইনম্যান বলেন, "আমি বলব এটা এক খামখেয়ালী কাজ।" যদিও তিনি নিজে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রিনর্মালাইজেশন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটিয়ে।

সার্বিক আপেক্ষিকতার মসৃণ চাদরে শূন্য গর্ত তৈরি করে। আবার ইলেকট্রনকে কুয়াশায় ঢেকে দিয়ে ইলেকট্রনের তীক্ষ্ণ বিন্দু চার্জকে ছড়িয়ে মসৃণ করে দেয়। তবে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা তো কাজই করে ইলেকট্রনের মতো শূন্যমাত্রিক বিন্দুকণা নিয়ে। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কণায়-কণায় হওয়া সব মিথষ্ক্রিয়াতেই অসীম চলে আসে। এগুলোই সিংগুলারিটি। যেমন দুটি কণা মিলিত হয় একটি বিন্দুতে। যা একটি শূন্যমাত্রিক সিংগুলারিটি। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বা

সার্বিক আপেক্ষিকতায় এ শূন্যের কোনো অর্থ নেই। দুই মহান তত্ত্বকে নড়বড়ে করে দেয় শূন্য। ফলে পদার্থবিদরা একে বাদ দিয়েই কাজ করে গেলেন।

তবে শূন্যকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াটা ঠিক স্পষ্ট নয়। স্থান ও কালের পরতে পরতে দেখা মেলে শূন্যের। ব্ল্যাকহোল শূন্যমাত্রিক জিনিস। ইলেকট্রনের মতো কণারাও তাই। ইলেকট্রন ও ব্ল্যাকহোল বাস্তব জিনিস। চাইলেই এদেরকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে ব্ল্যাকহোল ও ইলেকট্রনকে বিজ্ঞানীরা একটি বাড়তি মাত্রা দিতে পারেন।

এ ধারণা থেকেই জন্ম স্ট্রিং তত্ত্বের (string theory)। ১৯৭০-এর দশকে তত্ত্বটার জন্ম। পদার্থবিদরা দেখলেন, কণাকে বিন্দুর বদলে কম্পনশীল স্ট্রিং বা সুতা ধরে নিলে সুবিধা হচ্ছে। এ তত্ত্বে ইলেকট্রন ও ব্ল্যাকহোলকে শূন্যমাত্রিক বিন্দুর বদলে স্ট্রিংয়ের লুপ বা চক্রের মতো একমাত্রিক জিনিস মনে করা হয়। আর এতে করে সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অসীম অলৌকিকভাবে উধাও হয়ে যায়। রিনর্মালাইজেশন (renormalization) করতে হয় না। ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম আসেই না। শূন্যমাত্রিক ইলেকট্রনের ভর ও চার্জ অসীম, কারণ এটি একটি সিংগুলারিটি। এর কাছে যেতে থাকলে পরিমাপ বড় হয়ে অসীমের দিকে চলে যায়। তবে ইলেকট্রনকে স্ট্রিংয়ের লুপ ধরে নিলে কণাটি আর সিংগুলারিটি থাকে না। ফলে ভর ও চার্জও অসীম হয় না। কারণ এখন আর ইলেকট্রনের কাছে যেতে অসীমসংখ্যক কণার মেঘ পাড়ি দিতে হয় না। তাছাড়া দুটি কণার মিলন এখন আর বিন্দুসদৃশ সিংগুলারিটিতে হয় না। স্থান-কালের মধ্যে তারা তৈরি করে সুন্দর, মসৃণ ও অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠ।

চিত্র ৫৪: বিন্দু কণা তৈরি করে সিংগুলারিটি।

চিত্র ৫৫: স্ট্রিং কণা সিংগুলারিটি তৈরি করে না।

স্ট্রিং তত্ত্বে কণারা আসলে একই ধরনের স্ট্রিং। শুধু কাঁপে ভিন্নভাবে। মহাবিশ্বের সবকিছু এ স্ট্রিং দিয়ে তৈরি।  $10^{-33}$  সেন্টিমিটার চওড়া এরা। স্ট্রিংয়ের আকারের নিউট্রন কণার সাথে তুলনা করা আর নিউট্রনকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করা একই কথা। এদের ক্ষুদ্র আকারের কারণে আমাদের মতো বড় প্রাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্রিংকে বিন্দুর মতো লাগে। লুপের আকারের চেয়ে ছোট দূরত্ব ও সময়ের কোনো গুরুত্ব নেই। তার নেই কোনো বাস্তব অর্থ। স্ট্রিং তত্ত্ব শূন্যকে মহাবিশ্ব থেকে অপসারণ করে। শূন্য দূরত্ব বা শূন্য সময় বলতে কিছু নেই। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সব অসীমের সমাধান হয়ে যায়।

শূন্যকে নির্বাসনে পাঠালে সার্বিক আপেক্ষিকতার অসীমেরও সমাধান হয়ে যায়। ব্ল্যাকহোলকে স্ট্রিং মনে করলে বস্তুরা আর স্থান-কালের কাঠামোর টোল বেয়ে পতিত হয় না। একটি কণার লুপ ব্ল্যাকহোলের লুপের দিকে যেতে যেতে প্রসারিত হয়। স্পর্শ করে ব্ল্যাকহোলকে। দুই লুপ কেঁপে ওঠে। ভেঙে গিয়ে তৈরি করে নতুন একটি লুপ। যা আসলে আরও ভারী একটি ব্ল্যাকহোল। (কোনো কোনো তাত্ত্বিকের বিশ্বাস, কণাকে ব্ল্যাকহোলের সাথে মিশালে ট্যাকিয়ন (tachyon) নামে এক ধরনের অদ্ভুত কণা তৈরি হয়। এদের ভর কাল্পনিক সংখ্যা (কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। ভ্রমণ করে অতীতের দিকে। আর গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি। স্ট্রিং তত্ত্বের কিছু কিছু সংস্করণে এমন কণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।)

মহাবিশ্ব থেকে শূন্যের অপসারণকে হঠকারী একটি কাজ মনে হতে পারে। তবে বিন্দুর চেয়ে স্ট্রিং সহজে কথা শোনে। শূন্যকে অপসারণের মাধ্যমে স্ট্রিং তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যার খণ্ড খণ্ড, কণাসদৃশ বৈশিষ্ট্যকে মসৃণ করে তোলে। সার্বিক আপেক্ষিকতায় ব্ল্যাকহোলের সৃষ্ট ক্ষত সারিয়ে তোলে। এ সমস্যাগুলো দূর হলে দুই তত্ত্বের বিরোধ আর থাকে না। পদার্থবিদরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, স্ট্রিং তত্ত্ব কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাকে আপেক্ষিকতার সাথে জোড়া দেবে। তাঁদের

বিশ্বাস ছিল, এটা থেকে পাওয়া যাবে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ (quantum gravity) তত্ত্ব। যে সার্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে পারবে মহাবিশ্বের সব ঘটনার। তবে স্ট্রিং তত্ত্বের ছিল বেশ কিছু অসুবিধা। একটি সমস্যা হলো, তত্ত্বটির প্রয়োজন ১০টি মাত্রা (dimension)।

বেশিরভাগ মানুষের কাছে চারটি মাত্রাই বাড়াবাড়ি। এদের মধ্যে তিনটি মাত্রা দেখা খুব সহজ। ডান-বাম, সামনে-পেছনে আর উপর-নিচ হলো আমাদের চলাচলের তিনটি দিক। চতুর্থ মাত্রার আগমন ঘটে আইনস্টাইনের হাত ধরে। তিনি দেখালেন, সময়ও এ তিন মাত্রার মতোই একটি মাত্রা। আমরা প্রতিনিয়ত সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। যেভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে এগিয়ে যাই সড়কপথে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, ঠিক যেভাবে আমরা মহাসড়ক ধরে চলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তেমনি পারি সময়গাড়ি দিয়ে চলার গতি পরিবর্তন করতে। স্থানের মধ্য দিয়ে যত দ্রুত চলব, সময়ের মধ্য দিয়েও চলব তত দ্রুত। আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব বুঝতে হলে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, সময় হলো চতুর্থ মাত্রা।

চার মাত্রা নাহয় মেনে নিলাম। তাই বলে ১০? চারটি মাত্রা আমরা পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু অন্য ছয় মাত্রা কোথায় আছে? স্ট্রিং তত্ত্ব বলে, সে মাত্রাগুলো ছোট্ট বলের মতো গুটিয়ে আছে। এগুলো এত ছোট্ট যে দেখা যায় না। এক পৃষ্ঠা কাগজকে দ্বিমাত্রিক মনে হয়। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখা যায়। তবে উচ্চতা বোঝা যায় না। তবে কাগজের প্রান্তকে আতশ কাচের নিচে নিয়ে দেখলে এর উচ্চতা চোখে ধরা দেয়। এটা দেখতে যন্ত্র দরকার হয়েছে। কিন্তু এই তৃতীয় মাত্রার অস্তিত্ব আছে। যদিও দেখা যায় না সাধারণ অবস্থায়। ঐ ছয়টি মাত্রার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এদের আকার ক্ষুদ্র বলে দৈনন্দিন জীবনে আমরা এদের দেখি না। এরা এতই ছোট্ট যে নিকট ভবিষ্যতের তৈরি সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র দিয়েও এদের দেখা যাবে না।

এ ছয়টি বাড়তি মাত্রার কী অর্থ? আসলে কোনো অর্থই নেই। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা সময়ের মতো আমাদের চেনাজানা কোনোকিছুর পরিমাপ নয় এগুলো। এগুলো নিছক গাণিতিক কাঠামো। যার মাধ্যমে স্ট্রিং তত্ত্বের গণিত যেভাবে কাজ করা দরকার তা করে দেয়। কাল্পনিক সংখ্যার মতোই আমরা এদেরকে দেখতে পাই না। অনুভব করি না বা গন্ধও পাই না। যদিও হিসাব করার জন্য এগুলো প্রয়োজন। ধারণাটা বাস্তবে অদ্ভুত। তবুও বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন। কারণ সমীকরণগুলো বোধগম্য না হলেও তত্ত্বটি অনুমান বা পূর্বাভাস দিতে পারদর্শী। আর বাড়তি ছয়টি মাত্রা তো আর গাণিতিকভাবে কারও পাকা ধানে মই দেয় না। সমস্যা হবে হয়তোবা এদেরকে দেখা গেলে। (আজকাল তো দশও কম মনে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে পদার্থবিদরা বুঝতে পারেন, স্ট্রিং তত্ত্বের বিভিন্ন রকম সংস্করণ আসলে এক অর্থে একই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন, এ তত্ত্বগুলো একে অপরের দ্বৈত রূপ। যেভাবে পঁসলে বুঝেছিলেন, রেখা ও বিন্দু একে অপরের দ্বৈত রূপ। বিজ্ঞানীদের এখন বিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বী সব তত্ত্বের পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে দানবীয় এক তত্ত্ব। এর নাম তথাকথিত এম-তত্ত্ব (M-theory)। যা আবার বাস করে দশের বদলে এগারো মাত্রায়।

স্ট্রিংকে আরও সাধারণ অর্থে বলা হয় ব্রেইন (brane)। বহুমাত্রিক মেমব্রেইন থেকে নামটা আসা। এরা এত ক্ষুদ্র যে কোনো যন্ত্র দিয়েই এদেরকে দেখার কোন আশা নেই। অন্তত আমাদের সভ্যতা আরও অনেক অনেক বেশি উন্নত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেই। কণাপদার্থবিদরা অতিপারমাণবিক জগত দেখেন কণাত্বরকের (যে যন্ত্র কণাকে বিশাল বেগে চালিত করে) সাহায্যে। চুম্বকক্ষেত্র বা অন্য কোনো ক্ষেত্র কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে অনেক বেশি বেগে ধাবিত করা হয়। এ কণারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়ে যায়। কণাত্বরক (Particle accelerator) হলো অতিপারমাণবিক জগতের মাইক্রোস্কোপ। এসব কণায় যত বেশি শক্তি দেওয়া হবে, মাইক্রোস্কোপ তত শক্তিশালী হবে। আর ততই ক্ষুদ্র বস্তু দেখা যাবে।

এমন এক কণাত্বরকের নাম সুপারকন্ডাক্টিং সুপার কোলাইডার। ১৯৯০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত বহু বিলিয়ন ডলারের এ যন্ত্র বানানোর পরিকল্পনা ছিল। নির্মিত হলে এটি হত সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী কণাত্বরক। ৫৪ মাইল লম্বা লুপের

মধ্যে ১০,০০০ চুম্বক থাকার কথা ছিল এতে। এত শক্তিশালী যন্ত্রও গুটিয়ে থাকা মাত্রাগুলো বা স্ট্রিং দেখার জন্য যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ, কণাতুরক দিয়ে স্ট্রিং দেখার ব্যবস্থা করা যাবে। সেজন্য কণাতুরককে হতে হবে ৬০ কোটি-কোটি মাইলের একটি লুপ। একটি কণা আলোর বেগে চললেও এত বড় দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগবে ১,০০০ বছর।

বর্তমানে কল্পনাযোগ্য কোনো যন্ত্র দিয়েই বিজ্ঞানীরা সরাসরি স্ট্রিং দেখার আশা করতে পারেন না। এমন কোনো পরীক্ষার সন্ধান কেউ দিতে পারবে না, যার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা যাবে ব্ল্যাকহোল ও কণা আসলেই স্ট্রিং কিনা। স্ট্রিং তত্ত্বের বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বড় আপত্তি। বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নির্ভর। তাই কেউ কেউ বলেন, স্ট্রিং তত্ত্ব আসলে বিজ্ঞান নয়, বরং দর্শন। (সাম্প্রতিক এক গুচ্ছ তত্ত্ব বলছে, কিছু সংকীর্ণ মাত্রা লম্বায় ১০<sup>-১৬</sup> সেন্টিমিটার বা আরও বড় হতে পারে। সেক্ষেত্রে এগুলো পরীক্ষাযোগ্য হবে। তবে এখন পর্যন্ত এ তত্ত্বগুলোকে ভুলই মনে হচ্ছে। ভাবনাগুলো চমৎকার। কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য।

নিউটন মহাকর্ষ ও গতিসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে গ্রহ ও অন্যান্য বস্তুর চলাচলের ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন পদার্থবিদরা। নতুন ধূমকেতু আবিষ্কৃত হলেই নিউটনের হিসাবের পক্ষে সমর্থন জোরালো হত। তবে কিছু সমস্যা ছিল। একটি সমস্যা ছিল বুধ গ্রহের কক্ষপথ। গ্রহটির কক্ষপথ যেভাবে দুলে ওঠে তা মেলে না নিউটনের পূর্বাভাসের সাথে। তবে সার্বিকভাবে নিউটনের তত্ত্ব একের পর একে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছিল।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিউটনের ভুলগুলো সংশোধন করে। সমাধান হয় বুধ গ্রহের গতির। এ তত্ত্বগুলো মহাকর্ষ সম্পর্কে পরীক্ষাযোগ্য পূর্বানুমানও করে। সূর্যগ্রহণের সময় এডিংটন নক্ষত্রের আলোর বাঁক পর্যবেক্ষণ করেন। সত্য প্রমাণিত হয় একটি অনুমান।

অন্যদিকে স্ট্রিং তত্ত্ব অনেকগুলো প্রচলিত তত্ত্বকে সুন্দরভাবে জোড়া দেয়। ব্ল্যাকহোল ও কণার আচরণ সম্পর্কে বেশ কিছু পূর্বাভাসও দেয়। তবে এগুলোর কোনোটিই পরীক্ষাযোগ্য নয়। নয় পর্যবেক্ষণযোগ্য। গাণিতিকভাবে হয়ত তত্ত্বটা সুসঙ্গত। এমনকি সুন্দরও। তবে এটা এখনও বিজ্ঞানের অংশ নয়।

আগামীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতটা অনুমান করা যায়, তাতে মনে হচ্ছে স্ট্রিং তত্ত্ব একটি দার্শনিক ভাবনা হিসেবেই থাকবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে না। তত্ত্বটা সঠিকও হতে পারে। তবে সেটা যাচাই করার কোনো উপায় আমরা খুঁজে নাও পেতে পারি। শূন্য এখনও মহাবিশ্ব থেকে উধাও হয়নি। বরং মনে হচ্ছে শূন্যই মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য দায়ী।

### শূন্যতম ঘণ্টা: বিগ ব্যাং

হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা গেল, বিগ ব্যাং নামে একটি সময়ে মহাবিশ্ব সম্ভবত অতিশয় ক্ষুদ্র ও ঘন ছিল। এরকম অবস্থায় বিজ্ঞানের সব সূত্র অকেজো হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

—স্টিফেন হকিং, অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম

মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে শূন্য দিয়ে। জন্মের আগে ছিল না কোনো কিছুই। একদম শূন্যতা থেকে হলো আকস্মিক এক বিস্ফোরণ। আর তা থেকে সৃষ্টি হলো পুরো মহাবিশ্বের সব পদার্থ ও শক্তি। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিগ ব্যাংয়ের এ ধারণাকে উদ্ভট মনে করতেন। মহাবিশ্ব সসীম ও এর একটি সূচনা আছে—এ কথায় একমত হতে জ্যোতির্পদার্থবিদদের বহু সময় লেগে যায়।

সসীম মহাবিশ্বের প্রতি ঘৃণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। এরিস্টটল ভয়েড বা শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির ধারণা মেনে নেননি। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল শূন্যতার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। কিন্তু এতে একটি প্যারাডক্সের উদ্ভব হয়। মহাবিশ্বের জন্ম ভয়েড থেকে হয়ে না থাকলে, জন্মের আগে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল। মহাবিশ্বের আগে দরকার আরেকটি মহাবিশ্ব। এরিস্টটলের কাছে এ ধাঁধার একটাই সমাধান: মহাবিশ্ব চিরন্তন। অতীতে সবসময় এর অস্তিত্ব ছিল। ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে সে ধারা।

একটা সময় এসে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এরিস্টটল ও বাইবেলের মধ্যে একটি বেছে নিতে হলো। বাইবেল বলে, সসীম মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে শূন্যতা থেকে। একসময় মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেমেটিক বাইবেলের মহাবিশ্বের ধারণা এরিস্টটলের ধারণাকে বিদায় করে দিল। তবে চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের ধারণা পুরোপুরি বাতিল হয়নি। বিংশ শতকে এসেও টিকে ছিল ধারণাটি। এ ধারণাই আইনস্টাইনকে তাঁর নিজের ভাষ্যমতে নিজের জীবনের সেরা ভুল কাজটার দিকে ঠেলে দেয়।

আইনস্টাইনের মনে হত, তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতায় বড় এক ভুল আছে। তত্ত্বটা বলে, মহাবিশ্ব একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে মহাবিশ্ব অস্থিতিশীল। সম্ভাবনা আছে দুটি। এর কোনোটিই সুখকর নয়।

একটা সম্ভাবনা হলো, মহাবিশ্ব নিজস্ব মহাকর্ষের চাপে গুটিয়ে যাবে। সংকীর্ণ হতে হতে উদ্ভক্ত হতে থাকবে মহাবিশ্ব। জ্বলে জ্বলে উজ্জ্বল বিকিরণ তৈরি করবে। ধ্বংস হবে সব ধরনের প্রাণ ও বস্তুর সব উপাদান পরমাণু। মৃত্যু হবে আগুনের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্ব সংকীর্ণ হয়ে ব্ল্যাকহোলের মতো শূন্যমাত্রিক বিন্দুতে পরিণত হবে। উধাও হয়ে যাবে চিরতরে।

অন্য সম্ভাবনাটা আরও নির্মম। মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। ছায়াপথরা একে অপর থেকে দূরে সরতে থাকবে। মহাবিশ্বের সব তেজস্বী বিক্রিয়ার জন্য দায়ী নাক্ষত্রিক উপাদানগুলো হালকা হয়ে যাবে। জ্বলানি ফুরিয়ে নক্ষত্র নিভে যাবে। ছায়াপথ হবে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার। আর তারপর শীতল ও নীরব। নক্ষত্রের শীতল ও মৃত পদার্থ ক্ষয় হয়ে যাবে। পেছনে পড়ে থাকবে শুধু ঝাপসা বিকিরণ। যা ভরপুর থাকবে পুরো মহাবিশ্বে। মহাবিশ্ব হবে ক্ষীয়মান আলোর এক শীতল স্যুপ। এটা হবে এক শীতল মৃত্যু।

আইনস্টাইনের কাছে এ ভাবনাগুলোকে জঘন্য মনে হত। এরিস্টটলের মতোই তিনি ধরেই নিয়েছিলেন মহাবিশ্বটা স্থির, ধ্রুব ও চিরন্তন। তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণগুলোকে "ঠিক করার" একমাত্র উপায় হলো আসন্ন ধ্বংসকে প্রতিহত করা। কাজটা তিনি করলেন সমীকরণে একটি ধ্রুবক বসিয়ে দিয়ে। মহাজাগতিক ধ্রুবক (cosmological constant) নামের এ বল কাজ করে মহাকর্ষের বিপরীতে। এ ধ্রুবকের ধাক্কা মহাকর্ষের টানকে ঠেকিয়ে দেবে। গুটিয়ে না গিয়ে মহাবিশ্ব ভারসাম্যে থাকবে। সঙ্কোচন বা প্রসারণ কোনোটাই হবে না। এমন এক রহস্যজনক বলের প্রস্তাব করাটা এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। তিনি বলেন, “আমি মহাকর্ষ তত্ত্বে ... আবারও এমন একটি কাজ করে বসেছি, যার কারণে আমাকে পাগলাগারদে বন্দি হওয়া লাগতে পারে।” তবুও মহাবিশ্বের আসন্ন ধ্বংসের দৃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে এমন নাটকীয় পদক্ষেপ নেন তিনি।

আইনস্টাইনকে পাগলাগারদে যেতে হয়নি। এর আগে আরও অদ্ভুত জিনিস প্রকাশ করেও তিনি সঠিক প্রমাণিত হয়েছিলেন। তবে এবার আর তাঁর ভাগ্য তত ভাল ছিল না। নক্ষত্ররা নিজেরাই আইনস্টাইনের স্থির ও চিরন্তন জগতের ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেয়।

১৯০০ সালে আকাশগঙ্গাই (Milky way galaxy) ছিল মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচিত অঞ্চল। নক্ষত্রের এ ধূলিময় চাকতির বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে সে সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। হ্যাঁ, বহু দূরে জ্বলজ্বল করা কুক্ষিগত মেঘ তাঁরা দেখেছেন। তবে সেগুলোকে ছায়াপথের ভেতরের গ্যাস মনে না করার তেমন কোনো কারণ ছিল না। ১৯২০-এর দশকে সবকিছু বদলে গেল। আর এর পেছন অবদান অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবলের।

হাবল সিফিড বিষম তারা (Cepheid variable) নিয়ে কাজ করেন। এগুলোর মাধ্যমেই তিনি বহুদূরের বস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করেন। এ তারাগুলোর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এরা অনুমিত উপায়ে স্পন্দিত হয়। চলতে থাকে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল হওয়ার চক্র। এদের স্পন্দনের সাথে সম্পর্ক আছে নির্গত আলোর পরিমাণের। এদেরকে তাই বলে আদর্শ বাতি (standard candle)। যে বস্তুর উজ্জ্বলতা আমরা জানি। হাবলের কাজের মূল অংশ ছিল এগুলোই। এদের আচরণ ছিল ট্রেনের হেডলাইটের মতো।

এগিয়ে আসা ট্রেনের দিকে তাকালে দেখবেন, হেডলাইটের আলো ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। এখন ধরুন ট্রেনের আলোটা একটা আদর্শ বাতি। আমরা জানি, এটা থেকে কতটুকু আলো বের হচ্ছে। তাহলে কত দূরে থাকলে কত উজ্জ্বল হবে তাও আমরা বলতে পারব। যত কাছে আসবে, তত উজ্জ্বল হবে। একই যুক্তি উল্টোভাবেও কাজ করে। হেডলাইট কতটুকু আলো দিচ্ছে তা জানলে আমরা এর আপাত উজ্জ্বলতা পরিমাপ করে সেখান থেকে ট্রেনের দূরত্ব বের করতে পারব।

সিফিড তারা দিয়ে হাবল ঠিক এ কাজটাই করেন। তাঁর দেখা বেশিরভাগ নক্ষত্র ছিল দশ থেকে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ (light year) পর্যন্ত দূরের। তবে অ্যানড্রোমিডা নীহারিকা (তখন এ নামটাই প্রচলিত ছিল) দেখে তিনি চমকে গেলেন। কুক্ষিগত এ মেঘের ভেতর একটি সিফিড তারা মিটমিট করছিল। আলোর পরিমাপ থেকে হিসাব করে দেখলেন, নীহারিকাটির দূরত্ব ১০ লাখ আলোকবর্ষ। যা আমাদের ছায়াপথের শেষ সীমানা থেকেও দূরে। অ্যানড্রোমিডা জ্বলজ্বলে গ্যাসের কোনো মেঘ নয়। এটা নক্ষত্রেরই এক মেঘ (ছায়াপথ)। দূরত্বের কারণে নক্ষত্রগুলো আলাদা আলোকবিন্দু হিসেবে ধরা দেয় না। দেখতে ঝাপসা লাগে। অন্যান্য কুক্ষিগত ছায়াপথ ছিল আরও দূরে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মহাবিশ্বের সর্বত্র ছায়াপথপুঞ্জ দিয়ে পরিপূর্ণ।

হাবলের এ আবিষ্কার ছিল অভূতপূর্ব। দেখা গেল, আগের ধারণার চেয়ে মহাবিশ্ব বহু লক্ষ গুণ বড়। তবে এ পর্যবেক্ষণ অসাধারণ হলেও হাবল এ কারণে স্মরণীয় হননি। হাবলের দ্বিতীয় আবিষ্কার আইনস্টাইনের চিরন্তন মহাবিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

সিফিড তারার সাহায্যে হাবল একের পর এক ছায়াপথের দূরত্ব বের করতে লাগলেন। তাতে বিসম্ময়কর এক বিন্যাস খুঁজে পেতেও সময় লাগল না বেশিদিন। সবগুলো ছায়াপথ উচ্চবেগে আকাশগঙ্গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে<sup>২</sup>। প্রতি সেকেন্ডে সরে যাওয়ার বেগ কয়েক শ মাইল বা তারও বেশি। ছায়াপথগুলো এত দূরে যে এদের বিশাল বেগও সরাসরি পরিমাপযোগ্য নয়।

ছায়াপথের দূরত্ব মাপার একমাত্র পথ ডপলার প্রভাব (Doppler effect)। মহাসড়কের পুলিশ এ নীতি কাজে লাগিয়েই গাড়ির গতি মাপে। হয়তোবা খেয়াল করে থাকবে, রেলগাড়ি আপানকে অতিক্রম করে গেলে এর শব্দের পিচ বদলে যায়। ট্রেন কাছে আসার সময় এর পিচ বেশি থাকে। অতিক্রম করে চলে গেলে পিচ হটাৎ করে অনেক নিচু হয়ে যায়। এটা হওয়ার কারণ ট্রেনের গতির কারণে সামনের শব্দতরঙ্গ পেছনের তরঙ্গের চাপে বড় হয়ে যায়। ফলে কম্পাঙ্ক ও পিচ টোন বড় হয়। আর পেছনের তরঙ্গকে লম্বা করে দেয়। কম্পাঙ্ক ও পিচ টোন কমে যায় (চিত্র ৫৬)। এটাই ডপলার প্রভাব। এটা আলোর ক্ষেত্রেও কাজ করে। নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে আসলে আলো চাপা খেয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্ক তৈরি হয়।

বর্ণালির নীল রংয়ের দিকে সরে যায় আলো। এর নাম নীলসরণ (blue shift)। নক্ষত্র দূরে সরে গেলে ঘটে উল্টোটা। আলো লম্বা হয়ে যায়। ঘটে লোহিতসরণ (red shift)।

পুলিশ এভাবেই গাড়ির গতি বুঝতে পারে। কাজিত গাড়ি থেকে প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গের (radio wave) সরণ থেকে হিসাবটা করা হয়। একইভাবে নক্ষত্রের বর্ণালী (spectrum) দেখে বোঝা নক্ষত্র কত জোরে চলছে। আমাদের দিকে আসছে, নাকি দূরে চলে যাচ্ছে।

হাবল দূরত্বের উপাত্তকে ডপলার গতির উপাত্তের সাথে মিলিয়ে দেখলেন। ফলাফল দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। সবদিকের ছায়াপথ আমাদের কাছ থেকে শুধু দূরেই সরছে না, বেশি দূরের ছায়াপথ বেশি দ্রুত সরে যাচ্ছে।

#### চিত্র ৫৬: ডপলার প্রভাব

এটা কীভাবে সম্ভব? ধরুন, একটি বেলুনে একই আকারের অনেকগুলো ডট আছে। এ ডটগুলো ছায়াপথের সাথে তুলনীয়। আর বেলুন নিজে হলো স্থান-কালের কাঠামো। বেলুন বড় হলে ডটগুলো একে অপর থেকে দূরে সরতে শুরু করে। যেকোনো ডট থেকে দেখলেই অন্য ডটগুলোকে ছুটে যেতে দেখা যাবে। দূরের ডটগুলো কাছের ডটের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে (চিত্র ৫৭)। মহাবিশ্বকেও দেখে বেলুনের মতো প্রসারিত হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। (বেলুনের উপমায় কিছু ভ্রুটি আছে। বেলুন বড় হওয়ার সাথে সাথে বেলুনের ডটগুলোও বড় হয়। তবে ছায়াপথের আকার বদলায় না। আটকে থাকে নিজের মহাকর্ষের বাঁধনে।)

#### চিত্র ৫৭: প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

সময় গড়াবার সাথে সাথে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়েই চলে। জিনিসটাকে অন্যভাবেও কল্পনা করা যায়। ধরুন আপনার কাছে মহাবিশ্বের ইতিহাসের একটি চলচ্চিত্র আছে। একে পেছন দিকে চালিয়ে দিলে দেখা যাবে, মহাবিশ্ব গুটিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় এসে বেলুন কুঁচকে শুকিয়ে যাবে। ছোট থেকে হবে আরও আরও ছোট। আর শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দু হয়ে উঠাও হয়ে যাবে। এটাই হলো স্থান ও কালের সূচনার সিংগুলারিটি। এটাই সবচেয়ে আদিম শূন্য। মহাবিশ্বের জন্মস্থান। এটাই বিগ ব্যাং। এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, যার মাধ্যমে জন্ম হয় মহাবিশ্বের। এ সিংগুলারিটি থেকেই বেরিয়ে আসে মহাবিশ্বের সব পদার্থ ও শক্তি। জন্ম হয় ছায়াপথ, নক্ষত্র ও গ্রহের। যা কিছু তৈরি হয়েছে ও যা ভবিষ্যতে হবে সবকিছুর উপদান প্রস্তুত হয়। মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। যা প্রায় ১৫০০ কোটি বছর (আরও সূক্ষ্ম হিসাবে ১৩৮০ কোটি বছর) আগের কথা। আর তখন থেকেই স্থান প্রসারিত হয়ে চলেছে। আইনস্টাইনের স্থির ও চিরন্তন মহাবিশ্বের আশা শেষ হয়ে গেল।

শেষ আশার কিরণ ছিল বিগ ব্যাংয়ের বিকল্প এক তত্ত্বে। এর নাম স্থিরাবস্থা তত্ত্ব (steady-state theory)। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ বললেন, এমন এমন ফোয়ারা আছে যেখান থেকে নির্গত হয় পদার্থ। ছায়াপথরা এসব ফোয়ারা থেকে দূরে সরে যায়। বয়স বেড়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আলাদা আলাদাভাবে ছায়াপথগুলো দূরে গিয়ে মরে গেলেও সার্বিকভাবে পুরো মহাবিশ্ব অপরিবর্তিত থাকে। সবসময় একটি সাম্যবস্থা বজায় থাকে। কারণ প্রতিনিয়ত নতুন পদার্থ তৈরি হয়। এরিস্টটলের চিরন্তন মহাবিশ্ব তখনও টিকে রইল।

কিছু সময় পর্যন্ত বিগ ব্যাং ও স্থিরাবস্থা তত্ত্ব পাশাপাশি অবস্থান করছিল। বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ দর্শন অনুসারে যেকোনো একটি বেছে নিতেন। ১৯৬০-এর দশকে পাল্টে গেল সবকিছু। মৃত্যু হলো স্থিরাবস্থা তত্ত্বের। সে মৃত্যুর সঙ্কেতকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভেবেছিলেন কবুতরের মল (সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে)।

১৯৬৫ সালের কথা। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদরা হিসাব করার চেষ্টা করছিলেন, কী হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরপর। পুরো মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই ছিল উত্তপ্ত ও ঘন। জ্বলজ্বল করছিল উজ্জ্বল আলোয়। বেলুন মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে সে আলো নিশ্চয় হারিয়ে যায়নি কোথাও। তবে স্থান-কালের রাবারের কাঠামোর সাথে সাথে সে আলো লম্বা হয়ে গিয়ে থাকবে। কিছু হিসাব-নিকাশ শেষে প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, সে আলো থাকবে বর্ণালীর মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলে<sup>১</sup>। আর নির্গত হবে চতুর্দিক থেকে। এ আলোর নাম মহাজগতিক পটভূমি বিকিরণ। এটা বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ-পরবর্তী আলো। এর অস্তিত্ব শনাক্ত করা গেলেই বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাংয়ের পক্ষে প্রথম কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে পাবেন। আরও প্রমাণ হবে, স্থিরাবস্থা তত্ত্ব ভুল।

প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীদেরকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁদের অনুমানের পক্ষে প্রমাণ চলে এল। প্রিন্সটনের পাশেই আছে নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের মারে হিল এলাকার বেল ল্যাবস গবেষণাগার। এখানে দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সংবেদনশীল মাইক্রোওয়েভ রশ্মি শনাক্তের যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও যন্ত্র কথা শুনছিল না। রেডিও অনুষ্ঠানের হিস হিস শব্দের মতো একটি শব্দ বাজছিল। কোনোভাবেই একে দূর করা যাচ্ছিল না। প্রথমে ভাবলেন, অ্যান্টেনার বাসায় থাকা কবুতরের মল এজন্য দায়ী। পাখিকে তাড়ানো হলো। মল পরিষ্কার করা হলো। তবুও গেল না হিস হিস শব্দ। চেষ্টার কোনো কমতি করলেন না দুজন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এর মধ্যে তাঁরা প্রিন্সটনের গবেষক দলের কাজের ব্যাপারে জানতে পারলেন। বুঝলেন, তাঁরা পেয়ে গেছেন মহাজগতিক পটভূমি বিকিরণ (cosmic background radiation)। এ নিয়েজ কবুতরের মল থেকে আসেনি। এটা বিগ ব্যাংয়ের আলোর হিস হিস। লম্বা ও বিকৃত হয়ে এ অবস্থা হয়েছে। (এ আবিষ্কারের জন্য সে দুই ইঞ্জিনিয়ার আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নোবেল পুরস্কার পান। প্রিন্সটন গবেষণা দলে কাজের অগ্রভাগে ছিলেন বব ডিক জিম পিবলস। তাঁরা কিছুই পেলেন না। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন, অবিচার করা হয়েছে তাঁদের প্রতি। নোবেল কমিটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে আমলে নেয় না। পুরস্কার দেয় নিবিড় যত্নে করা পরীক্ষাকে।)

ভ্যাকুয়ামের শূন্য হয়ত মহাবিশ্বের ভাঁজের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। মহাবিশ্বের প্রতিটি জায়গার ভ্যাকুয়াম ভার্চুয়াল কণা দিয়ে পরিপূর্ণ। ফলে মহাবিশ্বের কাঠামোয় শূন্য-বিন্দুর শক্তি অসীম। উপযুক্ত অবস্থায় এ শক্তি বস্তুকে ধাক্কা দিতে পারে। প্রাথমিক মহাবিশ্বে হয়ত সেটাই হয়েছে।

১৯৮০-এর দশকে পদার্থবিদরা বলেন, প্রাথমিক মহাবিশ্বের শূন্য-বিন্দুর শক্তি হয়ত এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। এ বাড়তি শক্তি সবদিকে প্রসারিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকবে। যার ফলে স্থান ও কালের কাঠামো বিশাল গতিতে বাইরের দিকে চাপ অনুভব করবে। শক্তির বিশাল বিস্ফোরণ বেলুনকে স্ফীত বা বড় করে তোলে। মহাবিশ্বের ভাঁজগুলো মসৃণ হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে বেলুনে বাতাস দিলে এর কুঁচকানো অংশগুলো মসৃণ হয়ে যায়। এ থেকে মহাবিশ্ব তুলনামূলক মসৃণ হওয়ার কারণ বোঝা যায়। তবে প্রথম কিছু মুহূর্তের ভ্যাকুয়াম হলো নকল ভ্যাকুয়াম। এর শূন্য-বিন্দুর শক্তি অস্বাভাবিক রকম বেশি। শূন্য-বিন্দুর উচ্চ শক্তির অবস্থা একে ভেতরে ভেতরে অস্থিতিশীল করে তোলে। খুব দ্রুত সে নকল ভ্যাকুয়াম ভেঙে পড়ে। এতে সময় লাগে এক সেকেন্ডের বহুকোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। নকল ভ্যাকুয়াম ধ্বংস হয়ে ফিরে আসে আসল ভ্যাকুয়াম। আমরা এখন মহাবিশ্বে এরই শূন্য-বিন্দুর শক্তি দেখি। এটা ছিল এক বোতল পানির মতো। মুহূর্তের মধ্যে যা অতিউত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আসল ভ্যাকুয়ামের ছোট ছোট বুদ্ধদ তৈরি হয়। প্রসারিত হয় আলোর বেগে। আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব এমনই এক বুদ্ধদের মধ্যে আছে। অথবা আছে একসঙ্গে যুক্ত কয়েকটি বুদ্ধদের সমাবেশের মধ্যে। প্রসারণশীল এসব বুদ্ধদ ও তাদের সমাবেশের অপ্রতিসম বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মহাবিশ্বের অপ্রতিসাম্যের (asymmetry) ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ স্ফীতি তত্ত্ব (theory of inflation) বলছে, শূন্য-বিন্দুর অশূন্য শক্তিই নক্ষত্র ও ছায়াপথের সৃষ্টির জন্য দায়ী।



মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্যও হয়ত শূন্যের মধ্যেই নিহিত। ভ্যাকুয়াম ও শূন্য-বিন্দুর শূন্যতা কণার জন্ম দিতে পারে। তাহলে মহাবিশ্বের জন্ম কেন দিতে পারবে না? কণারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। এর নাম কোয়ান্টাম ফোমের ফেনা। এটাই হয়ত মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য দায়ী। মহাবিশ্ব হয়তোবা বড় আকারের এক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন। মহাবিশ্বটা এক বিশাল অদ্ভুত কণা, যার জন্ম পরম ভ্যাকুয়াম থেকে। এ মহাজাগতিক ডিম্ব বিস্ফোরিত হয়ে প্রসারিত হয়। তৈরি করে আমাদের মহাবিশ্বের স্থান-কাল। এমনও হতে পারে, আমাদের মহাবিশ্ব বহু ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে একটি। কোনো কোনো পদার্থবিদের বিশ্বাস, ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের সিংগুলারিটি দিয়ে বিগ ব্যাংয়ের আগের আদিম কোয়ান্টাম ফোমে প্রবেশ করা যাবে। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের ফোমের ফেনায় সময় ও স্থান অর্থহীন। আর তাই এ ফেনা হয়ত অগণিত নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করছে। যেগুলো বৃদ্ধি আকারে বেরিয়ে আসে ও স্ফীত হয়। তৈরি করে নিজেদের নক্ষত্র ও ছায়াপথ। আমাদের অস্তিত্বের রহস্য হয়ত শূন্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে আরও অসীমসংখ্যক মহাবিশ্বের রহস্য।

শূন্য এক শক্তিশালী জিনিস, কারণ এটি পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। বিগ ব্যাংয়ের শূন্য ঘণ্টা ও ব্ল্যাকহোলের গ্রাউন্ড জিরোতে আমাদের মহাবিশ্বের আচরণ ব্যাখ্যা করা গাণিতিক সমীকরণগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবে শূন্যকে উপেক্ষা করা যাবে না। শূন্য শুধু আমাদের অস্তিত্বের জন্যই দায়ী নয়, মহাবিশ্বের শেষ পরিণতির জন্যও দায়ী।

## তথ্যনির্দেশ

১। হ্যাঁ, গণিত সুন্দর হতে পারে আবার বিশ্রীও হতে পারে। সঙ্গীত বা চিত্রকর্মকে নান্দনিকভাবে রুচিশীল করার কৌশল ঠিক করা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন গাণিতিক উপপাদ্য বা পদার্থবিদ্যার তত্ত্বকে সুন্দর করে তোলার পদ্ধতি বের করা। সুন্দর তত্ত্ব হবে সরল এবং ছোট ও সংক্ষিপ্ত। এটি এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা ফুটিয়ে তুলবে। প্রায়শই থাকবে প্রতিসাম্যের রহস্যজনক তাৎপর্য। আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলো বিশেষভাবে সুন্দর। সুন্দর ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলো। তবে অনেকের মতেই অয়লারে আবিষ্কৃত একটি সমীকরণ গাণিতিক সৌন্দর্যের সবচেয়ে নিখুঁত উদাহরণ। সমীকরণটা হলো  $e^{i\pi} + 1 = 0$ । কারণ অতিসরল ও ছোট এই সূত্র সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গণিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলোকে একই সূতোয় গাঁথে।

সূত্রটি নিয়ে আরও জানতে পড়ুন: আব্দুল্লাহ আদিল মাহমুদ, “অয়লারের ফর্মুলা এত দারুণ কেন?”, স্ট্যাট ম্যানিয়া, <https://www.statmania.info/2020/09/euler2.html>

২। ব্যতিক্রমও আছেন। যেমন অ্যানড্রোমিডা ছায়াপথই। মহাবিশ্বের প্রসারণ ফাঁকি দিয়ে মহাকর্ষের প্রভাবে এটা আকাশগঙ্গার কাছে আসছে।

৩। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে বিকিরণ দুর্বল হয়ে পড়ে। চলে আসে বর্ণালীর মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলে। দৃশ্যমান আলোর চেয়ে এ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়, কম্পাঙ্ক কম। তাই শক্তিও কম।

## চিত্র ৫৭.১: তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালী

## নবম অধ্যায় শূন্যের চূড়ান্ত বিজয় [শেষ সময়]

এভাবেই ধ্বংস হবে বিশ্ব  
বিস্ফোরণের মাধ্যমে নয়, কান্নার মাধ্যমে।

—টি এস এলিয়ট, “দ্য হলো ম্যান”

কিছু কিছু পদার্থবিদ সমীকরণ থেকে শূন্যকে বাদ দিতে চেষ্টা করছেন। অন্যরা আবার দেখাচ্ছেন, শূন্যই হয়ত হাসবে শেষ হাসি। বিজ্ঞানীরা হয়তো কোনোদিনই মহাবিশ্বের জন্মরহস্য জানবেন না। তবে মহাবিশ্বের মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় জানা হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি আছে শূন্যের হাতেই।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সমীকরণে স্থির ও পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের স্থান নেই। তবে আরও বেশ কিছু পরিণতির সুযোগ আছে। এগুলো নির্ভর করে মহাবিশ্বের ভরের পরিমাণের ওপর। মহাবিশ্ব হালকা হয়ে থাকলে স্থান-কালের বেলুন প্রসারিত হতেই থাকবে। বড় থেকে আরও বড় হতেই থাকবে। নক্ষত্র ও ছায়াপথ একের পর দপ করে নিভে যাবে। মহাবিশ্ব হয়ে যাবে শীতল। হবে তাপীয় মৃত্যু। তবে ভর বেশি হলে আবার ভিন্নকথা। নক্ষত্র ও ছায়াপথের দল ও অদেখা ডার্ক ম্যাটার ঠেকিয়ে দেবে বিগ ব্যাংয়ের প্রাথমিক ধাপ। বেলুনের স্ফীতি চলবে না চিরন্তন। ছায়াপথরা একে অপরকে কাছে টেনে নেবে। শেষ পর্যন্ত স্থান-কালের কাঠামো কাছাকাছি হয়ে আসবে। বেলুন চূপসে যেতে শুরু করবে। এ প্রক্রিয়া ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে। মহাবিশ্ব ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এর সমাপ্তি ঘটবে পেছনমুখী বিস্ফোরণ দিয়ে। যার নাম মহাসঙ্কোচন (big crunch)। আমাদের ভাগ্য কোনটা আছে? মহাসঙ্কোচন, নাকি তাপীয় মৃত্যু (heat death)? উত্তর চলে এসেছে হাতে।

দূরের ছায়াপথের দিকে তাকালে অতীত দেখা যায়। ধরুন, কাছের কোনো ছায়াপথ আছে ১০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। ঐ ছায়াপথ থেকে বের হওয়া আলো পৃথিবীতে আসতে ১০ লাখ বছর সময় লাগবে। আমরা যে আলো এখন দেখব, তা ছায়াপথ থেকে বের হয়েছে ১০ লাখ বছর আগে। আরও দূরের বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যাবে আরও দূরের অতীত।

মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ভর করছে স্থান-কালের বেলুনের প্রসারণের গতির ওপর। প্রসারণ দ্রুত কমে গেলে বোঝা যাবে বিগ ব্যাংয়ের সময় সৃষ্টি শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মহাবিশ্ব এগিয়ে যাবে মহাসঙ্কোচনের দিকে। আর প্রসারণ খুব বেশি না কমলে বোঝা যাবে বিগ ব্যাংয়ের শক্তি স্থান-কালের কাঠামোকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিল। যার ফলে প্রসারণ চলবে চিরকাল।

জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের প্রসারণের পরিবর্তন পরিমাপ শুরু করেছেন। টাইপ-ওয়ান এ নামে এক ধরনের সুপারনোভা (বিস্ফোরিত তারা) আছে। এরাও হাবলের সিফিড তারাদের মতো আদর্শ বাতি হিসেবে কাজ করে। এ সুপারনোভারা প্রায় একইভাবে বিস্ফোরিত হয়। উজ্জ্বলতা থাকে একইরকম। হাবলের অনুজ্জ্বল সিফিড তারার সাথে এদের পার্থক্য আছে। এদেরকে পুরো মহাবিশ্বের অর্ধেক দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়।

১৯৯৭ সালে এল আরেক বিশেষ আবিষ্কার। জ্যোতির্বিদরা এ সুপারনোভাগুলো দিয়ে বেশ কিছু অনুজ্জ্বল ও প্রাচীন ছায়াপথের দূরত্ব পরিমাপ করেন। ছায়াপথের দূরত্ব এর বয়সও বলে দেয়। আর এর উপলার সরণ বলে দেয় এর বেগ।

অতীতের বিভিন্ন সময়ের ছায়াপথের দূরে সরার গতির তুলনা করলেন বিজ্ঞানীরা। এর মাধ্যমে জানা গেল স্থান-কালের প্রসারণ বেগ। আর সেটা খুবই অদ্ভুত এক ফল।

মহাবিশ্বের প্রসারণ থামছে না। প্রসারণ বেগ বরং সম্ভবত বেড়ে যাচ্ছে। সুপারনোভার উপাত্ত বলছে, মহাবিশ্ব ক্রমেই বেশি দ্রুত হারে বড় হচ্ছে। এটা সঠিক হয়ে থাকলে মহাসঙ্কোচন ঘটাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করছে কোনো একটি বল। পদার্থবিদরা আবারও ফিরে গেলেন মহাজাগতিক ধ্রুবকের কাছে। যে ধ্রুবক আইনস্টাইন যোগ করেছিলেন তাঁর সমীকরণে মহাকর্ষের ধাক্কা ভাঙানোর জন্যে। আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড় ভুলটি হয়ত ভুলই ছিল না।

রহস্যময় সে বল হয়ত আবারও সেই ভ্যাকুয়াম। স্থান-কালের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণারা হয়ত ধাক্কা দিচ্ছে বাইরের দিকে। অননুভবযোগ্যভাবে প্রসারিত করে দিচ্ছে স্থান-কালের কাঠামোকে। বহু কোটি বছরে সে প্রসারণ জমা হয়ে মহাবিশ্বকে দ্রুত থেকে দ্রুততর স্ফীত করেছে। মহাবিশ্বের পরিণতি মহাসঙ্কোচন নয়। বরং চিরপ্রসারণ, শীতলায়ন ও তাপীয় মৃত্যু। আর এর জন্য দায়ী শূন্য-বিন্দুর শক্তি। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার যে শূন্য ভ্যাকুয়ামকে অসীমসংখ্যক কণা দিয়ে ভর্তি করে দেয়।

জ্যোতির্বিদরা এখনও সাবধানে পা চালাচ্ছেন। সুপারনোভা থেকে প্রাপ্ত এ ফল থেকে প্রাথমিক একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ শেষে এ সিদ্ধান্ত আরও জোরালো হচ্ছে। কিছু গবেষণায় আবার নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে গ্যাসের চূড়া বা মহাকর্ষীয় বক্রতার সংখ্যা দেখা হয়। সেসব পর্যবেক্ষণ থেকেও সুপারনোভার ফলাফলের পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে। ফলে মনে হচ্ছে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে। মৃত্যুটা হবে শীতল, উষ্ণ নয়।

পরিণতি হবে হিম, আগুন নয়। আর এর কৃতিত্ব শূন্যের।

### অসীম ও তার পরে

একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হলে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝার উপযোগী হতে হবে। শুধু কিছু বিজ্ঞানীকে বুঝলেই চলবে না। তখন বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষ- সবাই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। এর উত্তর পেলে তবেই তা হবে মানুষের বুদ্ধির জগতের চূড়ান্ত বিজয়। কারণ তখনই আমরা ঈশ্বরের মন (mind of God) জানতে পারব।

—স্টিফেন হকিং

পদার্থবিদ্যার সব ধাঁধার জন্য দায়ী শূন্য। ব্ল্যাকহোলের অসীম ঘনত্বে আছে শূন্য দিয়ে বিভাজন। শূন্যতা থেকে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে সৃষ্টিতেও আছে শূন্য দিয়ে ভাগ। শূন্য দিয়ে ভাগ আছে ভ্যাকুয়ামের অসীম শক্তিতে। তবুও শূন্য দিয়ে ভাগ করলে গণিতের কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। ভেঙে চুরমার হয় যুক্তির পাটাতন। বিজ্ঞানের ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

পিথাগোরাসের যুগে রাজত্ব করত বিশুদ্ধ যুক্তি। তখনও শূন্যের জন্ম হয়নি। মহাবিশ্ব ছিল সুশৃঙ্খল ও অনুমানযোগ্য। এর ভিত্তি ছিল মূলদ সংখ্যা। জেনোর গোলমেলে প্যারাডক্সগুলোকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অসীম ও শূন্যকে সংখ্যার জগত থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এরপর এল বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। বাস্তব অভিজ্ঞতার কাছে হার মানল বিশুদ্ধ যুক্তি। দর্শনের স্থান দখল করল পর্যবেক্ষণ। মহাবিশ্বের সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনকে উপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁর ক্যালকুলাসের কুযুক্তি। যে কুযুক্তির জন্ম দিয়েছিল শূন্য দিয়ে বিভাজন।

ক্যালকুলাসের শূন্যের ভাগ তো গণিতবিদ ও পদার্থবিদরা সমাধান করলেন। পুনরায় একে যুক্তির ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন। কিন্তু শূন্য ফিরে এল কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণে। আবারও বিজ্ঞানকে কলুষিত করল অসীম দিয়ে। মহাবিশ্বের শূন্যে যুক্তি হার মানে। ভেঙে পড়ে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতা। এটা সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবারও শূন্যকে নির্বাসনে পাঠানোর অভিযানে নামেন। মহাবিশ্বের সূত্রগুলোকে জোড়া দিতে চাইলেন।

বিজ্ঞানীরা এ কাজে সফল হলে বুঝতে পারবেন মহাবিশ্বের সূত্রগুলো। স্থান-কালের প্রান্তসীমা পর্যন্ত সবকিছুর নিয়ন্ত্রক সূত্রগুলো তখন জানব আমরা। জানব মহাবিশ্বের সূচনা ও সমাপ্তির গল্প। জানব, কোন পরিস্থিতিতে জন্ম হয়েছিল মহাবিশ্বের। আমরা জানব ঈশ্বরের মন। তবে এবার আর শূন্যকে হারানো এত সহজ নাও হতে পারে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতাকে জোড়া দেওয়ার বেশ কিছু তত্ত্ব আছে। এগুলো ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র ও বিগ ব্যাংয়ের সিংগুলারিটির ব্যাখ্যা দেয়। তবে এ তত্ত্বগুলো বাস্তব পরীক্ষাযোগ্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে আছে। এদের কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা জানা সম্ভব নাও হতে পারে। স্ট্রিং তত্ত্ব ও কসমোলজিস্টদের বক্তব্য হয়ত গাণিতিকভাবে নির্ভুল। আবার একইসাথে হতে পারে পিথাগোরাসের দর্শনের মতো মূল্যহীন। গাণিতিকভাবে এগুলো দেখতে সুন্দর ও সুসঙ্গত হতে পারে। সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাও করতে পারে মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যকে। তারপরেও হতে পারে পুরোদস্তুর ভুল।

বিজ্ঞানীরা শুধু জানেন, মহাবিশ্ব এসেছে শূন্য থেকে। আবার ফিরেও যাবে শূন্যে। যেখান থেকে এটি এসেছে।

*শূন্য দিয়েই শুরু ও শেষ মহাবিশ্বের।*

পরিশিষ্ট ক  
প্রাণী, সবজি, নাকি মন্ত্রী?

ধরুন  $a$  ও  $b$  সমান ১। তাহলে  $a$  ও  $b$  সমান।

অতএব, আমরা লিখতে পারি

$$b^2 = ab \text{ (সমীকরণ ... ১)}$$

আবার  $a$  তো নিজের সমান। অতএব, লিখতেই পারি

$$a^2 = a^2 \text{ (সমীকরণ ... ২)}$$

২ নং সমীকরণ থেকে ১ নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই

$$a^2 - b^2 = a^2 - ab \text{ (সমীকরণ ... ৩)}$$

সমীকরণের উভয়পক্ষকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি।

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$\text{আবার } a^2 - ab = a(a - b)$$

(এখন পর্যন্ত অবৈধ কিছুই করিনি। সবকিছুই গাণিতিকভাবে নির্ভুল। পরীক্ষা করে দেখতে চাইলে সংখ্যা বসিয়ে দেখুন।)  
তাহলে ৩ নং সমীকরণ থেকে পাচ্ছি

$$(a + b)(a - b) = a(a - b) \text{ (সমীকরণ ... ৪)}$$

এখনও সব ঠিক আছে। এবার উভয় পক্ষকে  $(a - b)$  দিয়ে ভাগ করি।

$$a + b = a \text{ (সমীকরণ ... ৫)}$$

দুই পক্ষ থেকে  $a$  বিয়োগ করি।

$$b = 0 \text{ (সমীকরণ ... ৬)}$$

তবে শুরুতেই  $b$  সমান ১ ধরেছিলাম। তার মানে

$$১ = ০ \text{ (সমীকরণ ... ৭)}$$

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ফলাফল। আরও সামনে যাওয়া যাক। আমরা জানি, হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের একটি মাথা ছিল। কিন্তু ৭ নং সমীকরণ বলছে, এক আর শূন্য সমান। তার মানে এরশাদের কোনো মাথা নেই। আবার এরশাদের পাঞ্জাবি নেই। তার মানে একটি পাঞ্জাবি আছে। ৭ নং সমীকরণের দুই পক্ষকে ২ দিয়ে গুণ করি।

$$২ = ০ \text{ (সমীকরণ ... ৮)}$$

এরশাদের দুটি পা ছিল। তার মানে তার কোনো পা ছিল না। দুটি বাহু ছিল। মানে একটিও ছিল না। এবার ৭ নং সমীকরণকে এরশাদের কোমরের সাইজ দিয়ে গুণ করি।

$$\text{এরশাদের কোমরের সাইজ} = ০ \text{ (সমীকরণ ... ৯)}$$

মানে তার কোমরই ছিল না।

এবার আসুন তার গায়ের রং দেখি। তার গা থেকে আসা একটি আলোকরশ্মি নিন। একটি ফোটন কণা নিন। ৭ নং সমীকরণকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ করুন।

$$\text{এরশাদের ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য} = ০ \text{ (সমীকরণ ... ১০)}$$

তবে ৭ নং সমীকরণকে ৬৪০ ন্যানোমিটার দিয়ে গুণ করলে পাই

$$৬৪০ = ০ \text{ (সমীকরণ ... ১১)}$$

১০ ও ১১ সমীকরণ মিলিয়ে পাই

$$\text{এরশাদের ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য} = ৬৪০ \text{ ন্যানোমিটার}$$

এর মানে এরশাদের গা থেকে আসা ফোটনের রং কমলা (যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৪০ ন্যানোমিটার)। তারমানে এরশাদের গায়ের রং কমলা।

সারকথা হলো, আমরা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলাম, এরশাদের কোনো বাহু বা পা নেই। এরশাদের কোনো মাথা নেই। তবে একটি পাঞ্জাবি আছে। নেই কোনো কোমর। আর গায়ের রং হলো কমলা। এরশাদ অবশ্যই একটি গাজর। (এটা প্রমাণ করার সহজ উপায় আছে। ৭ নং সমীকরণের দুই পাশে ১ যোগ করলে পাব

$$২ = ১$$

এরশাদ আর গাজর দুটি আলাদা জিনিস। অতএব, তারা একই জিনিস।)

এ প্রমাণে অসুবিধা কোথায়? ভুল হয়েছে একটিমাত্র জায়গায়। ৪ নং সমীকরণ থেকে ৫ নং সমীকরণে যাওয়ার সময় এ ভুলটা হয়েছে। আমরা ভাগ দিয়েছিলাম  $(a - b)$  দিয়ে। কিন্তু ভাল করে খেয়াল করুন।  $a$  এবং  $b$  দুটোরই মান ১। অতএব  $a - a = 1 - 1 = 0$ । আমরা শূন্য দিয়ে ভাগ করেছি। আর পেয়েছি হাস্যকর সমীকরণ  $১ = ০$ । এখান থেকে

আমরা যা ইচ্ছা তাই প্রমাণ করতে পারব। হোক তা সত্য বা মিথ্যা। গণিতের পুরো কাঠামো ধ্বংস পড়েছে আমাদের চোখের সামনে।

শূন্যের ভুল ব্যবহার যুক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

## পরিশিষ্ট খ সোনালি অনুপাত

একটি রেখাকে দুই ভাগ করুন। কাজটা করুন একটি নিয়ম মেনে। ভাগ করার পরে ছোট ও বড় অংশের অনুপাত বড় ও অংশ ও পুরো অংশের অনুপাতের সমান হতে হবে।

হিসাব সহজ করতে মনে করুন, ছোট অংশ ১ ফুট লম্বা। আর বড় অংশকে ধরুন  $x$  ফুট। তাহলে পুরো রেখার দৈর্ঘ্য  $(x + 1)$  ফুট।

বীজগণিত খাটিয়ে দেখা যাবে ছোট ও বড় অংশের অনুপাত  $1/x$ ।

আর বড় অংশ ও পুরো রেখার অনুপাত  $x / (x + 1)$ ।

আমরা জানি, ছোট ও বড় অংশের অনুপাত বড় ও অংশ ও পুরো অংশের অনুপাতের সমান। অতএব

$$x/(x+1) = 1/x$$

আমরা এখান থেকে  $x$ -এর মান বের করব। এটাই সোনালি অনুপাত (golden ratio)। উভয়পক্ষকে  $x$  দিয়ে গুণ করে পাই

$$x^2 / (x + 1) = 1$$

এবার গুণ দেব  $(x + 1)$  দিয়ে। তাহলে পাব

$$x^2 = x + 1$$

উভয় পক্ষ থেকে  $(x + 1)$  বিয়োগ দিলে

$$x^2 - x - 1 = 0$$

এবার আমরা দ্বিঘাত সমীকরণটা সমাধান করতে পারি। পাব দুটি সমাধান।  $(1+\sqrt{5})/2$  এবং  $(1 - \sqrt{5})/2$ । এ দুটির শুধু প্রথমটিই ধনাত্মক। যার মান ১.৬১৮। গ্রিকদের কাছে শুধু ধনাত্মক সংখ্যাকেই অর্থপূর্ণ মনে হত। অতএব সোনালী অনুপাতের আসল মান ১.৬১৮।



## পরিশিষ্ট গ

### অন্তরকের আধুনিক সংজ্ঞা

বর্তমানে অন্তরক খুব মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ এর সংজ্ঞা দেওয়া হয় লিমিটের মাধ্যমে।  $f(x)$  ফাংশনের অন্তরকের (যাকে  $f'(x)$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়) সংজ্ঞা হলো

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \{f(x+\epsilon) - f(x)\}/\epsilon$$

এর মাধ্যমে আমরা কীভাবে নিউটনের কূটকৌশল থেকে মুক্তি পাই তা বুঝতে হলে নিউটনের ফ্লুক্সানের উদাহরণটা দেখা যাক। সেখানে ছিল  $f(x) = x^2 + x + 1$ । তার অন্তরক হবে

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \{(x + \epsilon)^2 + (x + \epsilon) + 1 - (x^2 + x + 1)\}/\epsilon$$

বিস্তৃত করে পাই

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (x^2 + 2\epsilon x + \epsilon^2 + x + \epsilon + 1 - x^2 - x - 1)/\epsilon$$

এখন  $x^2$ ,  $x$  ও  $1$  কাটাকাটি চলে যায়। বাকি থাকে

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (2\epsilon x + \epsilon + \epsilon^2)/\epsilon$$

লব ও হরকে  $\epsilon$  দিয়ে ভাগ করে পাই (মনে রাখতে হবে  $\epsilon$  সবসময় অশূন্য। আমরা এখনও লিমিট বসাইনি)

$$f'(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (2x + 1 + \epsilon)$$

এবার আমরা লিমিট নেব।  $\epsilon$ -কে শূন্যের কাছে যেতে দেব। তাহলে পাব

$$f'(x) = 2x + 1 + 0 = 2x + 1$$

এটাই আমাদের কাজিত ফলাফল। চিন্তার সামান্য পরিবর্তন। কিন্তু এতেই ঘটে গেল কত বড় ব্যবধান!

## পরিশিষ্ট ঘ

### মূলদ সংখ্যার গণনায় ক্যান্টর

আমরা এখন দেখব, মূলদ সংখ্যা আর স্বাভাবিক সংখ্যাদের আকার সমান। ক্যান্টর এটা প্রমাণ করতে একটি অভিনব আসনবিন্যাস প্রস্তাব করেন।

আপনাদের হয়তো মনে আছে, মূলদ সংখ্যাদেরকে  $a/b$  ভগাংশ আকারে লেখা যায়, যেখানে  $a$  ও  $b$  পূর্ণসংখ্যা ( $b$  অবশ্যই অশূন্য)। ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যাগুলো দিয়ে শুরু করা যাক।

সংখ্যার একটি গ্রিড কল্পনা করুন। যেখানে দুটি সংখ্যারেখা একে অপরকে শূন্যবিন্দুতে ছেদ করে। ব্যাপারটা কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মতোই। শূন্যকে মূলবিন্দুতে বসাই। বাকি বিন্দুগুলোয় বসাই মূলদ সংখ্যাদের। যাদেরকে আমরা  $x/y$  দ্বারা প্রকাশ করব। এখানে  $x$  হলো বিন্দুর  $X$  অক্ষের স্থানাঙ্ক আর  $y$  হলো  $Y$  অক্ষের স্থানাঙ্ক। সংখ্যারেখা চলে গেছে অসীম পর্যন্ত। ফলে  $x$  ও  $y$ -এর প্রতিটি সম্ভাব্য মান গ্রিডের মধ্যে একটি জায়গা পাবে (চিত্র ৫৮)।

এবার ধনাত্মক মূলদ সংখ্যাদের জন্য আসনবিন্যাস বানাই। প্রথম সিটিটি গ্রিডের  $o$  (মূলবিন্দু) দিয়ে শুরু করি (যেখানে অক্ষ দুটি ছেদ করেছে)। পরে পাব  $1/1$ । এটা দ্বিতীয় আসন। এবার যাই  $1/2$  অবস্থানে (তিরচিহ্ন খেয়াল করুন)। আসন নং ৩। এবার  $2/1$ , যা আসলে  $2$ -ই। এটা হলো ৪র্থ আসন। এবার আছে  $3/1$ । আসন নং ৫। এবার তিরচিহ্ন ধরে যেতে যেতে সবাইকে একটি করে আসন দেব। এভাবে আসনবিন্যাস তৈরি হয়ে যাবে।

চিত্র ৫৮: স্বাভাবিক সংখ্যার গণনা

আসন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	...
মূলদ সংখ্যা	০	১	১/২	২	৩	১	১/৩	১/৪	২/৩	...

শেষ পর্যন্ত সব সংখ্যাই আসন পাচ্ছে। কোনো কোনো সংখ্যা আবার ২টি আসন পাচ্ছে। একই আসন কোনো সংখ্যাকে দ্বিতীয়বার না দিলেই এর সমাধানও হয়ে গেল। পরের কাজটা হলো তালিকাকে দ্বিগুণ করা। যাতে ধনাত্মক মূলদের জায়গায় থাকবে ঋণাত্মক সংখ্যারা। তাহলে আমরা পাব আরেকটি আসনবিন্যাস।

আসন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	...
মূলদ সংখ্যা	০	১	-১	১/২	-১/২	২	-২	৩	-৩	...

এখন ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও শূন্য—সব মূলদ সংখ্যাই আসন পেয়ে গেল। আসনবিহীন কেউ নেই। কোনো আসন ফাঁকাও নেই। তার মানে মূলদসংখ্যা আর গণনাসংখ্যাদের আকার সমান।

## পরিশিষ্ট ৬

### ওয়ার্মহোল টাইম মেশিন বানানোর উপায়

কাজটা খুব সহজ। শুধু এ চারটি ধাপ মেনে চলুন।

ধাপ ১: ছোট্ট একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করুন। এর দুই প্রান্ত একই সময়ে অবস্থান করবে।

চিত্র: ৫৯

ধাপ ২: ওয়ার্মহোলের এক প্রান্তকে ভারী কিছুর সাথে গাঁথুন। আরেকপ্রান্তকে বাঁধুন একটি মহাকাশযানের সাথে, যার গতি আলোর গতির ৯০ ভাগ। তাহলে যানের প্রতি এক বছর পৃথিবীর ২.৩ বছরের সমান হবে। ওয়ার্মহোলের দুই প্রান্তের ঘড়ি দুই গতিতে চলবে।

চিত্র ৬০

ধাপ ৩: কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। পৃথিবীর ৪৬ বছর পার হলে ওয়ার্মহোলকে এক সুন্দর গ্রহে নিয়ে যান। ওয়ার্মহোলের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করলে আপনি পৃথিবীর ২০৪৬ সাল থেকে জিলক্স গ্রহের ২০২০ সালে চলে যেতে পারবেন। পারবেন উল্টোটাও করতে।

চিত্র ৬১

ধাপ ৪: একটু বুদ্ধি খাটালেই আপনি এ অভিযান আরও অনেক আগেই শুরু করতে পারবেন। যাত্রা শুরুর অনেক আগেই জিলক্স গ্রহে একটি বার্তা পাঠিয়ে দেবেন, যাতে ফিরতি যাত্রার জন্য (জিলক্স গ্রহের ১৯৭৪ সাল) মহাকাশযান প্রস্তুত করে রাখে। এবার (জিলক্স গ্রহের) ২০২০ সালে অন্য ওয়ার্মহোল আপনাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবে। যা হবে পৃথিবীর ১৯৯৪ সাল। দুই ওয়ার্মহোল একসঙ্গে ব্যবহার করলে আপনি ২০৪৬ (পৃথিবীর সময়) থেকে ২০২০ (জিলক্স সময়) হয়ে ১৯৯৪ সালে (পৃথিবীর সময়) যেতে পারবেন। আপনি অতীতে চলে গিয়েছেন অর্ধশতক বছরেরও বেশি।

চিত্র ৬২